তফসীরে নূরুল কোরআন

চতুর্থ পারা

৪

মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

চতুর্থ খণ্ড

اقرأ باسم ربك الذي خلق

তফসীরে নূরুল কোরআন

চতুর্থ পারা

৪

চতুর্থ খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্ণরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জমাদিউস সানী ১৪৩১ হিঃ,
জৈষ্ঠ ১৪১৭ বাং
জুন ২০১০ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V) 4, Published by Al-Balag Publications.
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 250.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে এবং অশেষ শোকর আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে, যিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ৪র্থ খণ্ড রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ পাকের তৌফিক ব্যতীত এ মহান কাজ সুসম্পন্ন করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হতো না। এজন্যে সারা জীবন শোকর আদায় করলেও তাঁর শোকর গুজারীর হক্ব আদায় হবে না। যদি আমার সারাটি দেহ রসনায় পরিণত হয়, আর সে রসনা সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজারীতে মশগুল থাকে, তবু তাঁর এই একটি মাত্র নেয়ামতের শোকরও আদায় করতে সক্ষম হবো না। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর ওসিলায় লাভ করেছি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত। হে আল্লাহ্! দরুদ পেশ কর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি তোমার নূর সমূহের সমুদ্র, যিনি তোমার রহস্য সমূহের খনি, যিনি তোমার মহান দরবারের উসিলা, যিনি তোমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, তাঁর প্রতি এমন দরুদ পেশ কর, যা তোমাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করে।

বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রকৃত মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত ছিলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, অথবা তাঁর উসিলায় আল্লাহ্ পাক যাকে যতখানি দান করেছেন এই এলম। যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন, যদি আমি সূরা ফাতেহার তফসীর লিপিবদ্ধ করি তবে তা সত্তরটি উষ্ট্রের বোঝা হবে। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছিলেন যে-

اللهم علمه علم القران

(হে আল্লাহ্! তাকে পবিত্র কোরআনের এলম দান কর।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া এভাবে কবুল হয়েছে যে, তিনি সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মধ্যে পবিত্র কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার হবার মর্যাদা লাভ করেছেন। এজেন্য তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন-

(যদি আমার উষ্ট্রের রজ্জু হারিয়ে যায় তবে তা আমি আল্লাহর কিতাবে পেয়ে যাব) অর্থাৎ জীবনের ছোট থেকে বড় এমন কোন সমস্য নেই যার সমাধান পবিত্র কোরআনে নেই।

অতএব, পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্যে সচেষ্ট হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। অন্য কথায় জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মানুষকে যে সব জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার সমাধান খুঁজতে হবে পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা।

অতএব, জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধান করতে হবে পবিত্র কোরআনে কেননা, জীবন-সাধনার সাফল্য নিহিত রয়েছে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মধ্যে।

বস্তুতঃ এ প্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই একদিন পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-সাধনা শুরু করেছিলাম এবং তফসীরে নূরুল কোরআন রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নেক নজরের বরকতে তফসীরে নূরুল কোরআনের ৪ পারা ৪ খন্ডে প্রকাশিত হলো।

কোন কোন সুহৃদ ব্যক্তির মতে, তফসীরে নূরুল কোরআন আরো সংক্ষিপ্ত হলে হয়তো এর রচনা এবং প্রকাশনা সহজতর হতো। কিন্তু এ পর্যায়ে যে বিষয়টির প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করেন না তা হলো, বর্তমান যুগে পবিত্র কোরআনের এলমের চর্চা অনেকটা বিলুপ্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। ফলে সাধারণ শিক্ষিত সমাজ কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তোলার প্রয়াস অনুপস্থিত। ফলে মুসলিম জাতি আজ অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে আমাদেরকে ফিরে আসবে হবে পবিত্র কোরআনে। তাই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থের অনুসন্ধান এবং এ পর্যায়ে চিন্তা ও গবেষণা করা বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের একান্ত কর্তব্য। তফসীরে নূরুল কোরআনের মাধ্যমে আমরা এ কর্তব্য পালনেই প্রয়াসী হয়েছি। এ সত্য বিস্মৃত হওয়া অনুচিত হবে যে মুসলিম জাতির সুদিনে ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের মর্মকথার প্রচার প্রসারে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

এ পর্যায়ে দু' চারটি নাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত তফসীরকার হযরত আবু আবদুল্লাহ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ এবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু ৫৪৬ হিজরী) যে তফসীর রচনা করেছিলেন তা ১০০০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিলো। হযরত আবু বকর এবনে আবদুল্লাহ (রঃ) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার প্রথম ৫০ আয়াতের তফসীর রচনা করেছিলেন ১৪০ খণ্ডে। ইমাম আবুল আহসান আশআরী (রঃ) পবিত্র কোরআনের যে তফসীর লিপিবদ্ধ করেন তা ৬০০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়।

হযরত আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ জামালুদ্দিন মোহাম্মদ এবনে সোলায়মান এবনে হাসান এবনে হুসাইন বলখী (রঃ) (মৃত্যু ৬৬৮ হিজরী) কোরআনে করীমের যে তফসীর লিপিবদ্ধ করেন তা ১০০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। এ তফসীর খানির নাম হলো "আত-তাহরীরু ওয়াত্ তাবহীর লে আকওয়ালে আইম্মাতিত তাফসীর ফি মাআনি কালামি ছামিই ওয়াল বাছির"। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) রচিত তফসীর "ইয়াকুতুত্তাবীল" ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। জামেউল বয়ান বা তফসীরে এবনে জরীর তবরী (মৃত্যু ৩১০ হিঃ) ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন ওমর রাজী (রঃ) (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ) মাফাতিহুল গায়ব বা "তফসীরে কবীর" রচনা করেছেন ৩০ খণ্ডে। তফসীরে মোয়ালেমুত্ তান্জীল, কৃত মহিউস সুন্নাহ হোসাইন এবনে মাসউদ (রঃ) (মৃত্যু ৫১৬ হিঃ) ৮ খণ্ডে সমাপ্ত।

তফসীরে এবনে কাসীর, কৃত হাফেজ এমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল এবনে কাসীর ৮ খণ্ড সমাপ্ত।

তফসীরে রুহুল মাআনী, আল্লামা শেহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (মৃত্যু ১২৯১ হিঃ) রচিত, ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত।

তফসীরে মাওয়াহেবুর রহমান, ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত, মওলানা আমীর আলী মলীহ আবাদী রচিত।

তফসীরে মাজহারী (উর্দু) মূলঃ কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ), ১১ খণ্ডে প্রকাশিত। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) রচিত, ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। উল্লেখিত তফসীর সমূহের অধিকাংশ আরবী ভাষায় এবং কোন কোনটি ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এমনি মৌলিক, বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য একটি তফসীর গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। মূলতঃ এজন্যেই তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার প্রয়াস।

যারা তফসীরে নূরুল কোরআন প্রকাশনায় আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তন্মধ্যে (তৎকালীন) রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

تفسیر نور القران کی چوتھی جلد کی اشاعت کے لے جناب فرید صاحب نے جو تعاون کیا اس کے لے الله پاك ان کو اجر عظیم عطا فرمائے

এতদ্ব্যতীত, যারা আমাকে এ মহান কাজে উৎসাহিত করেছেন যেমন জনাব গাজী নাজিমুদ্দিন সাহেব তাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার নিকট বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী, দয়া করে দোয়া করুন,যেন আল্লাহ পাক এ মহান গ্রন্থকে কবুল করেন, এ তফসীর সম্পূণ করার তওফিক দান করেন এবং আখেরাত এই গুনাহগারকে মাগফিরাত দান করেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمين

বিনীত
মোঃ আমিনুল ইসলাম
১/৩/৮৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

(১) তফসীরুল কোরআন..........২
(২) প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য..........৩
(৩) ইমাম রাজীর (রঃ) ব্যাখ্যা..........৬
(৪) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা..........৭
(৫) 'মিল্লাত'র ব্যাখ্যা..........৯
(৬) আ'মালুল কোরআন..........১২
(৭) তফসীরুল কোরআন, পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক..........১৩
(৮) আহলে কিতাবকে বিশেষভাবে খেতাব করার কারণ..........২৫
(৯) আয়াতুল্লাহ'র ব্যাখ্যা..........২৫
(১০) ইহুদী চরিত্র..........২৬
(১১) শানে নুযুল..........২৮
(১২) ইসলামের দুশমনদের অনুসরণ অবৈধ..........২৯
(১৩) আশ্চর্যজনক ঈমান কার?..........২৯
(১৪) ঈমানের হেফাজতের তাগিদ..........৩০
(১৫) হেদায়েতের দু'টি উৎস..........৩০
(১৬) আল্লাহর ভয় হলো ঈমানের চিহ্ন..........৩৪
(১৭) কেয়ামতের দিন যাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময়..........৪৫
(১৮) উত্তম উম্মত হওয়ার তাৎপর্য..........৫০
(১৯) শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার প্রমাণ..........৫২
(২০) একটি প্রশ্ন ও তার জবাব..........৫৬
(২১) আ'মালুল কোরআন..........৫৯
(২২) শানে নুযুল..........৫৯
(২৩) মানব জীবনের সাফল্য..........৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
(২৪) উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য	৬১
(২৫) ঈমান হলো আমলের প্রাণ	৬৫
(২৬) কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার নির্দেশ	৬৮
(২৭) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৬৮
(২৮) অমুসলিমদের প্রতি উদারতা	৭০
(২৯) তফসীরুল কোরআন	৭৪
(৩০) ইমাম রাজী (রঃ) যে ব্যাখ্যা দিলেন	৭৪
(৩১) মোমেনের ব্যাপার বিস্ময়কর	৭৯
(৩২) তফসীরুল কোরআন, শানে নুজুল	৮০
(৩৩) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৮১
(৩৪) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন	৮৩
(৩৫) আ'মালুল কোরআন	৮৮
(৩৬) মোমেন শুধু আল্লাহর প্রতিই ভরসা রাখে	৯০
(৩৭) যাঁর সৈন্য সর্বত্র	৯১
(৩৮) আল্লাহ পাকের ইচ্ছা	৯৩
(৩৯) এ আয়াত কখন নাযিল হয়?	
(৪০) আয়াতের মর্মকথা	৯৪
(৪১) আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা	৯৭
(৪২) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ নাজাতের পূর্বশর্ত	৯৯
(৪৩) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী	১০১
(৪৪) মাগফেরাত ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও	১০১
(৪৫) জান্নাত কোথায়?	১০৩
(৪৬) প্রকৃত মুত্তাকীর পরিচয়	১০৩
(৪৭) জান্নাতীদের বিশেষ গুণাবলী	১০৩
(৪৮) বিস্ময়কর ঘটনা	১০৭
(৪৯) ইবলিসের ক্রন্দন	১১১
(৫০) ক্ষমা প্রার্থনার পন্থা	১১১

বিষয় পৃষ্ঠা
(৫১) প্রকৃত মুসলমান নিরাশ হয় না..১১২
(৫২) ফেরেশতারা করমর্দন করতো..১১৪
(৫৩) মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান..১১৭
(৫৪) বিজয় লাভের পূর্বশর্ত..১১৮
(৫৫) ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের হেকমত..১১৯
(৫৬) কল্যাণ লাভের পন্থা..১২২
(৫৭) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক প্রসঙ্গ............১২৫
(৫৮) আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না..১২৮
(৫৯) তফসীরুল কোরআন..১৩৫
(৬০) কাফেরদের অনুসরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর..১৪০
(৬১) আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কোন্ দলের কথা বলা হয়েছে..............১৪১
(৬২) আল্লাহ পাকই মুসলমানদের অভিভাবক..১৪২
(৬৩) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষ দান...............১৪৩
(৬৪) কয়েক জনের অন্যায়ের জন্যে সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হয়..........১৪৯
(৬৫) সেই কঠিন মুহূর্ত..১৫০
(৬৬) ওহোদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ..১৫২
(৬৭) মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য..১৫৪
(৬৮) পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা..১৫৯
(৬৯) শয়তানের প্ররোচনা..১৬০
(৭০) জীবন ও মৃত্যুর বিধান অলংঘনীয়..১৬৩
(৭১) কাফেরদের অনুকরণ থেকে বিরত থাকা..১৬৫
(৭২) সর্বপ্রথম আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা ঘোষণা..১৬৭
(৭৩) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ..১৬৮
(৭৪) রাষ্ট্র পরিচালকের কর্তব্য..১৬৯
(৭৫) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বর্ণনা................১৭০
(৭৬) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শের তত্ত্বকথা..১৭১
(৭৭) তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য..১৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা

(৭৮) আয়াতের মর্মকথা....................................১৭৫

(৭৯) শানে নুযুল....................................১৭৬

(৮০) খেয়ানতের পরিণাম....................................১৭৮

(৮১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন
বিশ্ব মানবের জন্যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ....................................১৮৫

(৮২) ওহোদের বিপর্যয়ের জন্য কে দায়ী?....................................১৯১

(৮৩) শানে নুযুল....................................১৯৬

(৮৪) আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ)-এর ভাষ্য....................................১৯৭

(৮৫) শহীদ অমর....................................১৯৮

(৮৬) মোমেনদের সওয়াব বিনষ্ট হয় না....................................২০৩

(৮৭) আ'মালুল কোরআন....................................২১০

(৮৮) শুধু আল্লাহকে ভয় করো....................................২১২

(৮৯) এলমে গায়ব....................................২১৭

(৯০) একটি বে-আদবী....................................২২৩

(৯১) ইমাম রাজী (রঃ)-এর বক্তব্য....................................২২৪

(৯২) আল্লামা আলুসী (রঃ)-এর বক্তব্য....................................২২৬

(৯৩) জুলুমের তাৎপর্য....................................২২৬

(৯৪) প্রকৃত সাফল্য কার?....................................২৩০

(৯৫) প্রকৃত বিপদগস্ত কে?....................................২৩১

(৯৬) আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা....................................২৩৩

(৯৭) মোমেনদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে....................................২৩৪

(৯৮) মাসায়েলুল কোরআন....................................২৩৮

(৯৯) আহলে কিতাবরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো....................................২৪০

(১০০) শানে নুযুল....................................২৪৬

(১০১) আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নির্দশন....................................২৪৬

(১০২) আল্লাহর জিকরের প্রতি গুরুত্ব....................................২৫১

(১০৩) জিকরের একাধিক প্রক্রিয়া....................................২৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

(১০৪) সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা..২৫২
(১০৫) যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ..২৫৫
(১০৬) বৈজ্ঞানিক উন্নতি চিন্তা গবেষণার ফলশ্রুতি..২৫৫
(১০৭) পবিত্র কোরআন সেকেলে নয় অত্যাধুনিক..২৫৬
(১০৮) কোন নেক আমল বিনষ্ট হয় না..২৬০
(১০৯) শানে নুযুল..২৬৫
(১১০) অতি সামান্য সম্পদ..২৬৬
(১১১) সূরা আলে এমরান তেলাওয়াতের ফজিলত..২৭৪
(১১২) সূরা নেসার ভূমিকা..২৭৬
(১১৩) নামকরণ..২৭৮
(১১৪) সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি আহবান..২৭৯
(১১৫) সৃষ্টির মূলতত্ত্ব..২৮০
(১১৬) পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ..২৮০
(১১৭) আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার তাগিদ..২৮১
(১১৮) এতীমদের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ..২৮৪
(১১৯) আ'মালুলু কোরআন..২৮৯
(১২০) অর্থ সম্পদের হেফাজতের তাগিদ..২৯১
(১২১) শানে নুযুল..৩০৩
(১২২) উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ..৩০৪
(১২৩) উত্তরাধিকার বন্টন সম্পর্কে আরও কিছু কথা..৩০৮
(১২৪) যে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না..৩১৯
(১২৫) তওবা নেককার ও বদকারের দৃষ্টিতে..৩২০
(১২৬) তওবার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ..৩২১
(১২৭) পবিত্র কোরআনে তওবার গুরুত্ব..৩২১
(১২৮) কওমে হুদের প্রতি তওবার আহবান..৩২২
(১২৯) বনী ইসরাঈলের প্রতি তওবার আহবান..৩২৩
(১৩০) তওবার মূল কথা..৩২৪
(১৩১) শানে নুযুল..৩২৬
(১৩২) স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহারের নিদের্শ..৩২৭
(১৩৩) দুগ্ধ সম্পর্ক..৩৩০

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ
হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর
অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সঃ) অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী (সঃ)
১৪। ইসলামী মাহফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

চতুর্থ খণ্ড　　　　　　　　　　　　　　　　চতুর্থ পারা

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا
لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ
اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

তরজমা

(৯২) তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না স্বীয় প্রিয়তম বস্তু (আল্লাহ পাকের পথে) ব্যয় কর এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তা জানেন।

(৯৩) তৌরাত নাযিল হবার পূর্ব পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের জন্যে সকল প্রকার খাদ্য হালাল ছিল, শুধু সে খাদ্যগুলো ব্যতীত যা বনী ইসরাঈল (স্বেচ্ছায়) নিজের জন্যে হারাম করেছিল। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, তৌরাত আনয়ন কর এবং পড়ে দেখ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৯৪) অতএব, যারা এরপরও আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারাই জালেম।

(৯৫) (হে রসুল!) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্ পাক সত্য কথা বলেছেন। অতএব, তোমরা (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহজ সরল সত্য) নির্ভুল ধর্মের অনসুরণ কর, আর তিনি মুশরেকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে "বের" শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো পুরষ্কার, জান্নাত, কল্যাণ, অধিক পরিমাণে উপকার, সত্যবাদিতা এবং আনুগত্য (কামুস), 'বের' শব্দটির সম্পর্ক যখন বন্দার সাথে হয় তখন এর অর্থ হলো আনুগত্য, সত্যবাদিতা, উপকার সাধন। আর যখন শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের সাথে হয় তখন এর অর্থ হয় সন্তুষ্টি, রহমত এবং জান্নাত।

আলোচ্য আয়াতে 'বের' শব্দটির অর্থ জান্নাত, একথা বলেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)। আর মোকাতেল এবনে হাব্বানের মতে আলোচ্য আয়াতে 'বের' শব্দটির অর্থ পরহেযগারী। কোন কোন আলেমের মতে, এখানে 'বের' অর্থ হলো আনুগত্য। আর অন্য একদল তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এখানে 'বের' শব্দটির অর্থ হলো কল্যাণ।

হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা অধিক পরিমাণে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না এবং তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগত হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর রাহে দান কর।

আর ইমাম বয়যাবী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না অথবা তোমরা আল্লাহ্ পাকের রহমত, সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভে সফল হবে না, যদি স্বীয় প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে দান না কর। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সত্যবাদীতা অবলম্বন কর। কেননা সত্যবাদীতা 'বের' বা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আর তা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যবাদীতার ইচ্ছা রাখে, এমনকি আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁকে 'সিদ্দীক' বলে লেখা হয়। আর তোমরা মিথ্যাবাদীতা থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা মিথ্যাবাদীতা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায় আর মন্দ কাজ দোযখের শাস্তির

কারণ হয়। কোন লোক সর্বদা মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাবাদীতার ইচ্ছা করে এমনকি, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তোমরা সত্যবাদীতাকে অবলম্বন কর। সত্যবাদীতা 'বের' বা কল্যাণের সাথে থাকে। আর এ দু'টি জিনিস মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা মিথ্যা মন্দ কাজের দিকে মানুষকে ধাবিত করে। আর এ দুটি জিনিসই মানুষকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়।[১] (আহমদ, এবনে মাজা)

প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হলো তার প্রিয় ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের এটি হবে একটি পন্থা এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, রহমত লাভের এটি হবে কারণ। আর এমন আমলের মাধ্যমে লাভ হবে চির শান্তি নিকেতন জান্নাত।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান, যা কিছু ব্যয় করুক এমনকি একটি খেজুরও যদি ব্যয় করে তবে তা 'বের' বা কল্যাণ লাভে সহায়ক হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের নাজাতের জন্যে সারা পৃথিবীর সম পরিমাণ অর্থ সম্পদও যদি তারা ব্যয় করে তবে তা তাদের জন্যে উপকারী হবে না। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে ব্যয় করলে তা আখেরাতের তাদের জন্য উপকারী হবে। তাই এরশাদ হয়েছে–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ– الاية

অর্থাৎ যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না কর সে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে না, নেককারদের বা কল্যাণ অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ব্যক্তি তার প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যারা নেককার হবে তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৯১-৯২

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

(নিশ্চয় নেককারগণ অনন্ত অসীম নেয়ামতের মধ্যে থাকবে।) অতএব এ নেয়ামত সমূহ লাভে ধন্য হওয়ার পন্থা হলো আল্লাহর রাহে দান করা। এতদ্ব্যতীত, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ..........

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

অর্থাৎ নামাজের জন্যে পূর্ব দিকে মুখ ফেরানো একমাত্র সৎ কাজ নয়, বরং প্রকৃত সৎ কাজ হলো তার যে আল্লাহর প্রতি, কেয়ামতের দিনের প্রতি, আল্লাহ পাকের প্রেরিত গ্রন্থ সমূহ ও পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি আসক্তির কারণে তাঁর রাহে অর্থ সম্পদ দান করে, তথা নিকট আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, পথিক, মুসাফির সাহায্য প্রার্থীকে দান করে এবং কারো মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে দান করে, এবং যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ও অভাব-অনটন, বিপদাপদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। মূলতঃ এসব লোকই ইসলামের দাবীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এসব লোকই প্রকৃতপক্ষে পরহেযগার বা মানবতার উন্নত আদর্শের অনুসারী।

লক্ষ্যণীয়, এ আয়াতে অধিকাংশ সৎ কাজের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সৎ কাজ সমূহকে 'বের' বা পরিপূর্ণ কল্যাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

এর অর্থ এই দাড়ায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব সৎ কাজের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো করার পরও তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর রাহে দান না কর।

এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাহে প্রিয় বস্তু দান করা উত্তম এবাদত। যে তার প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে সে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়। আর পবিত্র কোরআনে এমন লোকদের জন্যে যে সব নেয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে সে সব নেয়ামত লাভে ধন্য হয়।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৩

আর এই কারণেই যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের নিজ নিজ প্রিয় বস্তু নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন। হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সে যুগে মদীনা শরীফে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ)। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি বাগান। কখনো কখনো স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বাগানে আগমন করতেন এবং উত্তম পানি পান করতেন। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূল্লাল্লাহ! এ বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তাই আমি বাগানটিকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে চাই। আপনি দয়া করে কবুল করুন এবং যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তুমি এ বাগানটি তোমার নিকটাত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ কর। আবু তালহা আনসারী (রাঃ) তাই করলেন। তিনি বাগানটিকে হযরত হাসান এবনে সাবেত (রাঃ) এবং হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-কে দান করলেন। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

এ আয়াত শ্রবণ করে হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) তাঁর প্রিয় অশ্বটি নিয়ে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার প্রিয় অশ্বটি আল্লাহর রাহে পেশ করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁরই পুত্র উসামা এবনে যায়েদকে দান করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো আল্লাহর রাহে দান করার ইচ্ছা করেছিলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার তরফ থেকে আল্লাহ পাক এই দান কবুল করেছেন অর্থাৎ তুমি এর সওয়াব পাবে।

ইমাম বগবী লিখেছেন মুজাহেদ (রঃ) বর্ণিত ঘটনা। জালাওলা নামক স্থান যেদিন মুসলমানদের করতলগত হলো সেদিন খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে লিখলেন, আমার জন্যে একটি বাঁদী ক্রয় কর। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আদেশ মোতাবেক একটি বাঁদী ক্রয় করলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বাঁদীটিকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ প্রিয় এবং পছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর রাহে দান না করলে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করা যায় না। অতএব এ বাঁদীটি আমি আল্লাহর রাহে আজাদ করে দিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করার সময় চিন্তা করলেন যে, আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় নেয়ামত কোন্‌টি? অতঃপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমার মর্জানা নামক রুমী বাঁদীটি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই বাঁদীটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আজাদ করে দিচ্ছি। তিনি আরও বললেনঃ আল্লাহ পাকের রাহে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেয়া নিষিদ্ধ না হলে আমি বাঁদীটিকে ফেরত এনে বিয়ে করতাম।

যাহোক, এ আয়াতের উপর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আমল করে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। অর্থাৎ তোমাদের প্রিয় কি অপ্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে ব্যয় কর তা আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন। তোমাদের আমল এবং নিয়ত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আর তোমাদের নিয়ত অনুসারেই হবে আমলের সওয়াব।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে সদকাকে গোপন রাখা উচিত কেননা, আল্লাহ পাক তোমাদের সদকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এমন অবস্থায় তা প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং এ অবস্থায় লোক দেখানোর প্রবণতা থেকেও নাজাতও পাওয়া যায়।[১]

ইমাম রাজীর (রঃ) ব্যাখ্যা

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন "তোমরা যা কিছু ব্যয় কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত"। এর অর্থ হলো তোমরা এখলাস বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যয় করছো অথবা লোক দেখানোর জন্যে তা আল্লাহ পাক জানেন। আর আল্লাহ পাক একথাও জানেন যে, তোমরা নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে দান করেছ, না তার চেয়ে স্বল্প মূল্যের অথবা সবচেয়ে মন্দ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪ পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২২২-২৩
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ১৩৭
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৬

বস্তু দান করেছ তা আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন। ইমাম রাজী (রাঃ) আরও বলেছেন যে, এ আয়াতের দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন-

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে অবগত। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে–

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যা কিছু মানত কর আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। অতএব, তোমাদের নিয়ত অনুসারে এবং ভাল কি মন্দ বস্তু দান করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই সওয়াব দান করা হবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) ব্যাখ্যা

এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রাহে ব্যয় করার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জন করা, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[২]

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ

শানে নুযুল

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন একথা বললেন যে, আমি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করি তখন ইহুদীরা বললো তা কি করে সম্ভব হয়? কেননা আপনিতো উষ্ট্রের গোশ্‌ত খাওয়া এবং দুগ্ধ পান করা হালাল মনে করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ উষ্ট্রের গোশ্‌ত এবং দুধ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে হালাল ছিল এবং আমাদের জন্যেও হালাল। তার জবাবে ইহুদীরা বললো এসব বস্তুতো নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) সহ সকলের জন্যেই হারাম ছিল। তাদের এ মিথ্যা কথার প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[৩] এরশাদ হয়েছেঃ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য হালাল ঘোষণা করেছিলেন তা বনী

১। তফসীরে রুহুল মাআনী,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৩
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৫
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫২
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৫

ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। শুধু যে খাদ্য দ্রব্য ইয়াকুব (আঃ) নিজের জন্যে স্বেচ্ছায় হারাম করেছিলেন। ঘটনার বিবরণ এই– উষ্ট্রের গোশ্‌ত এবং দুগ্ধ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রিয় খাদ্য বস্তু ছিল। তিনি একবার অসুস্থ হলেন এবং এই মানত করলেন যে, যদি আল্লাহ্ পাক রোগ দূর করেন তবে আমি আমার এই প্রিয় খাদ্য বস্তু সমূহ আর কোন দিন গ্রহণ করবো না। এরপর যখন তিনি সুস্থ হলেন তখন এ বস্তুসমূহ নিজের জন্যে হারাম করে নিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যে এই বস্তু সমূহের হারাম হওয়ার বিধান প্রবর্তন কর। তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের জন্যে এ দুটি বস্তু নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলো।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে– হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের জন্য উষ্ট্রের গোশত্ এবং দুগ্ধ তিনি নিজেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। এ বর্ণনায় একথাও রয়েছে হযরত ইয়াকুব (আঃ) মানত করার সময় একথাও বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে সুস্থ করেন তবে আমার বংশধররা উষ্ট্রের গোশ্‌ত খাবে না। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, তৌরাত নাযিল হওয়ার পূর্বেই যে সমস্ত খাদ্য বস্তু বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল, তা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের জন্যেও হালাল। তবে হযরত ইয়াকুব (আঃ) যেসব বস্তু সমূহ নিজের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন তার কথা স্বতন্ত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সমস্ত পবিত্র বস্তু সমূহ বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। কিন্তু ইহুদীদের অন্যায় আচরণের কারণে তৌরাত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন জিনিস তাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ হারাম ঘোষিত হয়েছে যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ

অর্থাৎ ইহুদীদের জুলুমের কারণে তাদের প্রতি উত্তম বস্তু সমূহ আমি হারাম বা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছি।

কালবীর বিবরণ হলো এই, বণী ইসরাঈল যখনই জাতীয় ভিত্তিতে কোন অন্যায় কাজ করতো তখন তাদের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক উত্তম হালাল খাদ্য দ্রব্য তাদের জন্য হারাম করে দিতেন। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক ইহুদীদেরকে লা-জবাব করার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমরা তৌরাত নিয়ে আস এবং পাঠ কর, এবং তৌরাতের দ্বারাই তোমাদের মিথ্যাবাদীতা প্রমাণিত হবে। অবশেষে তাই হয়েছিল। কেননা, তারা তৌরাত আনেনি এবং লা-জবাব হয়ে বিদায় হয়েছে।[১]

পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত ইহুদীদের এ অন্যায় আচরণের কারণে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ- الاية

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং বলে যে, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে উষ্ট্রের গোশ্তকে হারাম করে দিয়েছেন তারা সত্যিই জালেম, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে এমন কাজের মাধ্যমে যার পরিণাম ভয়াবহ, যার শাস্তি অবধারিত। কেননা তারা জেনে শুনেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করতো না এবং তাদের অন্যায় আচরণের প্রতি জেদ করতে থাকতো।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যে, আল্লাহ পাক সত্যই বলেছেন।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ- الاية

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী তারাই যারা তাঁর অনুসরণ করে আর এই নবী এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনগণ। অতএব, ইহুদী এবং নাসারারা মিথ্যাবাদী। কেননা, তারা দাবী করে যে, ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন। অতএব, তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ কর, ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ কর কেননা, এটিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবান। মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ কর, কেননা এটিই মিল্লাতে মোহাম্মদী।

'মিল্লাত' এর ব্যাখ্যা

'মিল্লাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এমন বিষয় সমূহের জন্যে যা মানুষকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সহায়তা করে এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে মানব জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে। 'মিল্লাত' শব্দটির সম্পর্ক শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে হয়, আর কারো সাথে নয়। যেমন মিল্লাতে ইব্রাহীম, মিল্লাতে মূসা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৭

এবং মিল্লাতে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। সাধারণ মানুষের সাথে এ শব্দটির সম্পর্ক হয়না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, আর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার আহবান জানিয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি তিনি এই একই আহবান জানিয়েছেন যে, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা। অতএব, শুধু তাঁর প্রতিই বিশ্বাস কর এবং শুধু তাঁর নিকট আশা কর এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখ।

এ আলোচনায় একথা প্রমাণিত হলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন তৌহিদবাদী। আর পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এ বাক্যে ইহুদী এবং নাসারাদের অন্যায় আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তারা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসারী বলে দাবী করতা অথচ তারা শেরক করতো। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর সাথে সম্পর্ক একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী মোমেনদেরই রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) মসনদে ইমাম আহমদে সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। একবার কয়েকজন ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললঃ আমরা আপনার নিকট কয়েকটি এমন প্রশ্ন করতে চাই যা নবী ব্যতীত আর কেউ জানে না। আপনি প্রশ্ন সমূহের জবাব দিন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পার, তবে আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদের নিকট থেকে (বনী ইসরাঈল) নিয়েছিলেন। যদি আমি তোমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদন করি তবে তোমরা ইসলাম কবুল করে আমার অনুসারী হবে। তারা শপথ করে বললো, "আমরা আপনার কথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর প্রদান করেন তবে আমরা অবশ্যই ইসলাম কবুল করব এবং আপনার অনুসারী হবো"। এরপর তারা প্রশ্ন করলো (১) হযরত ইয়াকুব (আঃ) কোন্ খাদ্য নিজের

জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন? (২) পুরুষের শুক্র এবং নারীর শুক্র কেমন হয়? আর (৩) কি কারণে কখনও পুত্র হয়, আর কখনও কন্যা? (৪) উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিদ্রা কেমন হয়? (৫) আর ফেরেশতাদের মধ্যে কোন্ ফেরেশতা তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আসে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বের কথার উপর তাদের কাছ থেকে পুনরায় শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করেনঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) গুরুতর অসুস্থ হয়ে এই মানত করেনঃ যদি আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ করেন তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করব। আর যখন তিনি সুস্থ হলেন তখন উষ্ট্রের গোশ্ত এবং দুগ্ধের পানাহার পরিত্যাগ করেন। পুরুষের শুক্রের বর্ণ সাদা হয় এবং গাঢ় হয় আর নারীর শুক্রের বর্ণ হালকা হলুদ এবং পাতলা হয়। নারী পুরুষের মিলনে যার প্রাধান্য হয় সন্তানও সে হিসেবেই হয়, আর আকৃতিও এ প্রাধান্যের ভিত্তিতেই হয়। এই নবীয়ে উম্মীর নিদ্রাকালে তাঁর নয়ন যুগল নিদ্রিত হয় কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। আমার নিকট ওহী নিয়ে সে ফেরেশতাই আসে, যে সমস্ত নবীর নিকট এসেছিল, অর্থাৎ জিব্রাঈল (আঃ)। একথা শ্রবণ করেই প্রশ্নকারী ইহুদীরা বললোঃ যদি আপনার নিকট অন্য কোন ফেরেশতা আসতো তবে আমরা আপনার নবুওয়্যতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতাম। অথচ প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে তারা বলছে প্রত্যেকটি উত্তর সঠিক। এদের সম্পর্কেই নাযিল হয় সূরা বাকারার এ আয়াত–

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ـ الاية

যাহোক, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেঃ তৌরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে সব উত্তম খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। শুধু সে খাদ্য যা ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। অতএব, ইহুদীদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, উষ্ট্রের গোশ্ত ও দুধ হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে হারাম ছিল। তোমরা তৌরাত নিয়ে আস এবং পাঠ কর এবং তোমাদের মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ গ্রহণ কর।[১]

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের প্রতি রয়েছে এই চ্যালেঞ্জ, "তোমরা তৌরাত আন, তা পাঠ কর। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও"। মূলত তারা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪

ছিল মিথ্যাবাদী, ধর্মদ্রোহী। তাই তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি এবং পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জের জবাবও দেয়নি।

আ'মালুল কোরআন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ থেকে إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ পর্যন্ত এ আয়াত খানি কোন কৃপণ ব্যক্তির পোষাকে মেশ্‌ক ও গোলাপ দ্বারা লিপিবদ্ধ করে তা ধৌত করে তাকে ঐ পানি পান করালে তার কৃপণতার স্বভাব দূর হবে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ
إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

তরজমা

(৯৬) নিশ্চয় যে ঘর (আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে) প্রথম প্রস্তুত হয়েছে তা সে ঘরই, যা মক্কা-ধামে অবস্থিত। তা মানুষের জন্যে মঙ্গলজনক এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে পথ প্রদর্শক।

(৯৭) তাতে যে প্রকাশ্যে নির্দশন সমূহ রয়েছে তন্মধ্যে মকামে ইব্রাহীম অন্যতম। এবং যে ব্যক্তি এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে। আর আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ ঘরের জেয়ারত করা সে সব মানুষের কর্তব্য যারা ভ্রমণের শক্তি সামর্থ রাখে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ পাক বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এরপর এ ঘোষণাও করা হয়েছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শের সর্বাপেক্ষা নিকটতম হলোঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী মোমেনগণ। একথার উপর ইহুদীরা আপত্তি করে বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর মাতৃভূমি ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়া গমন করেন। সেখানেই তিনি জীবন যাপন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বংশধররা সেখানেই অবস্থান করে, তাদের কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। তোমরা আরবরা বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা নির্দিষ্ট করেছ, তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর আদর্শের নিকটতম বলে দাবী করতে পার? ইহুদীদের এসব কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ এবনুল মুনজের এবনে জোরায়হ'র সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ ইহুদীরা বলেছিল বায়তুল মোকাদ্দাস কা'বা শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ কেননা, বায়তুল মোকাদ্দাসে বহু নবী হিজরত করেছেন আর তা পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত। আর মুসলমানগণ বলেছেন কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন এসব কথার বিবরণ পৌঁছে তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ ইহুদীদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অস্বীকৃতি এবং ঔদ্ধত্যের জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। কেননা, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসের স্থলে কা'বা শরীফকে কেবলা নিদৃষ্ট করলেন তখন ইহুদীরা আপত্তি করে বললঃ কেবলা হিসেবে বায়তুল মোকাদ্দাসই উত্তম কেননা, বায়তুল মোকাদ্দাস কা'বা শরীফের পূর্বে নির্মিত হয়েছে। ইহুদীদের এ মিথ্যা আষ্ফালনের জবাবে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ- الاية

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এবাদতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে যে ঘরটি সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছে, তা এ মক্কার বুকে অবস্থিত যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্যে পথের দিশারী। এতদ্বারা আল্লাহ পাক কা'বা শরীফের উত্তম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৪১-৪২

এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে তার এবাদতের উদ্দেশ্যে যে ঘরটি কেবলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন তা হলো কা'বা শরীফ। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন এর অর্থ হলো মানুষের হজ্জের জন্যে যে ঘরটি সর্বপ্রথম নিদৃষ্ট হয়েছে তা হলো এই কা'বা শরীফ। হাসান এবং কালবী (রহঃ) বলেছেনঃ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ঘরটি আল্লাহর এবাদতের জন্যে নিদৃষ্ট করা হয়েছে তথা সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তাহলো কা'বা শরীফ।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে আলোচ্য আয়াতে "বায়তুন" শব্দের অর্থ হচ্ছে মসজিদ। অতএব এমনি অবস্থায় এর মর্ম হবে এই, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে তা মক্কায়ে মোয়াজ্জমাতে অবস্থিত।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে প্রথম ঘর হওয়ার কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ

আসমান যমীন সৃষ্টির সময় সর্বপ্রথম কাবা শরীফের যমীনটি ভেসে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল সাদা ফেনা যা পরে জমাট হয়ে গিয়েছিল। যমীন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে এর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এর নীচ থেকেই বিশাল বিস্তৃত যমীন ছড়িয়ে দেয়া হয়। হযরত আলী এবনুল হোসেন (ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক আরশের নীচে একটি ঘর তৈরী করেছেন তার নাম হলো বায়তুল মা'মুর। আসমানের ফেরেশতাদেরকে সে ঘরের তওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর যমীনে অবস্থানকারী ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন যেন বায়তুল মা'মুরের ন্যায়-যমীনে একটি ঘর নির্মাণ করে। তখন ফেরেশতাগণ কা'বা শরীফ নির্মাণ করে। আল্লাহ পাক জমীনে অবস্থানকারী ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যেন তারা এ ঘরের তওয়াফ করে। কোন কোন বিবরণে রয়েছে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে কা'বা শরীফ নির্মাণ করে আর এ ঘরের তওয়াফ করতে থাকে। হযরত আদম (আঃ) এ ঘরের হজ্জ করেন।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) জমীনে কা'বা নির্মাণ করেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ড দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা- ৫০৬-৫১৬)।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৯
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস পৃষ্ঠা-৫২

لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ

অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যে ঘরটি আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা মক্কায় অবস্থিত। মক্কা এবং বক্কা উভয় শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবরা কখনো কখনো 'মীম' অক্ষরটিকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করে, যেমন 'নমীত'কে নবীত বলা হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন মক্কা হলো শহরটির নাম, আর 'বক্কা' হলো সেই নিদৃষ্ট স্থানটির নাম যার উপর কা'বা শরীফ অবস্থিত অথবা তওয়াফের স্থান। 'বক্কা' শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো ভীড়, যেহেতু হজ্জের সময় মানুষের বিরাট সমাগম হয় এজন্যে তাকে 'বক্কা' বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেছেনঃ মক্কা অনেক বড় বড় জালেমকে নিপাত করেছে। যে বা যারা কা'বা শরীফকে নিশ্চিহ্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে তাকেই ধ্বংস করেছে যেমন আবরাহা বাদশাহ ও তার সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।[১]

مُبٰرَكًا

অর্থাৎ কা'বা শরীফ বরকতময়, আর কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে এবাদতের সওয়াব অশেষ। কোন কোন এবাদত শুধু কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণেই হয়। যেমন- হজ্জ, ওমরা আর কোন এবাদত অন্যত্রও করা যায় কিন্তু এ স্থানে এবাদতের সওয়াব অপরিসীম যেমন নামাজ, রোজা, এতেকাফ। কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে এক ওয়াক্ত নামাজ অন্যত্র এক লক্ষ ওয়াক্তের সমান মর্যাদা রাখে। এজন্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ এ মানত করে যে, আমি মসজিদে হারামে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করব আর সেই নামাজ অন্যত্র আদায় করলে মানত পূর্ণ করার জন্যে যথেষ্ট হবে না কেননা, হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেঃ নিজের বাড়ীতে একটি নামাজ এক নামাজেরই সমান। আর মহল্লার মসজিদে একটি নামাজ পঁচিশটি নামাজের সমান মর্যাদা রাখে। আর এই নামাজ যদি জামে মসজিদে আদায় করা হয়, তবে তা পাঁচশত নামাজের সমান মর্যাদা রাখে এবং মসজিদে আক্সায় এ নামাজ আদায় করলে তার মর্যাদা হবে এক হাজার নামাজের সমান, আর আমার মসজিদে আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান হবে। অথচ এ নামাজ মসজিদে হারামে আদায় করলে তা এক লক্ষ নামাজের সমান মর্যাদা রাখে। (এবনে মাজা)

এতদ্বারা এ স্থানটি কত বরকতময়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০০

তেবরানী ও হাকেম বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ পাক মক্কা শরীফের উপর একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। বর্ণিত আছে যে ৭০,০০০ ফেরেশ্তা প্রতিদিন কা'বা শরীফে তওয়াফ করতে আসে। এই ফেরেশতাগণ আর কেয়ামত পর্যন্ত তওয়াফ করতে আসবেনা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহর ওলীগণ এই পবিত্র স্থানে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকেন তা পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়।

এছাড়া পৃথিবীকে এটি এমনি একটি স্থান যেখানে পানি নেই, ফসল নেই কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা কখনো ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায় না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ স্থানটির জন্য বিশ্ব মানবের অন্তরে একটি বিশেষ আর্কষণ সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলে সকল যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মানুষ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সমবেত হয়। মানুষের অন্তরে এ ঐতিহাসিক স্থানটির মর্যাদা এবং ভালবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমনিভাবে আবে জমজম হলো আল্লাহর কুদরতি পানি, এ পানি অত্যন্ত বরকতময়। এতে শুধু যে পিপাসা নিবারণ হয় তাই নয়, বরং তা দ্বারা খাদ্যের প্রয়োজনও মেটে এবং রোগের নিরাময়ও হয়। মক্কাবাসী অল্প কয়েকদিন ব্যবসা করে তা দ্বারা সারা বছরের প্রয়োজনের আয়োজন করে। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার মানুষ সারা বছরই জীবিকার্জনে ব্যস্ত থাকে।[১]

আল্লামা এবনে জওজী (রঃ) তাঁর 'ফাজায়েলে মক্কা' নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আ'দী (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের রাত্রে মক্কায়ে মোয়াজ্জমার 'হারুরা' নামক স্থানে দন্ডায়মান হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আল্লাহর জমীনে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মক্কার জমীন। যদি আমাকে এখান থেকে বের না করা হতো তবে আমি বের হতাম না। এই হাদীস আল্লামা এবনে জওজী হযরত আবু হোরায়রা (রঃ)-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন-

وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ এই কা'বা সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের কারণ হয়। কেননা, কা'বা সকলের জন্যেই কেবলা। হেদায়েতের দুটি অর্থ হয় (এক) একটি হলো সে পথ নির্দেশ করা যা মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে। (দুই) সরাসরি মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়া। কা'বা শরীফের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই প্রযোজ্য কেননা, কা'বা শরীফের তা'যীম করা, তার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কা'বা শরীফের জেয়ারত করা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ কা'বা শরীফে আল্লাহ পাকের কুদরতের যে বিস্ময়কর নির্দশন সমূহ রয়েছে এবং যে বরকত সমূহ সেখানে পরিলক্ষিত হয় তা

১। খোলাসাতুত তাফাসীর পৃষ্ঠা-২৭৩

দেখেও হেদায়েত লাভ করা যায়। 'আলামীন' বহুবচন হলো আলম শব্দের যার অর্থ জগৎ- এ শব্দটির ব্যবহারে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেমন মানব জাতির জন্যে মহা সম্মানিত হেদায়েতের মাধ্যম এবং বরকতময়, ঠিক তেমনি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যেও মহা সম্মানিত এবং বরকতপূর্ণ। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ এ ঘরে হাযির হয়, তওয়াফ করে এবং অন্যান্য সৃষ্টিও এ ঘরের তা'যীম করে। যেমন পাখিরা আল্লাহর ঘরের ওপর দিয়ে ওড়ে না। কোন শিকারী জন্তু যদি তার শিকারকে ধরার জন্য তাড়া করে আর শিকার হরম এর সীমানায় প্রবেশ করে তবে শিকারী হরম শরীফে প্রবেশ করে না। পবিত্র কোরআন এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট নির্দশন বলে আখ্যা দিয়েছে।

এমনিভাবে সারা বিশ্বে যুগে যুগে কত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে কিন্তু মক্কা শরীফের জমীন এবং কা'বা শরীফ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। আবরাহার ন্যায় কত জালেম আল্লাহ পাকের এ পবিত্র ঘর বিনষ্টের অপচেষ্টা করেছে এবং সকলেই তাদের সমুচিত শাস্তি পেয়ে বিদায় হয়েছে। কোন সময়ই মানুষের ঘর-বাড়ীর অবস্থা এ মহান ঘরের হয়নি। এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহীম- এ হলো সেই পাথর যে পাথরে দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এ পাথরটি আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে প্রয়োজন মোতাবেক আপনা আপনি উপরে উঠত, আর প্রয়োজন মোতাবেক নীচে নেমে আসত। এ পাথরটিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পদদ্বয়ের চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এ পাথরটি ইতিপূর্বে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সঙ্গেই ছিল। পরবর্তীতে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব দিকে রেখেছেন যাতে করে তওয়াফকারীদের কোন অসুবিধা না হয়।

এতদ্ব্যতীত, এ পাথরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে রয়েছে এর জন্যে বিশেষ আকর্ষণ।

এজন্যেই মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জনকে ছেড়ে অর্থ-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করে হাযির হয় মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়, পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে। কা'বা শরীফ দেখা মাত্র পথের সকল কষ্ট ক্ষণিকের মধ্যে ভুলে যায়। লাভ করে প্রতিটি মানুষ তার মনে অনাবিল শান্তি কেননা, এখানেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি এবং নিরাপত্তা সবার ওপরে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত ও দয়া। যে মক্কায় প্রবেশ করে সে লাভ করে নিরাপত্তা। আর এ নিরাপত্তা শুধু ইসলামের আবির্ভাবের পরই নয়; বরং আইয়ামে জাহেলিয়াতেও ছিল এখানে নিরাপত্তা, এমনকি পিতার ঘাতককে পেলেও এখানে কিছু বলা হতো না। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ বায়তুল্লাহ শরীফ নিরাপত্তা

প্রার্থীকে নিরাপত্তা দান করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا

অর্থাৎ তারা কি দেখে না? আমি হরমকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নিদৃষ্ট করেছি।

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

"এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দান করেছেন ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা"।

আর এ নিরাপত্তা শুধু মানুষের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে। এ শহরে কোন প্রাণী শিকার করা, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, কোন পাখীকে তার বাসা থেকে সরিয়ে দেয়া, বৃক্ষ কর্তন করা এমনকি এখানকার ঘাস কর্তন করা পর্যন্ত অবৈধ। এ শহরের আজমত বা শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্মেরই উজ্জ্বল নির্দশন হলো এসব নির্দেশ।[১]

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি হরম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে, তাকে হত্যা করা অবৈধ হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি হরমের বাইরে এমন অপরাধ করে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু হরম শরীফের ভেতর তাকে এ শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে তার পানাহার বন্ধ করে দেয়া হবে এমনকি, তার সঙ্গে কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেন বৈধ হবে না। তখন সে বাধ্য হয়ে হরমের বাইরে আসলে তার শাস্তি বিধান করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মত পোষণ করেছেন।

কিন্তু যদি কেউ হরম শরীফের সীমার ভেতর এমন অপরাধ করে তবে সেখানে তার শাস্তি বিধান করা বৈধ হবে।

এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের তরফ থেকে হরম শরীফের সীমার ভেতর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করা বৈধ হবে না। তবে তারা যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে তাদের সঙ্গে হরম শরীফের সীমার ভেতর যুদ্ধ করা বৈধ হবে। আর যদি কাফেররা পরাজিত হয়ে হরম শরীফের প্রবেশ করে তবে তাদেরকে হাত বা লাঠি দ্বারা মেরে হরম শরীফ থেকে বের করে দেয়া হবে। অতঃপর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ " যে এ শহরে প্রবেশ করবে সে লাভ করবে নিরাপত্তা"। এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৭

তা'যীম প্রকাশার্থে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ শহরে প্রবেশ করবে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। হযরত যাবের (রাঃ) এবং হযরত হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি উভয় হরমের (মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ) কোন একটিতে মৃত্যু বরণ করে সে কেয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত প্রাপ্ত হয়ে উঠবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমাকে আবু বকর ও ওমরের পার্শ্বস্থ কবর থেকে ওঠানো হবে। এরপর আমি বাকীয়ে গারকাদ (মদীনা শরীফের কবরস্থান) গমন করবো, তারাও আমার সঙ্গে উঠে আসবে, এরপর আমি মক্কাবাসীর জন্য অপেক্ষা করব। এভাবে মক্কা শরীফ মদীনা শরীফের অধিবাসীদের সঙ্গে পুনরুত্থান হবে।[১]

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য। এ আয়াতে الناس শব্দটি সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন, এতদ্বারা সে সব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আজাদ, যারা বুদ্ধিমান, যারা বালেগ। এর তাৎপর্য হলো শিশু, পাগল এবং গোলামদের উপর হজ্জ ফরজ নয়। অতএব, কেউ কাফের অবস্থায় যদি হজ্জ করে থাকে (যেমন প্রাক-ইসলামী যুগে কাফেররা করত) আর সে মুসলমান হয়, তবে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন শিশু তার শৈশবে হজ্জ করে পরে পরিণত বয়সে তাকে অবশ্যই হজ্জ করতে হবে। আর যে গোলাম গোলামী অবস্থায় হজ্জ করে পরে সে স্বাধীন হয় তবে তাকেও পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের ওপর (১) কলেমায়ে তৈয়্যেবার মর্মবাণীর ওপর অঙ্গীকার করা (২) সঠিক ভাবে নামাজ কায়েম করা। (৩) ঠিক ভাবে যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ করা। (৫) রমজানের রোযা রাখা। হযরত ওমর (রা) একবার বলেছিলেনঃ যদি লোকেরা হজ্জ ছেড়ে দেয় তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। যেমন নামাজ এবং যাকাতের ব্যাপারে আমরা জেহাদ করি।[২]

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩০৩-০৪

অর্থাৎ যে মক্কা শরীফে যাওয়ার সামর্থ রাখে তার প্রতিই হজ্জ ফরজ। যেমন সুস্থ থাকা, পথে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকা এবং পথ খরচ সহ যাবতীয় ব্যয় গ্রহণের সামর্থ থাকা। যদি পথে নিরাপত্তা না থাকে বা ব্যয়ভার বহনের যোগ্যতা না থাকে তবে হজ্জ ফরজ নয়। হজ্জ সারা জীবনে একবার ফরজ (হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বিতীয় খণ্ডে-২০১ থেকে ২০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)।

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ আয়াতের হজ্জ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

এ বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, (১) যেহেতু আল্লাহ পাক একমাত্র উপাস্য বা মা'বুদ, তাই তাঁর বন্দাদের একান্ত কর্তব্য হলো তাঁর এ আদেশ পালন করা, তারা এ আদেশের হেকমত সম্পর্কে জ্ঞাত হোক বা না হোক। (২) আয়াতের প্রথম বাক্যই হলো ولله, তথা আল্লাহর জন্যে অতএব, যে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক রাখে তার জন্যে আয়াতে বর্ণিত আদেশ অবশ্য পালনীয়। (৩) আয়াতে على শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এর তাৎপর্য হলো যে কাজটি সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে তা অবশ্য কর্তব্য। (৪) যেহেতু على الناس বলা হয়েছে এর প্রকাশ্যে অর্থ হলো সকল মানুষের ওপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। এতদ্বারা এর অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য পরে ঘোষণা করা হয়েছে যারা সামর্থ রাখে শুধু তাদের প্রতিই হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। (৫) ومن كفر আর যে অবাধ্য হয় অর্থাৎ যে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করল না সে যেন আল্লাহর অবাধ্য হলো। এটি হজ্জ আদায় যারা না করে তাদের জন্যে কঠোর ও কঠিন সতর্কবাণী এবং হজ্জ আদায়ের জন্যে চরম তাগিদ। (৬) এরপর এরশাদ হয়েছে-

"যে হজ্জ করল না তথা আল্লাহ্র অবাধ্য হলো তার নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতের কারোই মুখাপেক্ষী নন"।

আলোচ্য বাক্যে একথা আল্লাহ্ পাক বলেননি যে, আল্লাহ্ পাক হজ্জ তরককারীর মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি এরশাদ করেছেন সমগ্র বিশ্ব জগতের কারোই তিনি মুখাপেক্ষী নন। এতদ্বারা হজ্জ সম্পর্কে যারা গাফলত করে তাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[১]

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী যদি আল্লাহ্র বন্দেগীতে মশগুল হয় তবু তাঁর শানে তিল পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি হবে না। পক্ষান্তরে, যদি সারা বিশ্ববাসী আল্লাহ্র নাফরমান ও অবাধ্য হয় তবু তাঁর শান এতটুকু কমবে না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৫

অতএব, আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে এবাদতকারীই উপকৃত হয়, আর যে এ ব্যাপারে গাফলত করে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হজ্জের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে।

وَمَنْ كَفَرَ

অর্থাৎ "যে হজ্জ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে"। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত আতা (রঃ)।

আবদ এবনে হানিফ (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন হোজায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যে হজ্জ না করে সে কি কাফের হয়ে যায়? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ করল না, হজ্জ না করার আযাবকেও ভয় করল না এবং হজ্জ করার সওয়াবের প্রতি আসক্তিও প্রকাশ করল না, এমনি অবস্থায় সে কাফের হয়ে যাবে।[১] অর্থাৎ যে হজ্জের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে।

হযরত সাঈদ এবনুল মোসাইয়্যাব (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা বলেছিল মক্কার হজ্জ করা ওয়াজিব নয়।

সাঈদ এবনে মনসুর এবং এবনে জরীর যাহ্যাকের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ- الايه

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দান করেন এবং এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরজ করেছেন, তোমরা হজ্জ কর। একথা শ্রবণ করে শুধু মুসলমানগণ এই হুকুম মেনে নিল আর অন্যরা এ আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালো। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরেক, সাবী এবং মজুসী তথা অগ্নি পূজকরা এ আদেশ পালন করল না। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

(আর যারা অবাধ্য ও নাফরমান হবে, তাদের জানা উচিত সমগ্র বিশ্ব জগতের কোন কিছুরই আল্লাহ পাক মুখাপেক্ষী নন।)

সাঈদ এবনে মনসুর একরামার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যখন–

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১০

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا

আয়াত খানি নাযিল হয় তখন ইহুদীরা বলে আমরাতো মুসলমান। এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি হজ্জ ফরজ করেছেন। ইহুদীরা হজ্জের ফরজ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললোঃ আমাদের প্রতি হজ্জ ফরজ করা হয়নি, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

মূলতঃ মানুষকে আল্লাহ পাক দান করেছেন শারীরিক শক্তি এবং আর্থিক সামর্থ। এ দুটি নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত প্রদান করা হয়েছে হজ্জের বিধান। অতএব, হজ্জের ফরজ আদায় না করার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের এ নেয়ামত সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা, তথা এ নেয়ামত সমূহ আল্লাহ পাকের দান একথা অস্বীকার করা, অতএব আলোচ্য আয়াতে "কুফর" শব্দের ব্যাখ্যা হবে নেয়ামতের অস্বীকৃতি।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি পথ খরচ, যানবাহন রাখে তথা হজ্জ করার সামর্থ রাখে অথচ হজ্জ করেনা তার সম্পর্কে এ আশংকা থাকে যে, সে ইহুদী বা খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। কেননা, আলোচ্য আয়াতে হজ্জ না করাকে "কুফর" বলে আখ্যায়িত করে হজ্জের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর হজ্জের ব্যাপারে গাফলত করাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غنى عنه

অর্থাৎ যে হজ্জ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আর আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১০-১১
২। সাফওয়াতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৯

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ
شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا
مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ
وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

তরজমা

(৯৮) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ প্রত্যাখ্যান কর অথচ আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন।

(৯৯) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন মোমেনদেরকে আল্লাহ্ পাকের পথে বাধা দিচ্ছ? কেন তাতে খূঁত খুঁজছ? অথচ তোমরাই (সত্য কথার) সাক্ষী রয়েছে এবং আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন নন।

(১০০) হে মোমেনগণ! তোমরা যদি আহলে কেতাবদের দল বিশেষের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় নাফরমান সম্প্রদায়ের পরিণত করতে প্রয়াসী হবে।

(১০১) এবং তোমরা কিরূপে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করবে অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রসূল বর্তমান রয়েছেন, আর যে আল্লাহ্ পাকের (দ্বীনকে) সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে নিশ্চয় সে সরল সত্য পথের হেদায়েত পাবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর

ইহুদীদের সন্দেহ খন্ডন করেছেন- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ এ আয়াত দ্বারা। এরপর কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে তারা যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তার জবাব দিয়েছেন এ আয়াত থেকে।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ

পথভ্রষ্ট ইহুদীদের সকর প্রশ্নের জবাব প্রদানের পর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এই বলে- হে প্রিয় রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুনঃ হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত, তোমাদের নিকট যে তৌরাত রয়েছে তাতে তাঁর গুণাবলী বর্ণিত আছে। অতঃপর তোমরা যে সব প্রশ্ন করেছ তার সঠিক ও সন্তোষজনক জবাবও প্রদান করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রকাশ্য জ্বলন্ত দলিল-প্রমাণ এবং জীবন্ত নিদর্শন সমূহ পাওয়ার পরও কেন পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস কর? কেন পবিত্র কোরআনের বাহক আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম রসূলের রেসালতকে অস্বীকার কর? তোমাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, তিনি তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন, অতএব তোমাদের শাস্তি অবধারিত একথা ভালভাবে জেনে রেখ।[১] কেননা আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

(তিনি জানেন যা তারা গোপন করে, আর যা তারা প্রকাশ করে) শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর আমি জানি মানুষের মনের গহনে কি ভাবনার অবতারণা হয়"।

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ তোমাদের কীর্তিকলাপ আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৭

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

(আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ পাক তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ দেখছেন।) তোমাদের ছল, কৌশল সবই তিনি জানেন, তোমাদের কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়, অতএব তোমাদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তোমাদের পরিণাম শোচনীয়।

অতএব, তোমরা সত্যকে যে গোপন করছো, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবে না, তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিশ্চিত শাস্তি থেকে কোন অবস্থাতেই নিষ্কৃতি পাবে না।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ

আহলে কিতাবকে বিশেষভাবে খেতাব করার কারণ

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কুফরের ব্যাপারে কাফেরদের বাদ দিয়ে আহলে কিতাবের কথা বিশেষভাবে এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তওহীদে বিশ্বাস করতো, আর নবুওয়্যতের মূলনীতিতে বিশ্বাস করতো, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতে বিশ্বাস করতো না, অথচ তৌরাতে তাঁর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে এবং তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। তাই বিশেষভাবে আহলে কিতাবকে খেতাব করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার দলিল বর্ণনা করেছেন এবং আহলে কিতাবের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, তাই এ আয়াতে তাদেরকে বিশেষভাবে খেতাব করা হয়েছে।

আয়াতুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে "আয়াতুল্লাহ" তথা "আল্লাহর নিদর্শন সমূহ" বলতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণকে বোঝানো হয়েছে। আর কুফর শব্দ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অস্বীকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আহলে কেতাব! তোমরাতো নিজেরা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত, তোমরা তো বদনসীব, কিন্তু তাতে তোমরা ক্ষান্তও নও; বরং

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৭

অন্যদেরকেও তোমরা ঈমানের সৌভাগ্য থেকে মাহরুম করতে সচেষ্ট রয়েছে, কেন তোমাদের এ অপচেষ্টা? এমনকি যারা ইতিমধ্যেও ইসলাম কবুল করে জীবনকে ধন্য করেছে, তোমরা ইসলাম সম্পর্কে কাল্পনিক, খুঁতযুক্ত, ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট কথা প্রচার করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা কর। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তোমাদের এ জঘন্য কার্যকলাপ অজ্ঞতা প্রসূত নয়, বরং সব কিছু ভালভাবে জেনে শুনেই তোমরা করছো অথচ না জানার ভান করছো আর মনে রেখ, তোমাদের এ প্রতারণাপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আদৌ বেখবর নন, সবই তাঁর নখদর্পণে অতএব, তোমাদের অপকীর্তির শাস্তি অবধারিত।

ইহুদী চরিত্র

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা তান্তাবী তাঁর তফসীরুল জাওয়াহেরে ইহুদী চরিত্র সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার দু' ব্যক্তি এক সঙ্গে ভ্রমণরত ছিল। তন্মধ্যে একজন ছিল মযুসী, কেরমানের অধিবাসী। অপর জন ছিল ইহুদী, ইস্পাহানের অধিবাসী।

মযুসী ব্যক্তি খচ্চরে আরোহণ করেছিল, তাতে তার কিছু মাল পত্রও ছিল। আর ইহুদী ব্যক্তিটি পদব্রজেই চলছিল, তার কোন পাথেয় ছিল না। ভ্রমণরত অবস্থায় তারা এভাবে আলাপ শুরু করল–

মযুসী ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমার ধর্ম কি?

ইহুদীঃ আমার ধর্ম বিশ্বাস হলো আসমানে আমাদের উপাস্য বা মা'বুদ আছেন। তিনি বনী ইসরাঈলের মা'বুদ, আমরা তাঁর নিকট রিয্ক-দওলত চাই, স্বাস্থ্য-সুখ চাই, তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, সাহায্য করেন বনী ইসরাঈলকে তথা– ইহুদীদেরকে আর অবশিষ্ট বনী আদম যত আছে তাদের কোন সম্মান নেই, তাদের ধন-সম্পদ এমনকি প্রাণ পর্যন্ত আমার জন্য এবং আমার ধর্মাবলম্বীদের জন্য হালাল। আর যারা ইহুদী নয়, তাদের সাহায্য করা ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আমার জন্য হারাম। তখন মযুসী বললঃ

আমি বিশ্বাস করি যে, সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনা করা আমার কতর্ব্য। কারো জন্য মন্দ চিন্তা করি না, সে আমার ধর্মবলম্বী হোক বা না হোক, এমনকি যদি সে আমার প্রতি জুলুম করে তবুও তার ক্ষতি সাধরনের চিন্তা আমি করি না কেননা, আমার মা'বুদ বা উপাস্য আসমানে রয়েছেন; আর তিনি শুধু আমার উপাস্য বা পালনকর্তা নন; বরং তিনি সকলেরই উপাস্য, সকলেরই প্রতিপালক, আর তিনি সুবিচারক। তখন ইহুদী মযুসীকে বললো তাহলে তুমি তোমার ধর্মকে সাহায্য কর,

কারণ আমিও তোমার ন্যায় আদম সন্তান, অতএব, তুমি আমাকে তোমার খচ্চরে আরোহন করতে দাও, কেননা আমি বেশ ক্লান্ত। আর আমাকে খাবার দাও, কেননা আমি ক্ষুধার্ত।

তখন মযুসী তাই করলো, খাবার দিল, ইহুদীকে খচ্চরে আরোহণ করালো এবং নিজে পদব্রজে চলতে লাগলো।

যখন মযুসী ক্লান্ত হয়ে গেলো তখন ইহুদী তার খচ্চর নিয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলো।

মযুসী বললোঃ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।

ইহুদী বললোঃ আমি আমার ধর্ম সম্পর্কে তোমাকে বলিনি? আমি আমার ধর্মকে সাহায্য করব যেমন খচ্চরটিকে আমার নিকট দিয়ে তুমি তোমার ধর্ম পালন করেছ– ঠিক এমনিভাবে তোমার আমানতে খেয়ানত করার মাধ্যমে আমি আমার ধর্ম পালন করব। মযুসী তাকে ডাক দিয়ে বললঃ

তুমি কি আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে যেতে চাও? যেন হিংস্র জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলে।

কিন্তু ইহুদী একথায় কর্ণপাত না করেই চলে যায়।

অতঃপর মযুসী বললঃ হে খোদা! আমি যে তোমার আদেশ পালন করেছি এখন আমাকে সাহায্য করার মাধ্যমে তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর। ইহুদী একটু অগ্রসর হওয়ার পরই খচ্চর তার পৃষ্ঠ–দেশ থেকে ইহুদীকে ফেলে দিল, তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং খচ্চরটি তার মালিকের জন্যে দাড়িয়ে অপেক্ষ করতে লাগলো, অতঃপর মযুসী এসে তার উপর আরোহন করলো।

ইহুদী বললোঃ আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে এভাবে একা ফেলে যেয়োনা।

মযুসী ঃ তুমি কি করেছিলে? আমি বলিনি তোমাকে? আসমানে রয়েছেন আমাদের মালিক, তিনি সুবিচারক, একথা জেনেও কেন এমন কাজ করলে?

ইহুদীঃ আমাদের ধর্মের শিক্ষা এমনই, আমাদের পূর্ব পুরুষকে আমরা এমনই দেখেছি এবং তাদের অনুসরণের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই এমন কাজ আমার দ্বারা হয়েছে। অতঃপর মযুসী তাকে বহন করে তার বাড়ী পৌছে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা বর্ণনার পর লোকেরা তাকে বললো তোমার সাথে এমন জঘন্য আচরণের পর তুমি তাকে কেন বহন করে আনলে? মযুসী বললোঃ ইহুদী ধর্মের এই শিক্ষা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বলে সে আমার নিকট ওজর পেশ করেছে। আর এভাবে আমাদেরও মানুষের প্রতি দয়া করার অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই তাকে বহন করে নিয়ে এসেছি এ পর্যন্ত।

ইহুদীদের এ চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতময় সোনালী যুগে এবং তার পরবর্তীকালে, এমনকি আজও তাদের একই অভ্যাস বিদ্যমান রয়েছে।[১] পরবর্তী আয়াতের শানে নুজুলে রয়েছে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

শানে নযুল

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ শাম্মাস এবনে কাইস নামক এক ইহুদী অত্যন্ত জালেম এবং ইসলামের প্রতি অত্যধিক শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। একবার মদীনা মোনাওয়্যারায় আওস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা এক মজলিসে উপস্থিত হলেন।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে এ দু' গোত্র সর্বদা যুদ্ধরত থাকত অথচ ইসলাম কবুল করার পর শুধু যে তাদের লড়াই বন্ধ হয়েছে তাই নয়, বরং তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ভাব, তারা নিতান্ত আপনজন বা ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন করছেন। মুসলমানদের এ ঐক্য ও সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ব ছিল ইহুদীদের নিকট অসহনীয়। তাই ইসলামের চির দুশমন শাম্মাস এবনে কাইস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং তার একজন যুবক সঙ্গীকে নির্দেশ দিল আন্‌সারদের মজলিসে গমন কর এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বুয়াস যুদ্ধ ও তার পূর্বের শত্রুতার কথা আলোচনা কর, আর যুদ্ধের সময় একে অন্যের বিরুদ্ধে যে সব কবিতা পাঠ করতো সেগুলোকে আবৃত্তি কর। এ যুদ্ধে আওস গোত্র খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছিল সে সব ইতিহাস তুলে ধর।

এই ইহুদী যুবক তার প্রতি জারীকৃত আদেশ পালন করলে সঙ্গে সঙ্গে এ ষড়যন্ত্রের কুফল দেখা দিল। আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের কলহ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। পরস্পর গাল-মন্দ বিনিময়ের পর যুদ্ধের হুংকার প্রদান করা হলো, উভয়ে রণক্ষেত্রে হাযির হয়ে পুনরায় শক্তি পরীক্ষার সংকল্প প্রকাশ করে পরস্পর শ্লোগান দিতে লাগল, বর্বরতার যুগের ন্যায় কল-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। এ দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছল প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মোহাজেরদের একটি দল সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ হে মুসলমান! এখনও আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছি। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ইসলাম কবুল করার তওফিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১। তফসীরুল জাওয়াহের তানতাবী কৃত খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৯

জাহেলিয়াত বা বর্বরতার যুগের সব কথা শেষ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তবে তোমরা কি বর্বরতার যুগের অবস্থায় ফিরে যাবে? তোমরা কি পুনরায় কাফের হয়ে যাবে? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাত থেকে হাতিয়ার ফেলে দিলেন। একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবেই দূরাত্মা ইহুদীদের একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো, ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা যদি আহলে কেতাবের একদলের কথা মান, তবে তোমাদেরকে ঈমানের সম্পদ লাভে ধন্য হওয়ার পর পুনরায় তারা কাফের করে ফেলবে, ঈমানের আলো থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে, কুফরের ঘন অন্ধকারে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে অতএব এ দুবৃত্ত কাফেরদের ফাঁদে পা দিও না, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।[১]

ইসলামের দুশমনদের অনুসরণ অবৈধ

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন অবস্থাতেই কাফের মুশরকে এবং মুনাফেকদের অনুসরণ বৈধ নয়, কেননা তারা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

আশ্চর্যজনক ঈমান কার?

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একদিন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মতে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক ঈমান কার? তারা জবাব দিলেন ফেরেশতাদের। তিনি এরশাদ করলেনঃ তাদের ঈমান কেন আশ্চার্যজনক হবে? কেননা, তারা সর্বদা আল্লাহ্ পাকের হেকমত দেখছে, ফলে তাদের ঈমান স্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরামের ঈমান আশ্চর্যজনক। তিনি এরশাদ করলেনঃ তাঁদের ঈমান কেন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১১-১২
তফসীরে কবীর খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৯
খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২৭৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬

আশ্চর্যজনক হবে? কেননা তাঁদের নিকট আল্লাহর ফেরেশতারা প্রেরিত হয়, তাঁদের মোজেজা বা অলৌকিক ক্ষমতা সর্বদা প্রকাশিত হয়। অতএব, তাঁদের ঈমানও স্বাভাবিক, বিস্ময়কর নয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ তাহলে আমাদের ঈমান আশ্চার্যজনক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাদের ঈমান কেন আশ্চর্যজনক হবে? কেননা আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি, আল্লাহর ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসছে, তোমরা দেখছ এবং আমার মোযেজা সমূহ দেখার সুযোগ তোমাদের হচ্ছে অতএব, তোমাদের ঈমানও স্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক নয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি এরশাদ করুন কার ঈমান আশ্চর্যজনক? তিনি এরশাদ করলেনঃ ঈমান তাদের আশ্চর্যজনক, যারা পৃথিবীতে আসবে পরবর্তীকালে, যারা কোন নবীর জেয়ারত লাভে ধন্য হবে না। শুধু কিতাবে লেখা দেখবে ঈমান আনার কথা। তারা কোন নবীর মোযেজাও দেখবে না। অথচ আল্লাহ্ পাকের প্রতি তারা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের ঈমানই আশ্চার্যজনক।

ঈমানের হেফাজতের তাগিদ

আলোচ্য আয়াতে ঈমানের হেফাজতের তাগিদ করা হয়েছে যাতে করে ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত না করতে পারে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা কি করে কুফরী কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছো? অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের কালাম নাযিল হচ্ছে, আর স্বয়ং আল্লাহর রসূল তোমাদের মাঝে রয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কিভাবে তোমরা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করছো এবং ইহুদীদের প্ররোচনায় পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছো? অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ঈমানে দিকে আহবান করেন, কুফরী কাজ থেকে বিরত রাখেন।

হেদায়েতের দু'টি উৎস

বিখ্যাত তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক হেদায়েতের দু'টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন (এক) আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন (দুই) প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি অনাগত ভবিষ্যতে আগমনকারী সকল মানুষের জন্যে হেদায়েত রেখে গেছেন যা

সর্বকালের সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্য এক কথায় সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আর্দশ, একমাত্র অনুসরণীয়। এ পৃথিবীতে মানব জীবনে যত সমস্য দেখা দেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন। হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন, তিনি আল্লাহ পাকের হাম্‌দ বর্ণনার পর এরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহর পয়গাম বাহক আসবেন এবং আমি তার দাওয়াত কবুল করব। (অর্থাৎ এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহন করব)। আমি তোমাদের নিকট দু'টি মহান বস্তু রেখে যাচ্ছি (এক) আল্লাহ্ কিতাব পবিত্র কোরআন যার মধ্যে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর, তোমরা সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধর। (দুই) আমার আহ্‌লে বায়েত- আমি আমার আহ্‌লে বায়েত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আরও একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ আল্লাহর কিতাবই হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যে আল্লাহ্র কিতাব মেনে চলবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যে আল্লাহ্র কেতাব মানবে না সে পথভ্রষ্ট হবে।

আর তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসের ভাষ্য হলো এই যে, আমি তোমাদের নিকট এমনি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তা মজবুত ভাবে আঁকাড়ে ধরে রাখ তবে আমার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। যা রেখে যাচ্ছি তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব, যা আসমান থেকে যমিন পর্যন্ত একটি রশি, যাকে ধরে আসমান পর্যন্ত পৌঁছা যায়। দ্বিতীয় জিনিসটি হলো আমার আহলে বায়ত। হাওজে কাউসারে অবতরণের সময় এ দুটি বস্তু কাছাকাছি থাকবে। অতএব, তোমাদের দেখা উচিত আমার পর তোমরা এ দুটি বস্তুর সাথে কি ব্যবহার কর।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি (বিদায় হজ্জের) আরফার দিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দান করতে দেখেছি। তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সুদৃঢ় ভাবে আঁকাড়ে রাখ, তবে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কেতাব অন্যটি আমার আহলে বায়ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আহলে বায়তের কথা এজন্যে তাগিদ করেছেন যে, হেদায়েত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে আহলে বায়তই পথ প্রদর্শক। তাঁদের উসিলা ব্যতীত কেউ আল্লাহ্র ওলীর মর্তবায় পৌঁছতে পারে না। আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ)। অতঃপর তাঁর

সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান আসকারী (রাঃ) পর্যন্ত এই সিল্সিলা অব্যাহত থাকে। অতঃপর গাওসুল আজম হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) পর্যন্ত বেলায়েতের এই সিলসিলা জারী থাকে। হযরত মোজাদ্দেদে আল্ফেসানী (রঃ) এভাবেই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর উম্মতের অন্য ওলীগণ ও ওলামায়ে কেরামের মর্তবা। ওলামায়ে কেরাম যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী, তাই তাঁরাও আহলে বায়তের হুকুমে রয়েছেন। কেননা সকলেই আহলে বায়তের অনুসারী, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন. ওলামাগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী।

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্র দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তথা আল্লাহ্র দ্বীনকে সঠিকভাবে মেনে চলবে এবং নিজের আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে, সে হেদায়ে ত লাভ করবে, সে সরল সঠিক পূর্ণ পন্থার অনুসারী হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না।[১]

يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ
مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৫-১৬

তরজমা

(১০২) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর যতখানি ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করোনা।

(১০৩) এবং আল্লাহ্ পাকের রজ্জুকে একত্রিত হয়ে আঁকড়ে ধর। আর দলাদলি করোনা এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ কর। যখন তোমরা একে অন্যের দুশমন ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা তাঁরই নেয়ামতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে এবং তোমরা দলাদলির শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ দোযখের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ পাক তাঁর নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। হয়তো তোমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হও।

(১০৪) এবং তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে সৎ কাজের আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তারাই হবে সফলকাম।

(১০৫) এবং তোমরা সে সব লোকদের ন্যায় হয়োনা যারা দলিল প্রমাণ প্রাপ্ত হবার পরও দলাদলি করছে এবং কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুনাফেকদের গোমরাহী এবং প্রতারণা থেকে মোমেনদেরকে সতর্ক থাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদেরকে আল্লাহ্ পাককে ভয় করার, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং যাবতীয় কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ এরশাদ হয়েছে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

اتَّقُوا اللّٰهَ

দ্বিতীয়তঃ এরশাদ হয়েছে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ

তৃতীয়তঃ হুকুম হয়েছে তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

এ বর্ণনা ধারার কারণ এই, মানুষ যখনই কোন কাজ করে তখন হয় কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে করে অথবা কোন কিছুর আশায় করে। তাই সর্বপ্রথম আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে আল্লাহকে ভয় করার

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করার হুকুম রয়েছে।[১]

শানে নযুল

আল্লামা বগবী মোকাতেল এবনে হাব্বানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, বর্বরতার যুগে আওস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল চরম দুশমনী এবং লড়াই। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়্যারায় তশরীফ আনলেন তখন তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। উভয় গোত্র মুসলমান হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভাই ভাই হয়ে বাস করতে লাগল। ঘটনাক্রমে একবার আওস গোত্রের সা'লাবা এবনে গনম এবং খাজরাজ গোত্রের আসআদ এবনে জোরারার মধ্যে গোত্রীয় প্রাধান্য নিয়ে বিতর্ক হলো। সা'লাবা বললেনঃ আমরাই আওস গোত্রের লোক। আমাদের গোত্রেই রয়েছেন খোজাআ এবনে সাবেত (রাঃ) যাঁর একজনের সাক্ষ্য দু' সাক্ষীর সমান গণ্য করা হয়। আর আমাদের গোত্রেই রয়েছেন হানজালা (রাঃ) যাঁকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন এবং আমাদের গোত্রেই রয়েছেন আসেম এবনে সাবেত এবং আমাদের মধ্যেই রয়েছেন হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ), যাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আর বনু কোরায়জার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেছিলেন।

অপরপক্ষে খাজরাজ গোত্রের আসআদ বললেনঃ আমাদের গোত্রেই রয়েছেন চার ব্যক্তি যাঁরা পবিত্র কোরআনের হাফেজ, ক্বারী এবং আলেম হয়েছেন, তাঁরা হলেন উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), মাআজ এবনে জবল (রাঃ), যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) এবং আবু যায়েদ (রাঃ)। আর আমাদের মধ্যেই রয়েছেন সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) যিনি আনসারের খতীব এবং সর্দার পদে অধিষ্ঠিত। তাদের উভয়ের বিতর্ক এভাবে শুরু হলো এবং পরস্পরের প্রতি ক্রোধ এসে গেল। উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এমনকি উভয় গোত্রের লোকেরা হাতিয়ার নিয়ে হাযির হলো, এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

আল্লাহর ভয় হলো ঈমানের চিহ্ন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমকে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা, যে প্রকৃত মোমেন হয়, যার অন্তরে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬০-৬১
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান থাকে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান থাকে সে অবশ্যই আল্লাহ পাককে ভয় করবে, আর এ ভয়ের তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, কোন প্রকার নাফরমানী না করা, আল্লাহ পাককে স্মরণ করা এবং তাঁর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আল্লাহকে ভয় করার হক্ব সে পর্যন্ত মানুষ আদায় করতে পারে না যে পর্যন্ত সে তার রসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে।

অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে এ আয়াত মন্‌সুখ হয়েছে অন্য একখানি আয়াত দ্বারা। সে আয়াত হলোঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের সাধ্য মোতাবেক। তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মূলত আয়াতটি মন্‌সুখ হয়নি; বরং আয়াতের অর্থ হলো তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে থাক, আল্লাহর হুকুম পালনে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করোনা এবং সুবিচার কায়েম কর, সুবিচারের উপর সুদৃঢ় থাক। এমনকি আদল বা সুবিচারের নিয়ম কানুন জারী কর এবং নিজের পিতা-মাতা এবং সন্তানদের ব্যাপারেও সুবিচার কায়েম কর। এরপর তিনি বলেছেন পূর্ণ মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করোনা- এর তাৎপর্য হলো সারাটি জীবন ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে থাক, এমনকি এ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হও, কেননা হাদীসে শরীফে আছে–

تحشرون كما تموتون وتموتون كما تحيون

অর্থাৎ তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন তোমাদের মৃত্যু হবে। আর তোমাদের মৃত্যু তেমনই হবে যেমন তোমাদের জীবন হবে। অতএব জীবনকে এভাবে গড়তে হবে যেন মৃত্যু প্রকৃত মুসলমান অবস্থায় আসে। মসনদে আহমদে রয়েছে যে, লোকেরা বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও সেখানেই ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল লাঠি। তিনি বললেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তেলাওয়াত করে বলেছেনঃ

যদি জাক্কুমের একটি ফোঁটা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয় তবে পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর কেউ তা খেতে পারবে না। অতএব তোমরা চিন্তা করো দোযখীদের অবস্থা। যাদের পানাহার হবে একমাত্র জাক্কুম। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং বেহেশতবাসী হতে চায় তার কর্তব্য হলো মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রাখে। আর মানুষের সাথে সেই ব্যবহার করে যা সে নিজের ব্যাপারে পছন্দ করে। (মসনদে আহমদ)

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি, "তোমরা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দেবেন এই আশা রাখবে"। (মুসলিম শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের ফরমান হলো এই যে, আমার বন্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা পোষণ করবে আমি তার সাথে তেমন ব্যবহারই করবো। যদি সে আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে তবে সে আমার নিকট ভাল ব্যবহারই পাবে। পক্ষান্তরে, যদি সে আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ না করে তবে তার সঙ্গে আমি তেমন ব্যবহারই করবো। (মসনদে আহমদ)

এই হাদীসের প্রথমাংশ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও রয়েছে। মসনদে বাজ্যারে একটি ঘটনা রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীকে তাঁর রুগ্ন অবস্থায় দেখতে গেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন শরীর কেমন? সাহাবী জবাব দিলেন- আলহামদুলিল্লাহ! এখন ভাল আছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমতের আশা করছি। তাঁর আযাবকে ভয় করছি। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ শোন, এমন সময় যে অন্তরে ভয় এবং আশা একত্রিত হয় আল্লাহ্ পাক তাকে তার আশা করা বস্তু দান করে থাকেন। আর যে বিষয় থেকে সে ভয় করে আল্লাহ্ পাক তাকে তা থেকে রক্ষা করেন।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর"।

অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন কর এবং দলাদলি ও মতভেদ থেকে রক্ষা কর। আলোচ্য আয়াতে "হাবলুল্লাহ" শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, "হাবলুল্লাহ" অর্থ হলো পবিত্র কোরআন। কেননা হাদীস শরীফে আছে পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের মজবুত রজ্জু এবং তাঁর সরল সঠিক পথ। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে আল্লাহর কিতাব আসমান থেকে জমিনের দিকে আল্লাহ পাকের একটি রজ্জু। আর পবিত্র কোরআন হলো নূর। এটি রোগ নিরাময়কারী এবং উপকারী। আর এর উপর যে আমল করবে পবিত্র কোরআন তার হেফাজতের মাধ্যম। আর এর অনুসরণকারীর জন্যে এটি হলো

নাজাত। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তিনটি কথায় খুশী হন আর তিনটি কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হন।

(১) তোমরা এক আল্লাহ্ এবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।

(২) আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, পরস্পর দলাদলি করোনা।

(৩) মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের কল্যাণ কামনা কর।

পক্ষান্তরে অহেতুক কথাবার্তা, অধিক প্রশ্ন করা এবং অর্থ সম্পদের অপচয়- এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন না।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই উম্মতের ৭৩টি ফেরকা হয়েছে কিন্তু সে ফেরকাই শুধু নাজাত পাবে যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

আর তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন।

বর্বরতার যুগে আওস এবং খাজরাজ- এ দু' গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত, তাদের অব্যাহত শত্রুতা উভয় গোত্রের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ইসলাম কবুল করার কারণে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব সৃষ্টি হয়। তারা নিতান্ত ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন করেন, এটি ছিল আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত, এ নেয়ামতকে স্মরণ করার আদেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে তারা যেন দোযখের এক প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ইসলামের নেয়ামত তাদেরকে দান করেছেন, ফলে দোযখের শাস্তি থেকে তারা নাজাত পাবে। অতএব সর্বপ্রথম নেয়ামত হলো ইসলাম আর দ্বিতীয় নেয়ামত হলো পরস্পরের সম্প্রীতি আর তৃতীয় নেয়ামত হলো ইসলাম এবং পরস্পরের সম্প্রীতির বরকতে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত লাভ। এ নেয়ামত সমূহ লাভের পেছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস। আমরা এ পর্যায়ে এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করতে চাই। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– আওস এবং খাজরাজ উভয় গোত্রের পূর্ব পুরুষ একই ছিল। এক ব্যক্তির হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হলো এবং এ শত্রুতা পরস্পরের যুদ্ধে

রূপান্তরিত হলো। দীর্ঘ ১২০ বছর পর্যন্ত এ সংঘাত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ্ পাকের রহমত হয় এবং যুদ্ধের এ লেলিহান শিখা নির্বাপিত হয়। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের বরকতে তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাদের ইসলাম গ্রহন এবং পরস্পরের সম্প্রীতির সূচনা এভাবে হয় যে, বনী আমর এবনে আওফ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল সোয়াইদ এবনে সামেত। সে গোত্রে এ ব্যক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ছিল। এজন্যে লোকেরা তাকে কামেল বলতো। সোয়াইদ হজ্জ অথবা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আসে। তখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর্বিভাব হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁকে মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাই তিনি মদীনা থেকে আগত সোয়াইদকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। সোয়াইদ বললো, হয়তো আপনার নিকট এমন জিনিস আছে যা আমার নিকট আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার নিকট কি আছে? সোয়াইদ বললোঃ লোকমান হাকীমের বাণী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমার সামনে পেশ কর। সোয়াইদ সেই বাণী পাঠ করে শোনায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এটি ভাল জিনিস তবে আমার কাছে যা আছে তা এর চেয়েও ভাল। আমার কাছে পবিত্র কোরআন রয়েছে, যাকে আল্লাহ্ পাক নূর এবং হেদায়েত স্বরূপ অবতরণ করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। সোয়াইদ বললো, এটি অত্যন্ত ভাল জিনিস, এরপর সে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলো। এর অল্প কিছুদিন পরই বুয়াসের যুদ্ধে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করলো। আওস গোত্রের লোকদের বক্তব্য হলো এই যে, তাকে মুসলমান অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে।

এরপর আবুল হায়সার আনাস এবনে রাফে বনী আশহাল গোত্রের একদল লোক নিয়ে মক্কা শরীফে আসে যাদের মধ্যে ইয়াস এবনে মাআজ ছিল, তারা এসেছিল মক্কার কোরায়শদের সঙ্গে একটি পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করতে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ তোমরা যে কাজের জন্যে এসেছ তার চেয়ে কোন উত্তম কাজের আকাঙ্খা করবে তোমরা? তারা বললোঃ সে কি কাজ? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর বন্দাদের নিকট। আমি তাদেরকে তৌহিদে বিশ্বাস করার আহবান জানাই অর্থাৎ তারা যেন এক আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে। আল্লাহ্ পাক আমার নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। এরপর তিনি তাদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিলেন।

তাদের মধ্যে ইয়াস এবনে মাআজ নামক একজন যুবক ছিল। সে বললো, নিঃসন্দেহে এটি সেই কাজের চেয়ে উত্তম কাজ যার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। আবু হায়সা নামক এক ব্যক্তি ইয়াসকে লক্ষ্য করে কংকর নিক্ষেপ করলো এবং বললো এসব কথা ছাড়, আমরা অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে চলে এলেন এবং তারা মদীনা প্রত্যাবর্তন করলো। এরপর আওস ও খাজরাজের মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ হলো। অতঃপর ইয়াসের ইন্তেকাল হলো।

এরপর হজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে আগত একটি দলের সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথা বললেন। এ দলে ছয় ব্যক্তি ছিল। আসআদ এবনে জোররা, আওফ এবনে হারেস, নাফে এবনে মালেক, আতিয়াহ এবনে আমের, আকাবা এবনে আমের এবং যাবের এবনে আবদুল্লাহ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করায় তারা বললোঃ আমরা খাজরাজ গোত্রের লোক, তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি ইহুদীদের বন্ধু? তারা বললো- জ্বী হ্যাঁ। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি বসে আমার কথা শুনবে না? তারা বললো, অবশ্যই। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনালে তারা সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের মুসলমান হওয়ার একটা প্রকাশ্য কারণ এই ছিল যে, তারা ইহুদীদের সঙ্গে বসবাস করতো। এরা ছিল মূর্তি পূজক, পৌত্তলিক। কখনো বিতর্ক হলে ইহুদীরা বলতো অদূর ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। আমরা তাঁর অনুসরণ করবো এবং তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে আদ জাতির ন্যায় তোমাদেরকে হত্যা করবো। মদীনা থেকে আগত এই দল যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শুনলো তখন একে অন্যকে বলতে লাগল। ইনিই সেই নবী, যাঁর নাম নিয়ে ইহুদীরা আমাদেরকে ধমক দেয়। এখন আমাদের আগে যেন ইহুদীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে না পারে। এরপর তারা সকলে ইসলাম কবুল করলো এবং মদীনা প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা প্রচার করতে লাগলো।

এর পরবর্তী বছর হজ্জের সময় মদীনা শরীফ থেকে ১২ জন লোক আসলো। আসআদ এবনে জোরারা, আওফ এবনে আফরা, মাআজ এবনে আফরা, রাফে এবনে মালেক আজলানী, জাকোয়ান এবনে আবদুল কায়েস, ওবাদা এবনে সামেত, যায়েদ এবনে সা'লাবা, আব্বাস এবনে ওবাদা, আকাবা এবনে আমের, আতিয়া এবনে আমের- এরা সকলেই খাজরাজ গোত্রের লোক ছিল। আর আওস গোত্রের দু' ব্যক্তি ছিল- আবুল হায়সাম এবং ওয়াইমের এবনে সায়েদা (রাঃ)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে এ শর্তে বয়আত গ্রহণ করলেন যে, তারা আল্লাহর সাথে শেরক করবে না, ব্যাভিচার করবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি তোমরা শর্তগুলো পালন কর তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। আর যদি এর মধ্যে কিছু এদিক-সেদিক কর তবে যদি দুনিয়াতে শাস্তি ভোগের ব্যবস্থা হয়, তবে গুনাহ মাফ করা হবে। আর যদি তোমাদের অপরাধ মানুষের মধ্যে জানাজানি না হয় তবে তোমাদের ব্যাপার আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে মাফ করবেন অথবা শাস্তি দান করবেন। মদীনাবাসী মুসলমানদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেবার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে মাসআব এবনে উমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন তাদেরকে তুমি পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য শিক্ষা দান কর। মদীনা শরীফে তাঁর খেতাব হলো পবিত্র কোরআনের শিক্ষক। তিনি আসআদ এবনে জোরারার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। এর কিছুদিন পর আসআদ এবনে জোরারা (রাঃ) মাসআব (রাঃ)-কে নিয়ে বনী জাফর গোত্রের বাগানে গমন করলেন।

সা'দ এবং আছিদ বনী আশহাল গোত্রের সর্দার ছিল। অনেক কথা-বার্তার পর তারাও ইসলাম কবুল করলো। এর ফলে ঐ গোত্রের সমস্ত লোক ইসলাম কবুল করলেন।

ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, এরপর মাসআব এবনে উমায়ের (রাঃ) মক্কা প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ৭০ জন লোক, যারা হজ্জের জন্য মক্কা এসেছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভে তারা ধন্য হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। শুধু তাই নয়; বরং জান মালের কোরবাণীর বিনিময়ে ইসলামকে সাহায্য করার শপথ গ্রহণ করলেন তারা এবং মজলুম মুসলমানদেরকে মদীনায় আশ্রয় দেয়ার অঙ্গীকার করে তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে তাঁদের দ্বারা ইসলামের জয়যাত্রার নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

মদীনাবাসীর সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈঠক যদিও গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তবু ধীরে ধীরে এ ঘটনার প্রচার শুরু হয়ে যায়। মক্কার পৌত্তলিকরা এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে রাগান্বিত হলো এবং প্রতিশোধ স্বরূপ মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতন পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়ে দেয়। নির্যাতীত অত্যাচারিত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কিছু

ভাই দান করেছেন এবং একটি শান্তি কেন্দ্রও দান করেছেন। তোমরা এখান থেকে হিজরত করে মদীনা চলে যাও। তোমাদের আনসারী ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন কর। এ হুকুম লাভের পর সর্বপ্রথম সালমা এবনে আবদুল্লাহ মখজুমির ভাই মদীনা শরীফে হিজরত করলেন। এরপর আমর এবনে রাবিয়া এরপর আবদুল্লাহ এবনে জাহাশ, এরপর দলে দলে সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্য তথা ইসলামের জন্যে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন। আর এভাবে আল্লাহ পাক মদীনার অধিবাসী আওস এবং খাজরাজ গোত্রকে এক, অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য করে দিলেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা ছিল শত বছর ধরে যুদ্ধরত। প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপনের তা'লীম দিলেন। আল্লাহ পাক এ দানের কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।[১]

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত দু' প্রকার (১) দুনিয়ার জিন্দেগীর নেয়ামত। (২) আখেরাতের জিন্দেগীর নেয়ামত। পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার জিন্দেগীতে আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের নেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

এরশাদ হয়েছে, তোমরা দোযখের এক প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলে কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ঈমানের তৌফিক দানের মাধ্যমে দোযখের কঠোর শাস্তি থেকে নাজাত দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁরই নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে থাকেন, যাতে করে তোমরা হেদায়েত লাভ কর এবং হেদায়েতের উপর সুদৃঢ় থাক।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ

আর তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটি দল তৈরী হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই হবে অবশেষে সফলকাম।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদেরকে তাদের দুটি অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১। তফসীরে মাজহারী,খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২১-২৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬৩-৬৪

(১) তারা আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল ছিল। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ

(হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নাফরমানী কর?)

(২) তারা শুধু যে আল্লাহর নাফরমান ছিল তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও কুফর ও নাফরমানীর কাজে মশগুল করার চেষ্টা করতো। তাই তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখ?

অতঃপর আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং সর্বপ্রথম তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার এবং পরিপূর্ণ ঈমান অর্জনের তাগিদ করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যতখানি ভয় করা উচিত। আর প্রকৃত মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করোনা। অতঃপর মুসলমানদেরকে আলোচ্য আয়াতে অন্যদেরকে সৎ কাজ এবং ঈমানী জিন্দেগী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার তাগিদ করা হয়েছে।[১]

তাই এরশাদ হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা হবে কল্যাণের আহ্বায়ক এবং সৎ কাজের নির্দেশক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী, যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সাফল্য হবে সুনিশ্চিত। তারা মানুষকে কুফর, শেরক, বেদআত, কুপ্রথা, কুসংস্কার, অবিচার-অনাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচার থেকে মানব জাতিকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে। এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের উচ্চ মর্তবা এবং সাফল্য সুনিশ্চিত হয়ে আছে। যদিও এ আদেশ সকল মোমেনের প্রতি কিন্তু মোমেনদের কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের দায়িত্ব পালন করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এ দায়িত্ব পালন না করে তথা সকলেই গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে থাকে তবে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-১২

সকলকেই অপরাধী বলে বিবেচনা করা হবে। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাকবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করবেন এবং তখন তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না।[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তার কর্তব্য হলো শক্তি দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করা। যদি এমন শক্তির অভাব থাকে তাহলে মৌখিক প্রতিবাদ করা। যদি এ শক্তিও না থাকে তবে অন্তরে সেই মন্দ কাজকে মন্দ বলে জানা, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্ন হতে পারে যে, যারা নিজেরা সৎ কাজ করেনা তারা কি অন্যদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দিতে পারবে? এ প্রশ্নের জবাব তফসীরে নুরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে (তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন, আর তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরও তারা পরস্পর মতভেদ করেছে, যেমন ইহুদীদের মধ্যে ৭২ ফেরকা হয়েছিল।

বস্তুতঃ যারা নিজেদের প্রবৃত্তির বশে পার্থিব স্বার্থের মোহে শরীয়তের মূলনীতিতে মতবিরোধ করে এবং ফেরকাবন্দীর পথ উন্মুক্ত করে তারা মুসলিম জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে এবং ফেরকাবন্দীর ন্যায় সর্বনাশা কাজ পরিহার করতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের মহান আদর্শে অবিচল থাকার আহবান জানানো হয়েছে। কিন্তু যারা এ আহবানে সাড়া দেবে না, বরং ফেরকাবন্দী এবং উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন, কঠোর এবং গুরুতর শাস্তি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩০

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۚ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ
فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾
وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

তরজমা

(১০৬) সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জল হবে (আনন্দিত হবে) এবং বহু মুখমণ্ডল কালো হবে (চিন্তায় মলিন হবে)। যাদের মুখমন্ডল মলিন হবে তাদেরকে আল্লাহ পাক বলবেন, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়েছিলে? এখন কাফের হওয়ার শাস্তি ভোগ কর।

(১০৭) এবং যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহ পাকের রহমতের সাগরে নিমজ্জিত থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(১০৮) এই সমস্ত আল্লাহ পাকের নিদর্শন, যা আপনার নিকট (হে রসূল!) ঠিকভাবে বর্ণনা করছি এবং আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর উপর অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না।

(১০৯) এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের এবং সব বিষয়ই বিচারের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন কারো মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে আলোকিত, শুভ্র, সমুজ্জল এবং জ্যোতির্ময় হবে, জীবন সাধনার সার্থকতা, প্রাপ্ত মান মর্যাদা, লব্ধ অনন্ত অসীম নেয়ামতের কারণে তারা আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে। অন্যদিকে যার কাফের মুনাফেক তাদের নাফরমানী ও পাপাচারের কালিমায় তাদের চেহারা হবে কালো। লজ্জা এবং অবমাননা তাদের চোখে মুখেই প্রকাশ পাবে। যারা সাধারণ কাফের বা যারা ঈমান আনার পর তা পরিত্যাগ করে

মুরতাদ হয়েছে এমনিভাবে যারা ঈমানদার নয় অথচ ঈমানের দাবীদার হয়ে মুনাফেকী করে, যারা ফাসেক, ফাজের, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান এরা সকলেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের নিকট প্রেরিত আসমানী কিতাব তৌরাত-ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় এবং গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করে। তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, ঐ কঠোর কঠিন শাস্তি দেখার পর তাদের চেহারা হয়ে কৃষ্ণ বর্ণ। এ অবস্থায়ই হবে কাফের এবং মুশরেকদের, নাস্তি,ক বে-দ্বীনদের। এমনিভাবে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার হয় অথচ কার্যত তারা বেদআতে লিপ্ত হয় অর্থাৎ তারা ধর্মের নামে অধর্মের কাজে মশগুল হয়, অলীক এবং অমূলক বিষয় সমূহকে দ্বীন ইসলামের বিধান মনে করে আমল করে তাদের চেহারা হবে কেয়ামতের দিন কৃষ্ণ বর্ণ। অতএব, যারা কুফর ও নাফরমানী করে বা কুফর সুলভ আচরণ করে তাদের সকলেরই চেহারা কেয়ামতের দিন কালো হবে।

কেয়ামতের দিন যাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময়

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা জ্যোতির্ময় হবে এবং আহলে বেদআতীর চেহারা কালো হবে।[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, যারা মুনাফেক তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন কালো হবে। আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছিলে? অতএব, এখন তোমাদের কুফর ও নাফরমানীর পরিণামে আযাব আস্বাদন কর। আর যাদের মুখমণ্ডল হবে ঈমানের নূরে আলোকিত, শুভ্র-সমুজ্জল তারা আল্লাহর রহমতের মহসমুদ্রে থাকবে চির নিমজ্জিত।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) যখন দামেস্কের মসজিদের সিঁড়িতে খারেজীদের মুখ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছিলেন তখন বলেছিলেন, এরাই দোযখের কুকুর, এদের চেয়ে মন্দ লোক পৃথিবীতে আর কেউ নয়, এদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা উত্তম মুজাহিদ।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে এ উম্মতের এবং পূর্ববর্তী উম্মতের বেদআতীদেরকে সম্পর্কে। হযরত আবু উমামা (রাঃ)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-১৩০

এবং কাতাদা (রাঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। আর ইমাম আহমদ (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন এরা হলো- "খারেজী"। আর হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, এরা হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্য পরিহার করে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিত। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি দেখতে থাকবো যে, হাউজে কাওসারে আমার নেকট কারা আসতে থাকবে। তখন কিছু লোককে আমার নিকট আসতে দেয়া হবে না। আমি আরজ করবোঃ হে পরওয়ারদেগার! এরাতো আমারই উম্মত। আমাকে জবাব দেয়া হবে যে, আপনি কি জানেন আপনার পরে এরা কি করেছে? আল্লাহর শপথ! এরা আপনার হেদায়েত থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেই ফেতনা সমূহ আসার পূর্বে তোমরা নেক আমল কর যা আধার রাতের অংশ স্বরূপ ছড়িয়ে পড়বে। সকালে মানুষ মোমেন থাকবে কিন্তু সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে সন্ধ্যায় মোমেন থাকবে সকালে হবে কাফের। দ্বীন ইসলামকে দুনিয়ার সামান্যতম সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রয় করে দেবে। (আহমদ, মুসলিম, তিরমিজী)

কারো কারো মতে এ আয়াত খানি মুরতাদদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আয়াতটি সেই আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা হযরত মূসা (আঃ) এবং তৌরাতের প্রতি ঈমান আনার পর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে। কেননা সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতি থেকে তাঁর প্রতি ঈমানের শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন কিন্তু তারা দুনিয়াতে আসার পর কাফের হয়েছে। অথবা কথাটি এভাবে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণে পরিপূর্ণ, তারা ইচ্ছা করলে এই দলিল প্রমাণ দেখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে পারতো কিন্তু তারা ঈমান আনেনি।[১]

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

(১) তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৪

অর্থাৎ যাদের চেহারা কেয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় হবে তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত, তারা আল্লাহ্ পাকের রহমতের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকবে। এতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কোন মোমেন সারাটি জীবন আল্লাহর বন্দেগীতে অতিবাহিত করে তবু জান্নাতে তার প্রবেশ শুধু আল্লাহ্ পাকের রহমতের কারণেই হবে।[১] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সততা অবলম্বন কর। মধ্যম পন্থায় চল এবং সন্তুষ্ট থাক। কেননা কোন ব্যক্তিকে তার আমল জান্নাতে নেবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনাকেও কি আমল জান্নাতে নেবে না? তিনি এরশাদ করলেন, না। তবে আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং মাগফেরাত আমাকে ঢেকে রাখবে।

মূলতঃ জান্নাতে প্রবেশাধিকার শুধু আল্লাহ্ পাকের দয়া এবং রহমতেই সম্ভব তবে জান্নাতের মর্যাদা ও উন্নতি লাভের জন্যে আমল কারণ হবে যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদের (রাঃ) কথা এ বিষয়েই ইঙ্গিত করে। তিনি বলেছেনঃ তোমরা পুলসিরাত পার হবে আল্লাহ্ পাকের দয়া মায়া এবং মাগফেরাতের বরকতে, জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতে এবং জান্নাতের বিভিন্ন মর্তবায় উন্নতি লাভ করবে তোমাদের নেক আমলের হিসেবে।[২]

هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ

ইতিপূর্বে এরশাদ হয়েছে যাদের চেহারা জ্যোতির্ময় হবে তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে। এতদ্বারা যদি কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তারা কতদিন আল্লাহর রহমতে থাকবে? তারই জবাবে এ বাক্যে এরশাদ হয়েছে যে, তারা চিরদিন জান্নাতে থাকবে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' শব্দটির তাৎপর্য হলো জান্নাত অর্থাৎ তারা চিরদিন জান্নাতে থাকবে।[৩]

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ এ আয়াত সমূহ যার মধ্যে জান্নাত এবং রহমতের অঙ্গীকার রয়েছে, আর আল্লাহ্র নাফরমানদের জন্যে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব (হে রসূল!) আপনার নিকট সত্য ঘোষণা হিসেবে পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, এতে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৫
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭৩

বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, যারা আল্লাহর অনুগত, তাঁর রসূলের অনুসারী, তারা অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধী, তাদের শাস্তি অবধারিত।

কেননা আল্লাহ পাক সুবিচারক, তিনি সকলের প্রতি সুবিচার করেন। কারো প্রতি কখনও জুলুম করেন না। তাঁর সম্পর্কে জুলুম শুধু অসম্ভবই নয়; অচিন্তনীয়ও। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করার কোন ইচ্ছা রাখেন না তথা নেককারদের সওয়াব কম করা অথবা অপরাধীদের শাস্তি অপরাধের চেয়েও বেশী দেয়া এসবই জুলুম, আর আল্লাহ পাক তা কোন অবস্থাতেই করেন না, বরং দয়া করেন এবং অপরাধীকে ক্ষমা করেন এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য, আর আল্লাহর সাথে শেরক করা তথা কাফের হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ। অতএব তার শাস্তিও হবে চিরকাল।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আর আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, সব কিছুর মালিকানা তাঁরই আর সব কিছু তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে আর তিনি নেককারকে তার নেকীর সওয়াব দান করবেন এবং পাপীষ্ঠকে তার পাপাচারের শাস্তি বিধান করবেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ
اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ
اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ
يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

তরজমা

(১১০) পৃথিবীতে প্রেরিত সকল উম্মতের মধ্যে (হে মোমেনগণ!) তোমরাই উত্তম দল কারণ তোমাদেরকে মানব জাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আন আর আহলে কেতাবরাও যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্যে ভালো হত। তাদের মধ্যে কিছু লোক মোমেন রয়েছে তবে তাদের অধিকাংশই নাফরমান।

(১১১) মৌখিক কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে (পলায়ন করবে), অতঃপর তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না।

(১১২) তারা আল্লাহ্ পাকের অথবা মানুষের আশ্রয় ব্যতীত যেখানেই থাকে, তাদের প্রতি অপমান নির্ধারিত হয়ে আছে। তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। আর পর মুখাপেক্ষিতা তাদের জন্যে অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, আর এজন্যেও যে, তারা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার নবম রুকুতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ

এতদ্বারা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর দশম রুকুর প্রারম্ভে اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ এ আয়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতের কেবলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এরপর একাদশ রুকুতে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ এ আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার কিতাব এবং শরীয়তের দৃঢ়তা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে, এরশাদ হয়েছে- হে মোমেনগণ! তোমরাই পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মহান আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানে তোমাদের এ সৌভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত। এ সম্পর্কে অতীত কালের নবীগণকে ওয়াকেফহাল করা হয়েছে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ

নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ কেননা, তাদেরকে প্রদত্ত জীবন বিধান পূর্ণ পরিণত, চিরন্তন এবং সার্বজনীন। জ্ঞানের সকল দ্বার এ উম্মতের জন্যে উম্মুক্ত, এ উম্মত কোন বিশেষ দেশ, গোত্র বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমগ্র বিশ্বই এ উম্মতের কর্মক্ষেত্র, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনই এ উম্মতের লক্ষ্য আর এ উদ্দেশ্যেই এ উম্মতের সৃষ্টি। হে মোমেনগণ! তোমাদের কাজ হলো সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) একরামার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মালেক এবনু দ্দাইফ এবং ওহাব এবনে ইয়াহুদ দুজনই ইহুদী ছিল। এ ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) এবং হযরত সালেম (রাঃ)-কে বলে, আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম, তোমাদের ধর্ম থেকে আমাদের ধর্মও উত্তম। ইহুদীদের এ অন্যায় আস্ফালনের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

উত্তম উম্মত হওয়ার তাপর্য

আলোচ্য আয়াতে كُنْتُمْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি দ্বারা অতীত কাল বোঝায় যার অর্থ হলো তোমরা উত্তম উম্মত ছিলে, এতে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, এ উম্মত ইতিপূর্বেও উত্তম ছিল। তফসীরকারগণ একথার ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম রাজী (রাঃ) লিখেছেন, এর তাৎপর্য হলো (১) 'কুনতুম' 'খোলেকতুম' অর্থাৎ তোমাদেরকে উত্তম উম্মত রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা এর অর্থ হলো তোমরা পূর্বে উত্তম উম্মত ছিলে এর অর্থ এই নয় যে পূর্বেই ছিলে বর্তমানে উত্তম থাকবে না, বরং অর্থ হলো পূর্বে যেমন উত্তম উম্মত ছিলে বর্তমানেও রয়েছ এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

(২) অথবা এর অর্থ হলো তোমরা মহান আল্লাহ পাকের জ্ঞানে উত্তম উম্মত ছিলে।

(৩) এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে তোমাদেরকে উত্তম উম্মত বলে স্মরণ করা হতো।

(৪) লওহে মাহ্ফুজে তোমাদের গুণ লিপিবদ্ধ আছে যে, তোমরা উত্তম উম্মত।

(৫) তোমরা উত্তম কেননা, সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই তোমাদের আবির্ভাব।[২]

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন যে, 'কুনতুম' শব্দটির মোখাতেব হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭৮

এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, 'কুনতুম' খেতাবটি এ উম্মতের প্রথম কাতারের লোকদের জন্যে, যারা পরবর্তীতে এসেছে তাদের জন্যে নয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এরা সেসব লোক যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরও বলেছেনঃ যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে 'কুনতুম' এর স্থলে 'আনতুম' বলতেন, কিন্তু তিনি 'কুনতুম' বলেছেন আর তা বলেছেন সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) উদ্দেশ্যে এবং সেসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ন্যায় কাজ করেছেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ শব্দটির তাৎপর্য হিসেবে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এতদ্বারা বোঝানো হয়েছে কেননা, সমগ্র উম্মতে ইসলামিয়া সকল উম্মত থেকে উত্তম। আর এ উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) যুগ উত্তম। হাদীস শরীফে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ না করি সে পর্যন্ত অন্য আম্বিয়াদের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ হারাম করা হয়েছে। এমনিভাবে যে পর্যন্ত আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করে সে পর্যন্ত অন্য উম্মতদের বেহেশতে প্রবেশ হারাম করা হয়েছে। (তেবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে পর্যন্ত আমি এবং আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করি সে পর্যন্ত অন্য সকল উম্মতের জন্যে বেহেশতে প্রবেশ হারাম করা হয়েছে। হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার নিশ্চিত আশা রয়েছে যে, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে, এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ যারা আমার অনুসারী হবে, তারা জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হবে, এরপর এরশাদ করেছেন, আমি আশা করি যে, তারা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। তিরমিজী শরীফে অন্য একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের ১২০টি কাতার হবে। তন্মধ্যে ৮০টি কাতার এই উম্মতের আর অবশিষ্ট কাতার অন্য উম্মতদের হবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মোহাম্মদিয়া সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং সর্বোত্তম। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৮

হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাতে তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এ উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত ঘোষণা করার কারণ এই যে, এ উম্মতের নেক আমল, চরিত্র মাধুর্য এবং আন্তরিকতা দেখে অন্য মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে কারণ এ উম্মত অন্যদের জন্যে সবচেয়ে বেশী উপকারী। বর্ণিত আছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি এরশাদ করেনঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী কোরআনে করীম তেলাওয়াত করে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার, যে সবচেয়ে বেশী ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, যে সবচেয়ে বেশী মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখে। আল্লামা এবনে কাসীর (রাঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে যে উত্তম উম্মত বলা হয়েছে তাতে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদিয়া এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ উম্মতের উত্তম হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো এই যে, এ উম্মতের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি, তাঁর ফজিলত সবার উপরে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সর্বত্র স্বীকৃত। তাঁর শরীয়ত পূর্ণ পরিণত, যুক্তি সঙ্গত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত।

শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার প্রমাণ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমাকে এমন নেয়ামত সমূহ দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! সে নেয়ামতগুলো কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ

(১) আমাকে রো'ব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (অর্থাৎ দুশমন তাঁকে অত্যন্ত ভয় করতো, তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতো)।

(২) আমাকে জমিনের চাবি প্রদান করা হয়েছে, আমার নাম আহমদ রাখা হয়েছে, আমার জন্যে মাটিকে পাক ঘোষণা করা হয়েছে, আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বানানো হয়েছে। (মসনদে আহমদ)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছেন যে, আমি তোমার পরে এক উম্মত সৃষ্টি করবো যারা শান্তি লাভ করলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আর বিপদগ্রস্ত হলে সওয়াবের আশা করবে এবং সবর অবলম্বন করবে। অথচ তাদের এল্‌ম এবং হেল্‌ম থাকবে না। ঈসা (আঃ) আশ্চর্যন্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হেল্‌ম তথা গাম্ভীর্যতা এবং জ্ঞান ব্যতীত এ কাজ কি করে সম্ভব হবে?

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমি তাদেরকে নিজের এল্‌ম এবং হেল্‌ম দান করবো।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ উম্মতের ফজিলত সম্পর্কে আরো বহু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মত থেকে ৭০ হাজার লোক হিসেব ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের চেহারা ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে আরজ করলাম, এ সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ প্রত্যেকের সঙ্গে আরো এক হাজার লোক অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তাহলে তো বিনা হিসেবে প্রবেশকারীদের মধ্যে গ্রাম গ্রামান্তরের লোকও অন্তর্ভুক্ত হবে। (মসনদে আহমদ)

হযরত ওমর (রাঃ) এ খোশ খবরী শ্রবণ করে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বিনা হিসেবে বেহেশত প্রবশেকারীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার আবেদন করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করেছি। তখন আমি এই খোশ খবরী পেয়েছি যে, প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও ৭০ হাজারকে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরো বরকতের দোয়া করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি তাও করেছি। তখন আমাকে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে ৭০ হাজার লোককে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে বলে খোশ খবরী জানানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আরো কিছু বৃদ্ধির কথা বলতেন! তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমাকে আরও অধিক দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি তাঁর দস্তে মুবারককে সম্প্রসারিত করে দেখিয়ে দিলেনঃ এভাবে।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে যদি আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করেন তবে আল্লাহ্ পাকই জানেন যে কত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মসনদে আহমদ)

হযরত সওবান (রাঃ) হেম্মাস নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আবদুল্লাহ এবনে কোরত তখন হেম্মাসের শাসক ছিলেন। তিনি হযরত সওবান (রাঃ)-কে রুগ্ন অবস্থায় দেখতে আসতে পারেননি, এক ব্যক্তি তাঁর খোঁজ খবর নিতে আসলে তিনি বললেন তুমি লিখতে জান? সে বললো জ্বি-হ্যাঁ। তিনি বললেন লেখ, এই চিঠি আমীর আবদুল্লাহ এবনে কোরতের নিকট সওবানের পক্ষ থেকে, যিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরূদ শরীফের পর জানানো যাচ্ছে যে, "যদি হযরত ঈসা (আঃ) অথবা হযরত মূসা (আঃ)-এর কোন খাদের এখানে থাকতো এবং অসুস্থ হতো তবে তুমি

সেই অসুস্থ খাদেমকে দেখার জন্যে যেতে"। তিনি লোকটিকে বললেন এই চিঠিটি আমীরকে পৌঁছে দাও। হেম্মাসের আমীর চিঠি পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খেদমতে হাযির হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর পাশে অবস্থান করলেন। যখন সওবান (রাঃ)-এর নিকট থেকে তিনি বিদায় নিতে চাইলেন, তখন হযরত সওবান (রাঃ) তার চাদর ধরে তাকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, একখানি হাদীস শুনে যাও, "আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মত থেকে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনা হিসেবে এবং কোন আযাব ব্যতীত বেহেশতে যাবে। প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরো ৭০ হাজার থাকবে"। (মসনদে আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমরা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেক রাত পর্যন্ত কথা বার্তা বলেছি। পরদিন সকালে যখন তাঁর খেদমতে হাযির হই তখন তিনি এরশাদ করলেন, শোন, আজ রাতে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাঁদের উম্মতসহ আমাকে দেখানো হয়। কোন কোন নবীর সঙ্গে মাত্র তিন ব্যক্তি ছিলেন, আর কারো সঙ্গে সামান্য কয়েকজন লোক ছিল। আর কোন কোন নবীর সঙ্গে একটি দল ছিল, আর কারো সঙ্গে কেউ ছিল না। যখন মূসা (আঃ) আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক লোক ছিল, এ দলটি আমার খুব পছন্দ হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? আমাকে জবাব দেয়া হলোঃ ইনি আপনার ভাই মূসা (আঃ) আর তাঁর সঙ্গে রয়েছে বনী ইসরাঈল। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তবে আমার উম্মত কোথায়? তখন জবাব দেয়া হলোঃ আপনার ডান দিকে দেখুন। তখন দেখি অগণিত মানুষের ঢল, মানুষের ভীড়ের কারণে পাহাড় পর্যন্ত ঢেকে গেছে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এখন সন্তুষ্ট হয়েছ কি?

আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাকে বলা হলো, শুনুন, এদের সঙ্গে আরো ৭০ হাজার রয়েছে যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ (তাঁর প্রতি আমার পিতা মাতা কোরবান হোক) যদি সম্ভব হয় তবে এই ৭০ হাজারের মধ্যেই থাকার চেষ্টা করো। যদি তা না হয় তবে তাদের মধ্যে থাকার চেষ্টা করো, যারা পাহাড়কে ঢেকে রেখেছে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাদের মধ্যে থাকার চেষ্টা করো যারা আসমানের পার্শ্বে ছিল।

তখন হযরত ওকাসা এবনে মহসিন (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে ঐ ৭০ হাজারের মধ্যে রাখেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। তখন

আরেকজন সাহাবী উঠে অনুরূপ আরজী পেশ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমার পূর্বে ওকাসা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অতঃপর আমরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলাম হয়তো এই ৭০ হাজার সে সব লোক হবে যারা মুসলমান অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছে। জীবনে কোন দিন আল্লাহর সঙ্গে শেরক করেনি। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের এ কথা জানতে পারলেন তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এরা সে সব লোক যারা যাদু টোনা করেনি, নিজের দেহে অগ্নির দ্বারা দাগ দেয়নি, যারা কোন জিনিস দ্বারা ভাল মন্দের ভবিষ্যদ্বাণী করেনি তথা কোন আলামত দেখে লক্ষী বা অলক্ষীর কথা বলেনি, বরং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে। (মসনদে আহমদ)

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মত থেকে ৭০ হাজার বা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে যাবে, যারা একে অন্যের হাত ধরে থাকবে, ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে তাদের চেহারা।[১] (বোখারী, মুসলিম, তেরবানী শরীফ)

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা উত্তম জাতি। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষের উপকার কর, তাদেরকে হেদায়েত কর, তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। এতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত উম্মত এসেছে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম উম্মত হলো উম্মতে মোহাম্মদিয়া। পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা চিরন্তন। অতএব, এ উম্মত সর্বকালের জন্যে উত্তম উম্মত বলে ঘোষিত হলো, তবে এর জন্য শর্ত হলো এই যে, এ উম্মতকে তিনটি দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

(১) সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করা,

(২) মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা,

(৩) আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।[২]

এ আয়াতে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং মুসলিম জাতির কর্মময় জীবনের একটা পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, হে মুসলিম জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও। তোমরাই তৌহিদের আমানতদার, তোমরাই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-১৪
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৩

যমীনে আল্লাহর আইন কানুন প্রতিষ্ঠা করা, পৃথিবীতে সুবিচার কায়েম করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়ন করা, অন্যায়-অনাচার জুলুম অত্যাচার তথা যাবতীয় পাপাচারের পথ রুদ্ধ করা এবং সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করা, ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করা, মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন করা এক কথায় পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তোমাদের একান্ত করনীয় কাজ। আর এ মহান কাজের জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদেরকে উত্তম জাতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তোমাদের এ ফজিলত এবং মাহাত্ম ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে যতদিন তোমরা তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা তোমাদের সম্মান হানির কারণ হতে পারে। অতএব, হে মুসলিম জাতি! আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ এবং সুদৃঢ় কর। অন্যায় অনাচারকে প্রতিরোধ কর এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করার আদেশের পর উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং ঈমান ব্যতীত কোন সৎ কাজই গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, ঈমানের কথা সর্বশেষ উল্লেখ করার কারণ হলো, এই বিষয়ে তাগিদ করা যে মোমেনগণ সৎ কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব ঈমান এবং একীনের সঙ্গে পালন করে। আর তা লোক দেখানোর জন্যে নয়, বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ঈমানের দাবী হিসেবে করে। অথবা এর কারণ হচ্ছে এর সম্পর্ক পরবর্তী আয়াতের সাথে কেননা, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে–

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

অর্থাৎ যদি তোমাদের ন্যায় আহলে কিতাবরাও ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্যে উত্তম হতো। তারাও উত্তম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতো। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর আরেকটি কারণ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো প্রকৃত ঈমান তথা অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত আর সবকিছু থেকে পবিত্র করা এবং প্রবৃত্তিকে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত রাখা। আর অন্তরে এমন প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করা যাতে কোন ব্যক্তি স্বার্থ বা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লাভ-লোভ না থাকে, এক কথায় মনকে আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছু থেকে পবিত্র করা, আল্লাহ পাকের প্রতি

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৯

পূর্ণ আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, একীন এবং ভক্তি অনুরক্তি রাখা, তাঁর প্রেমে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা।

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক প্রকৃত মোমেনও রয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ, তবে

اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তাদের অধিকাংশই গুনাহগার, অবাধ্য।

প্রথম যখন এ আয়াত নাযিল হয় وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ (অর্থাৎ যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো) একথার কারণে যারা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে প্রকৃত মুসলমান হয়েছিলেন তাদের অন্তরে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, হয়তো আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি, এজন্যে এরশাদ হয়েছে–

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ

"এমন ভুল ধারণার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু মোমেনও রয়েছে"। আর এ মোমেনদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে–

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! এ কাফেররা তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে না শুধু মৌখিক কষ্ট দেয়া ব্যতীত। মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ ইসলাম কবুল করেন তখন ইহুদী সরদাররা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয় যেন আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছেন তারা সান্ত্বনা লাভ করেন। এমনকি পরবর্তী আয়াতে কাফের আহলে কিতাবদের সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! যদি ইহুদীরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করা ব্যতীত তাদের কোন গত্যন্তর থাকবে না, শুধু তাই নয়, তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্যও করা হবে না। অতএব তাদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। এমনিভাবে তাদের সম্পর্কে আরো ঘোষণা রয়েছে যে–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

তাদের জন্যে অপমান লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের জান-মাল আর সন্তান-সন্ততি সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা যেখানেই থাকে তাদের অপমান লাঞ্ছনা অবধারিত। তবে হ্যাঁ, তারা যদি মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে আল্লাহর দায়িত্বে আগমন করে আর মুসলমানগণ যদি তাদের নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার করে বা মুসলমানদেরকে অমুসলিম কর আদায় করে তবে তাদের জান মালের নিরাপত্তা থাকতে পারে।

কোন কোন তফসীরকার এর এ অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যে, একমাত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে অথবা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তারা জান মালের নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। আর পর মুখাপেক্ষীতা তাদের জন্যে অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল হয়ে জান-মাল রক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এ গজব এজন্যে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র নাফরমানী করেছে। আল্লাহর নির্দশন সমূহকে অস্বীকার করেছে। এ ইহুদীরা আল্লাহর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে আর এজন্যে ইহুদীদের এ শাস্তি যে, তারা অবাধ্য হয়েছে, জেদ করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে। ইহুদীদের চিরন্তন অপমানের শাস্তির কারণ হিসেবে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছে যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল, আল্লাহর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল।

ইতিহাস সাক্ষী! পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে ইহুদীদের অপমান, লাঞ্ছনা তাদের জীবন সাথী হয়ে রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মদীনা শরীফের বনু কোরায়যা এবং বনু নজীর গোত্রের হত্যা এবং মদীনা শরীফ থেকে নির্বাসনের মাধ্যমে এ শাস্তি শুরু হয়। বিগত শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কালীন হিটলারের ইহুদী নির্যাতনের ঘটনা সর্বজ-বিদিত। আমেরিকায় ইহুদীরা ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তারা পরাশ্রিত।

যদিও বৃটেন এবং আমেরিকার ঔরষে "ইসরাঈল" নামক ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে কিন্তু আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় এবং সাহায্য সহায়তায় সে দাড়িয়ে আছে। এই তথাকথিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বিশ্ববাসী দেয়নি। একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, ইসরাঈলের জন্ম বৃটেন আমেরিকার দয়া ব্যতীত সম্ভব হতো না। আমেরিকার অতি অনুগ্রহ ব্যতীত এই তথাকথিত রাষ্ট্র টিকেও থাকতে পারতো না। "অতএব, আল্লাহর অভিশাপ এবং গজবে পতিত হয়েছে"- একথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে গত চৌদ্দশ' বছর ধরে; আর অদূর ভবিষ্যতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে হবে তাদের শাস্তি আর সে শাস্তিতেই হবে তাদের শেষ দশা। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে বিস্তারিত ঘোষণা রয়েছে।

আ'মালুল কোরআন

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى থেকে كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ পর্যন্ত আয়াত দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উপকারী হয়। তলোয়ার, বর্ষা বা অন্য কোন হাতিয়ারে এ আয়াতখানি শনিবার দিন খোদাই করে লিপিবদ্ধ করতে হয়, খোদাইকারী ব্যক্তিকে তখন রোজাদার অবস্থায় থাকতে হবে। আর খোদাই করার সময় সকাল ছয়টা। যে ব্যক্তি এই হাতিয়ার নিয়ে দুশমনের মোকাবেলায় যাবে আল্লাহ্ পাক তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ
اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

তরজমা

(১১৩) তারা সকলে এক প্রকার নয়, আহলে কিতাবগণের এক দল ধর্মের উপর কায়েম রয়েছে, রাত্রিকালে আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করে এবং সেজদায় রত থাকে।

(১১৪) এবং তারা আল্লাহ্ পাক ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে, আর সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা ভাল কাজে তৎপর হয়। এরাই নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(১১৫) এবং তারা যে সৎ কাজ করবে তা কখনও ব্যর্থ হবে না, আর আল্লাহ্ পাক পরহেযগারগণকে খুব ভালভাবেই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

যখন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ ইসলাম কবুল করেন তখন ইহুদীরা বলতে লাগলো যে, তোমরা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত সমূহ নাযিল করেন এবং আহলে কেতাবের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের ফজিলত বর্ণনা করেন।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরেকটি বিবরণ এই, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যেহেতু আহলে কিতাবদের অন্যায় আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে তাই এ আয়াতে এ সত্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের সকলেই পথভ্রষ্ট নয়; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং নেক আমলের গুণে গুণান্বিত।

এ আয়াত নাযিল হয়েছে নাজরানের ৪০ জন, হাবশার ৩২ জন এবং রুমের ৩ ব্যক্তির ব্যাপারে। তারা ঈসায়ী ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং তাঁর হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল। আনসারদের মধ্যে হযরত আসআদ এবনে জোরারা (রাঃ) এবং বারা এবনে মারুর, মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা, মাহমুদ এবনে মুসলিমা এবং আবু কায়েসা সরমা এবনে আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মিল্লাতে ইব্রাহীমের ব্যাপারে অবগত ছিল। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং ইসলামের সাহায্য করে।[১]

لَيْسُوا سَوَاءً

ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক মোমেন রয়েছে তবে তাদের অধিকাংশ লোকই পাপী। পূর্ববর্তী এ ঘোষণাটির আরও ব্যাখ্যা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে যেন আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে অনুপ্রাণিত হয়। তাই এরশাদ হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা সকলে এক সমান নয়, বরং তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে আর সেই ঈমানের কারণে রাত্রিকালে পবিত্র কোরআন পাঠ করে থাকে এবং তারা সেজদারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তারা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সৎ কাজে খুবই তৎপর থাকে। যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এমনিভাবে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীগণ। তাঁরা ইসলামের আলো দেখতে পেয়েই তাকে গ্রহণ করেছে। মূলতঃ এরাই হলেন নেককার এবং দ্বীনদার।[২]

মানব জীবনের সাফল্য

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ মানব জীবনের সাফল্য হলো স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মা'রেফাত বা পরিচিতি লাভ করা এবং সে অনুসারে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭৮
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৩
২। তফসীরে হাক্কানী ৪র্থ পারা, পৃষ্ঠা-১০

আমল করা। আর উত্তম আমল হল নামাজ এবং উত্তম জিকর হলো আল্লাহ জিকর, আর উত্তম মা'রেফাত হলো সর্বপ্রথম আত্ম-পরিচিতি লাভ করা। মানুষের জীবনের শুরু এবং শেষ পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এ মর্মে যে, মানুষকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন তাঁর বন্দেগীর জন্যে এবং অবশেষে মানুষকে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে তাকে এ জীবনেই নেক আমল করতে হবে, আর এজন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পূর্বশর্ত। মূলতঃ এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আহলে কিতাবদের সকলেই এক সমান নয়, তাদের একদল সত্য ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ্ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে এবং সেজদারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তারা আল্লাহ্র প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মানুষকে ভাল কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। শুধু তাই নয়; বরং তারা সকল ভাল কাজে অত্যন্ত তৎপর থাকে। অতএব, ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে বলেছিল যে, ঈমান এনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁরই প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ ঈমান এনে ক্ষতিগ্রস্ত তো হননি, বরং সাফল্য মণ্ডিত হয়েছেন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন এ আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার আটটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন (১) তারা সত্যের ওপর সুদৃঢ় এবং অবিচল রয়েছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। (২) তারা সুখ-নিদ্রা পরিত্যাগ করে গভীর রাতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয় এবং তাঁর মহান দরবারে মিনতি জানায় এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে। (৩) তারা আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে যেমন– পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বন্দারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে সেজদারত অবস্থায় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। (৪) তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখে, তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে ঈমান আনে এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। (৫) শুধু নিজেরাই সৎ কাজ করে না, বরং অন্যদেরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেয়। (৬) তারা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে

বিরত রাখে। সত্যের নির্দেশ তথা আমর বিল মা'রুফের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ সত্যের নির্দেশ অর্থাৎ তৌহিদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দেয়। আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার তাৎপর্য হল, আল্লাহ্র সাথে শেরক থেকে বিরত রাখা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করা থেকে বিরত রাখা। (৭) আর তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সৎ কাজের আহ্বান পেলে দ্রুত ছুটে আসে এবং সৎ কাজে তৎপর হয় তথা তারা সৎ কাজে কোন প্রকার গাফলত করে না। যেমন– পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ- الاية

"আর তোমরা দ্রুত সৎ কাজের দিকে এগিয়ে আস"।

(৮) তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সৌভাগ্যবান।

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন। আর তারা সৎ কাজ করে আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে তার সওয়াব অবশ্যই লাভ করবে, আর আল্লাহ্ পাক পরহেযগার লোকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অর্থাৎ কে পরহেযগার আর কে পরহেযগার নয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক উত্তমরূপে ওয়াকেফহাল এজন্যে তিনি আহলে কেতাবদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে যারা পরহেযগার, সত্যের অনুসারী তাদের আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন। ঠিক এমনিভাবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতেও তাদের ঈমান এবং নেক আমলের ভিত্তিতে তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হবে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) উম্মতে মোহাম্মদিয়ার ফজিলত সম্বন্ধে কয়েক খানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমরা দুনিয়াতে সকলের শেষে এসেছি, আর জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবো। অন্য উম্মতের লোকেরা আল্লাহকে পূর্বে পেয়েছে আমরা পরে পেয়েছি। যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে আমাদেরকে সে সব বিষয়ে আল্লাহ্ পাক সঠিক পথ অবলম্বনের তৌফিক দান করেছেন।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো একটি কথার উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় এ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেনঃ এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তোমরা যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও তবে তোমরা নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী সৃষ্টি কর।

আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন ঃ আহলে কিতাব এ কাজগুলো ছেড়ে দিয়েছিল। এজন্যে আল্লাহর কালামে তাদের সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে ঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

অর্থাৎ তারা মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতো না।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে যারা এ গুণাবলীর অধিকারী হবে আল্লাহ পাক তাদেরকে সালেহীন বা নেককার বলে ঘোষণা করেছেন। আর নেককার লোকের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে, তা হলো আল্লাহ পাক ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি তাদের ঈমান হবে পরিপূর্ণ। তারা আল্লাহর এবাদতে দিবা-নিশি থাকবে ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত শুধু নিজেরাই সৎ কাজ করবে না, বরং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে। আর সৎ কাজ সম্পাদনে সর্বদা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।[২]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

তরজমা

(১১৬) নিশ্চয় যারা কাফের (যারা ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকার করেছে) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ পাকের নিকট বিন্দুমাত্রও উপকারী হবে না। তারা দোযখবাসী, তারা চিরদিন দোযখে থাকবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-১৭
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫০

(১১৭) তারা দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত সেই হিম প্রবাহের ন্যায়, যে সব লোক নিজেদের জীবনের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শষ্য ক্ষেত্রের উপর তা আঘাত করে এবং তাকে বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অত্যাচার করেন না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে।

(১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিতান্ত আপনজন ব্যতীত কোন লোককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না, তোমরা যেন বিপদগ্রস্ত হও তাই তারা কামনা করে। বস্তুতঃ তাদের মুখ থেকেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরে যা গোপন করে তা অত্যন্ত জঘন্য। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট নিগূঢ় কথা বর্ণনা করলাম যদি বুঝতে পার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক

ইতিপূর্বে কাফেরদের অবস্থা এবং পরিণাম সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর মোমেনদের অবস্থা এবং শুভ পরিণতি সম্বন্ধেও ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান লাভের তৌফিক পেয়েছে তাদের অবস্থা এবং উচ্চ মর্তবার কথাও এরশাদ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[১]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

নিশ্চয় যারা কাফের তাদের অর্থ সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের জন্যে কোন উপকারেই আসবে না।

তফসীরকারগণ এ আয়াতে উল্লেখিত কাফেরদের ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেছেন।

(১) কাফেরদের বিশেষ দল সম্পর্কেই এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এ কাফের হলো মদীনার দুটি ইহুদী গোত্র বনী কোরায়জা এবং বনী নযির কেননা, মদীনা মোনাওয়্যারায় এ দুটি ইহুদী গোত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় অত্যন্ত তৎপর ছিল। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা অর্থ সম্পদ ব্যয় করতো।

অন্য একটি মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কে কেননা, আবু জেহেল তার অর্থ সম্পদ নিয়েই গৌরব করতো।

অপর একটি মত হলো, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে কেননা, সে বদর এবং ওহোদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় অনেক অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিল।

১। তফসীর কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৯২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫

(২) তফসীরকারদের মধ্যে যারা বলেন যে, এ আয়াত বিশেষ কোন কাফের দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি, বরং সাধারণভাবে সকল কাফের সম্পর্কেই রয়েছে এ আয়াতে উচ্চারিত সতর্কবাণী। কেননা, সকল কাফেরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় তৎপর ছিল এবং এই বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লজ্জিত করতে চেষ্টা করতো যে, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হক্বের উপর থাকতেন তবে তাঁর প্রভু তাঁকে অভাবগ্রস্ত রাখতেন না। যেহেতু আলোচ্য আয়াতে 'কাফারু' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাই তার তাৎপর্যও হবে সাধারণ কাফের।

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের কোন সৎ কাজ বেকার যাবে না।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ

অর্থাৎ মোমেনরা যা কিছু নেক কাজ করবে অবশ্যই তার সওয়াব বা শুভ পরিণতি লাভ করবে।

ঈমান হলো আমলের প্রাণ

আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের অবস্থা যে সম্পূর্ণ এর বিপরীত তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। কাফেররা যত অঢেল সম্পদ ব্যয় করুক না কেন এবং সে সম্পদ ব্যয়কে যত পূণ্যময় কাজ মনে করুক না কেন আখেরাতে এর কোন উপকার তারা পাবে না। কেননা, আখেরাতে কোন আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ঈমান। ঈমান ব্যতীত কোন আমল আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। ঈমান হলো আমলের প্রাণ। মানব দেহে যেমন প্রাণ না থাকলে দেহের কোন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি ঈমান ব্যতীত আমল প্রাণহীন হয়ে থাকে।

অতএব, কাফেররা এ নশ্বর জগতে এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনে পূণ্যময় কাজ মনে করে যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তা তাদের কোন উপকারেই আসবে না। তারা হবে দোযখবাসী, আর চিরদিন তারা সেই দোযখেই থাকবে। এ পৃথিবীতে মানুষ অর্থ সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু আখেরাতে এসব কিছু দ্বারা এমনকি কোন কিছু দ্বারাই কাফেররা উপকৃত হবে না যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

(সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন অর্থ সম্পদ সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না।) আরো এরশাদ হয়েছে–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকার করতে সক্ষম হবে না।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না– এ ঘোষণা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মোমেনদের ধন-সম্পদ তাদের কাজে লাগবে এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারাও মোমেনগণ উপকৃত হতে পারবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে, শৈশব অবস্থায় যে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের দ্বারা পিতা-মাতা উপকৃত হতে পারবে এবং যে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করে তা দ্বারা মোমেনগণ উপকৃত হতে পারবে। এমনকি হাদীস শরীফে একথাও এরশাদ হয়েছে যে, সন্তান-সন্ততি যখন পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করে তখন সে দোয়ার ফল তারা ভোগ করে।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ পৃথিবীর কোন কোন সম্প্রদায়ের এ ভিত্তিহীন ধারণা রয়েছে যে, পুত্র সন্তানের গুরুত্ব সর্বাধিক কেননা, পুত্র সন্তানই মৃত পিতাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দেয়। আলোচ্য আয়াতে এ মতবাদের বাতুলতা প্রমাণিত হয়।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

এ কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনিতে যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছে অথবা গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করছে যেমন কোরায়শ গোত্রের পৌত্তলিকরা বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যয় করতো অথবা সওয়াবের আশায় যারা ব্যয় করতো, যেমন ইহুদীরা তাদের ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতো অথবা কোরায়শ গোত্রের লোকেরা তাদের মূর্তির জন্যে ব্যয় করতো, অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করতো, যেমন মদীনা শরীফের মুনাফেকরা শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই ব্যয় করতো তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায় যে কোন বাগান তৈরী করে বা কোন কিছুর চাষ করে, বাগানের ফসল বা ফল ফুল দেখে আনন্দবোধ করে, এমন সময় হঠাৎ হিমপ্রবাহ বয়ে যায় এবং বাগানটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়, তখন মনের দুঃখে সে ভেঙ্গে পড়ে, ঠিক এ অবস্থাই কাফেরদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করার কেননা, তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা তাদের জন্যে সর্বনাশের কারণ হয়, আল্লাহর আযাবের উসিলা হয়, দুনিয়াতেও তারা এতদ্বারা উপকৃত হয় না এবং আখেরাতেও তাদের জন্যে তা উপকারী হবে না, তাদের দুর্ভাগ্য চির নিশ্চিত, তারা চির বঞ্চিত।

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৫
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫১

তাদের প্রতি আল্লাহ পাক জুলুম করেননি- বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তাদের নিজেদের কৃত অন্যায়ের শাস্তিই তারা ভোগ করবে কেননা, পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا۞ اِقْرَاْ كِتٰبَكَط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا۞ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىط

(সূরা বনী ইসরাঈল)

"(অর্থাৎ) আর আমি প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি বের করব তার জন্যে একটি কিতাব (আমলনামা) যা সে পাবে উম্মুক্ত (তাকে সেদিন বলা হবে) তুমি পাঠ কর তোমার কিতাব। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট। (মনে রেখো) যারা সৎ পথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথ বা হেদায়েত অবলম্বন করবে। পক্ষান্তরে, যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো নিজেদের ধ্বংসের জন্যেই পথভ্রষ্ট হবে। আর কেউ কারো (কর্মের) ভার বহন করবে না।

অতএব, কাফেরদের অন্যায়ের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী হবে এবং চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন লোককে নিজেদের অঙ্গরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করোনা"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াত সমূহের মোমেন এবং কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে কাফেরদের সাথে মোমেনদের অঙ্গরঙ্গ ভাব না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

এবনে জরীর এবং এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মদীনা শরীফে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা প্রাক-ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন। কেননা তারা পরস্পর প্রতিবেশী ছিল। ইসলাম কবুল করার পরও সে বন্ধুত্ব অব্যাহত ছিল।

কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার নির্দেশ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলেছেন যে, এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

(১) এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীদের সাথে মেলামেশা এবং অঙ্গরঙ্গতা না রাখার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের অঙ্গরঙ্গ ভাব ছিল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নব দীক্ষিত মুসলমানদের যে সন্ধি ইহুদীদের সঙ্গে ছিল তার কারণে ইহুদীদেরকে তারা নিজেদের বন্ধু মনে করতেন এবং মুসলমানদের অনেক গোপনীয় পরামর্শের কথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আর যেহেতু পূর্ব থেকে ইহুদীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে, তাই এ আয়াতে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে যেন ইহুদীদের সাথে পূর্বের ন্যায় অঙ্গরঙ্গ ভাব না রাখা হয় এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

(২) তফসীরকারদের অন্য একটি মত হলো এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুনাফেরদের সম্পর্কে এবং এতে মুনাফেকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার তাগিদ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে মুসলমানগণ মুনাফেরকদের দ্বারা প্রতারিত হতেন এবং তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করে তাদের সাথে অঙ্গরঙ্গ ভাব রাখতেন এবং তাদের সাথে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতেন। কোন বিষয় তাদের নিকট গোপন রাখতেন না অথচ এতে সমূহ ক্ষতির আশংকা ছিল।

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, তোমরা মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে অঙ্গরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। কোন গোপন রহস্য তাদের নিকট প্রকাশ করোনা কেননা, ইহুদী নাসারা বা মুশরেক-মুনাফেক কেউ তোমাদের বন্ধু নয়। তাদের একান্ত আকাঙ্খা যেন মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হয়। তারা যেন দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত হয়। মুসলমানদের প্রতি তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাতো

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৫

কোন কোন সময় তাদের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তারা তা গোপন রাখতে পারে না। অতএব এমন বিদ্বেষপরায়ণ, হিংসুক, কলুষচিত্ত শত্রুকে কোন বিবেকবান মানুষই নিজের অঙ্গরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।

"হে মোমেনগণ! তোমরা কোন অবস্থাতেই তাদেরকে অঙ্গরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করোনা"। যারা এ মত পোষণ করেন যে আয়াতখানি মুনাফেকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তারা বলেন যে, মুনাফেকদের এ চরিত্র সম্পর্কে সূরা বাকারায়ে আল্লাহ্ পাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ যখন মুনাফেকরা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা তাদের তথাকথিত নেতাদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা শুধু উপহাস করি।

(৩) শানে নযুল সম্পর্কে তৃতীয় অভিমত হলো, এ আয়াত সর্ব প্রকার কাফেরদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এবং এ আয়াতে সকল কাফেরের ব্যাপারেই সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহন করোনা। আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। আরো এরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ

হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব এ আয়াতে কাফেরদের সাথে অঙ্গরঙ্গ বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।১

ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি বললো, আমি একজন খৃষ্টানকে জানি। সে হিরা নামক স্থানের অধিবাসী। লেখাপড়ায় সে পারদর্শী। স্মরণ শক্তিতে সে অতুলনীয়। আপনি তাকে আপনার দফতরে কাজে নিযুক্ত করুন। তখন হযরম ওমর (লাঃ) বললেন, যদি তাকে আমি আমার দফতরের কাজে নিযুক্ত করি তবে তা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বিরোধী কাজ হবে। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেন ব্যতীত অন্য কাউকে একান্ত আপন, বিশ্বস্ত, অঙ্গরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।২

আলোচ্য আয়াতে "বেতানা" শব্দটির অর্থ হলো অঙ্গরঙ্গ বন্ধু, রহস্যবিদ, একান্ত বিশ্বস্ত, যার কাছে গোপন রহস্য প্রকাশ করা যায়. আপর মুরুব্বী বা অভিভাবক। অতএব এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, তোমরা প্রকৃত মোমেন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করোনা। যারা বিশ্বস্ত এবং রহস্যবিদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কোন অবস্থাতেই তাদের নিকট জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া যায় না। মুসলিম জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ জারী হয়েছে।

অমুসলিমদের প্রতি উদারতা

একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্যেই তার যাবতীয় বিধি-বিধান পেশ করেছে। অমুসলিমদের প্রতি যে উদারতা এবং মহানুভবতার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন ধর্মের শিক্ষায় খুঁজেও পাওয়া যাবে না। কিন্ত এতদসত্ত্বেও পৃথিবীতে সব কিছুরই একটা সীমা আছে। এ সীমা লংঘন করার অনুমতি কোন অবস্থাতেই দেয়া যায় না। ইসলামে অমুসলিমদের ব্যাপারে কত উদারতার শিক্ষা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী তথা হাদীস শরীফে তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ কেরছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসীকে কষ্ট দেয় কেয়ামতের দিন আমি নিজেই তার বিপক্ষে বাদী হবো, আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হই তাতে জয় লাভ সুনিশ্চিত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৯৭
২। তফসীর কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৯৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা ৪, পৃষ্ঠা-১৯

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ "খবরদার! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি জুলুম করে অথবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে বা তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন বস্তু নিয়ে নেয় তবে আমি কেয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে কাজ করবো"।

এমনিভাবে আমরা দেখি বদরের যুদ্ধ-বন্দীদেরকে মুসলমানগণ নিজেরা অভুক্ত থেকে তাদেরকে নিজেদের খাবার দিয়েছেন। আমরা আরো দেখি যে, মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাণের শত্রু আবু সুফিয়ানকে শুধু যে ক্ষমা করেছেন তাই নয়; বরং একথাও ঘোষণা করেছেনঃ যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। উদারতার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে! কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, মোমেন ব্যতীত অন্য কারো সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলো না। কেননা, এতে ইসলাম ও মুসলমানদের সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে বিশেষতঃ বিশেষ মতবাদ বা আদর্শ ভিত্তিক দেশ এই নীতি কঠোরভাবে পালন করে। যেমন এ পর্যায়ে রাশিয়া ও চীনের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। সেখানে কোন অকমিউনিষ্ট ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয় না। আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, ইসলামী বিধান কোন অমুসলিম বা বিদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব করার নির্দিষ্ট সীমা লংঘনের অনুমতি মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয় না কেননা, এতে ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

এ সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ বিধানকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দুশমনেরা সেঁকেল নীতি বলে। কি আশ্চর্য! যখন কোথাও মহামারী দেখা দেয় তখন সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাকে স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অথচ যে বিধান কুফর এবং আল্লাহর নাফরমানীর বন্যাকে প্রতিরোধ করার জন্যে প্রবর্তন করা হয় তাকে সেঁকেলে বলা হয়। এটি নিঃসন্দেহে বিবেক বুদ্ধির সাথে শত্রুতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মদীনা শরীফের ফকীহগণ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, দুশমনের সাক্ষ্য দুশমনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা দরিয়াবাদী আরো লিখেছেনঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ এ আয়াতের উপর আমল করার ব্যাপারে অত্যন্ত বেশী গাফলত করেছে। মূলতঃ এ গাফলতই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্রীয় শক্তির পতনের অন্যতম কারণ। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাত্র কয়েক শতাব্দী পরই মুসলমানগণ খৃষ্টান এবং অগ্নিপূজক লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে শরীক করতে শুরু করে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) পঞ্চম শতাব্দীর লোক, তিনি অত্যন্ত ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করে লিখেছেন যে, মুসলমানরা পবিত্র কোরআনের এ মহান শিক্ষাকে বিস্মৃত করেছে যার শোচনীয় পরিণাম মুসলমানদের ভোগ করতে হচ্ছে। তিনি বলেছেনঃ

قد انقلبت الاحوال فى هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء تسودوا بذالك عند جهلة الاغنياء من الولاة والامراء

এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ভাবা হচ্ছে এবং তারা মূর্খ সম্পদশালী ও শাসকদেরকে প্রভাবিত করছে। যখন সে যুগেরই এ অবস্থ ছিল তখন এ যুগের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু রাষ্ট্রীয় জীবনেরই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের জীবনের সর্ব স্তরে কাফেররা প্রভাব বিস্তার করে আছে, যা এ আয়াতের মর্মকথার সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ। কোন্ ভাষায় এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়![১] বলাবাহুল্য ইহুদীদের বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করা, আরব জাহানের বিপর্যয় এবং ফিলিস্তিনীদের গৃহহীন হওয়া– এসবই যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা অমান্য করার পরিণতি- একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ

অর্থাৎ আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি তোমাদের জন্যে নিদর্শন সমূহ। যদি তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পার। যে নিদর্শন সমূহ দ্বারা কাফেরদের শত্রুতা উপলব্ধি করা যায় এবং আল্লাহ পাকের শত্রু এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না রাখা হয় তা আমি সুস্পষ্ট ভাষায় তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নসিহতের উপকারীতা উপলব্ধি করতে পার তবে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যদি তোমরা বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পার তবে তার পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।[২] এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে খাঁটি বন্ধু মনে কর নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয় কেননা, ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরেক ও মুনাফেক- এদের কেউই মুসলমানদের হিতাকাংক্ষী নয়। তারা সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর, তাদের অন্তর মুসলমানদের শত্রুতায় পরিপূর্ণ। কখনও তারা অদম্য জিঘাংসায় এবং প্রতিহিংসায় এত বেসামাল হয়ে পড়ে যে, শত্রুতার কথা তাদের মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব, মুসলমান মাত্রকে এ পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন যে, যদি কোন অমুসলিম কোন মুসলমানের সাথে তার ঈমানের কারণে শত্রুতা না রাখে এবং কোন ফেৎনা ফাসাদ এবং অশান্তির লক্ষ্যে কোন কিছু না করে বরং মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে সচেষ্ট থাকে অথবা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে মুসলমানের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে- এমন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা নেই। যেমন হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। অথবা আবু তালেবের সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেমন সম্পর্ক ছিল অথচ তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তেও ইসলাম কবুল করেননি।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি আবু তালেবের কোন উপকার করেছেন? তিনি তো আপনার খেদমত করেছেন এবং আপনার সাহায্য করতে গিয়ে অন্যদের প্রতি রাগ করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ উপকার করেছি। তাঁর টাখনু পর্যন্ত দোযখের আগুন স্পর্শ করছে, যদি আমার সম্পর্ক না থাকতো তবে তাকে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হতো।[১] (মুসলিম শরীফ)

هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ
قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟
بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

তরজমা

(১১৯) হুশিয়ার! তোমরাই শুধু তাদেরকে ভালবাস তারা কিন্তু তোমাদেরকে ভালবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস কর এবং যখন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৬

তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন একাকী হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশের কারণে আঙ্গুল কাটতে থাকে। (হে রসূল!) আপনি এদেরকে বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশের দরুণ মৃত্যু বরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মনের কথা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

(১২০) যদি তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হয় তবে তারা দুঃখিত হয়, আর যদি তোমাদের কোন প্রকার অকল্যাণ হয় তবে তারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় কর তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যাবলীকে পরিবষ্টন করে আছেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করে এরশাদ করেছেন যে, হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু মনে করছো, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের কারণেই তোমরা তাদেরকে ভালবাস অথচ তারা ধর্মীয় ব্যাপারে মতভেদের কারণে আদৌ তোমাদেরকে ভালবাসে না, বরং তারা তোমাদের সর্বনাশের প্রয়াসী। তোমরা তাদের অকৃত্তিম বন্ধু কিন্তু তারা তোমাদের গোপন শত্রু। আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, তোমরা জাতি ও যুগ নির্বিশেষে সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহর তরফ থেকে যত নবী রসূল আগমন করেছেন তাদের নাম পরিচয় তোমাদের জানা থাক বা না থাক তোমরা সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সকলেই সত্য একথা মেনে চল। পক্ষান্তরে, তারা তোমাদের কিতাব পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও বিশ্বাস করে না। এমনকি তাদের নিকট যে আসমানী কিতাব রয়েছে তার প্রতিও তারা পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে না। কেননা, তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে, কিন্তু তারা তাতে বিশ্বাস করেনা। এমন অবস্থায় তাদেরকে তোমাদের শত্রু মনে করাই ছিল শ্রেয় অথচ তাদের ব্যাপারে তোমাদের আচরণ এর বিপরীত।

ইমাম রাজী (রঃ) যে ব্যাখ্যা দিলেন

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের কয়েকটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেনঃ

(১) আলোচ্য আয়াতে تُحِبُّوْنَهُمْ শব্দটির অর্থ হলো তোমরা এ ইহুদী মুনাফেক তথা কাফেরদেরকে ভালবাস অর্থাৎ তাদের জন্যে ইসলামকে পছন্দ কর এবং তারা যেন মুসলমান হয় এ আকাঙ্খা কর কেননা, ইসলাম সর্বোত্তম বস্তু। আর وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না কেননা, তোমরা যেন পূর্বের ন্যায়

কাফের অবস্থায় থাক এটিই তাদের একান্ত কামনা। অথচ কুফর হয় ধ্বংসের সমূহ কারণ।

(২) تُحِبُّوْنَهُمْ তোমরা ভালবাসা কেননা, তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।

وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ আর তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না কেননা, তোমরা ইসলাম কবুল করেছে।

(৩) تُحِبُّوْنَهُمْ তোমরা ভালবাস। কেননা তারা তোমাদের নিকট নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ আর তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না কেননা, তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কুফর সংরক্ষিত রয়েছে।

(৪) تُحِبُّوْنَهُمْ তোমরা তাদেরকে ভালবাস অর্থাৎ তাদের কোন বিপদাপদ তোমাদের কাম্য নয়।

وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ আর তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা কেননা, তাদের একান্ত কাম্য হলো তোমরা বিপদগ্রস্ত হও।

(৫) تُحِبُّوْنَهُمْ তোমরা তাদেরকে ভালবাস কেননা, তারা তোমাদের রসূলকে ভালবাসে বলে প্রকাশ করে وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা কেননা, তাদের অন্তরে রয়েছে রসূলের জন্যে শত্রুতা।

(৬) تُحِبُّوْنَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভালবাস। তাদের সাথে মেলামেশা কর, এমনকি তোমাদের অনেক গোপন কথা তাদের নিকট প্রকাশ কর। وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তাদের মনের কথা ও তাদের গোপন তারা তোমাদের নিকট আদৌ কথা প্রকাশ করেনা। অতএব এ মুনাফেকদের সাথে বন্ধুত্ব করা মুসলমানদের জন্যে অনুচিত।[১]

وَاِذَا لَقُوْكُمْ

অর্থাৎ মুনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতো, যখন মোমেনদের সঙ্গে তাদের মোলাকাত হতো তখন তারা বলতো আমরাতো তোমাদের ন্যায় হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করি, আমরাতো মোমেন। তাদের এসব কথা নিঃসন্দেহে ছিল মৌখিক, লৌকিক কিন্তু বাস্তবিক এবং আন্তরিক নয়।

وَاِذَا خَلَوْا

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২০০

এর প্রমাণ এই, তারা যখন নিরিবিলি হতো এবং নিজেদের বিশেষ আসরে একত্রিত হতো তখন মুসলমানদের প্রতি তারা তাদের অন্তর্নিহিত শত্রুতা এবং আক্রোশ প্রকাশ করতো এমনকি, উত্তেজনায় নিজেদের আঙ্গুল কাটতে থাকতো।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য-সহমর্মিতা দেখে তারা জ্বলে পুড়ে মরে এবং ইসলামের উন্নতি দেখে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি না থাকার কারণে তারা শুধু দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে।

তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ

(হে রসূল!) আপনি বলুন! হে কাফের ও মুনাফেকরা! তোমরা ইসলামের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ কর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তোমাদের যে আক্রোশ রয়েছে তাতে তোমরা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, আল্লাহ পাক ইসলামকে অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মুসলমানদেরকে আরো উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি দান করবেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মানুষের মনের সকল গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি অন্তর্যামী। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

মানুষ যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে সবই তিনি জানেন।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ

অর্থাৎ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং মানুষের মনের নিভৃত কোণে যে সব ভাবনার অবতারণা হয়, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত।

কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার নির্দেশ

অতএব, কাফের এবং মুনাফেকদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি যে শত্রুতা এবং আক্রোশ রয়েছে তা আল্লাহ পাকের নিকট সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট অতএব হে মোমেনগণ! তোমরা তাদেরকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হয় শত্রুর বিরুদ্ধে, তোমরা জয়লাভ কর, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় বা তোমরা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভে সমৃদ্ধ হও বা তোমাদের জীবনে কোন প্রকার কল্যাণ সাধিত হয় তবে তারা ভীষণ ভাবে দুঃখিত হয় এবং হিংসানলে জ্বলে পুড়ে মরে, এক কথায় তোমাদের সামান্যতম কল্যাণও তাদের নিকট সহনীয় নয়।

وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

পক্ষান্তরে, যদি তোমাদের কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট তারা দেখতে পায় যেমন দুশমন কোন ভাবে তোমাদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে বা তোমরা অভাবগ্রস্ত হও, তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকেনা, এমনি হীন প্রকৃতির অধিকারী জালেমদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব করা যায় এবং তাদের মৌখিক সহানুভূতির প্রতি কিভাবে আস্থা রাখা যায়?

কারো এ ধারণা হতে পারে যে, মুনাফেকদের সাথে যদি বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত না রাখা হয় তবে তারা উত্তেজিত হয়ে আরো অধিকতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে আরো বেশী তৎপর হবে– এ ভুল ধারণার জবাবে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ تَصْبِرُوْا

হে মোমেনগণ! তোমরা যদি সবর অবলম্বন কর, সত্যের উপর অটল অবিচল থাক, কাফের মুনাফেক ইহুদীদের দুশমনী এবং সকল বিপদাপদে যদি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও অথবা আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে যদি সবর অবলম্বন কর।

وَتَتَّقُوْا

এবং যদি তোমরা কাফের ও মুনাফেকদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন কর এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু সমূহের ব্যাপারেও পরহেযগারীর নীতি গ্রহণ কর।

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

তবে তাদের কোন ষড়যন্ত্র, কোন অপচেষ্টা তোমাদের আদৌ কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। তাদের যাবতীয় কুকীর্তি আল্লাহ পাকের নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যে কোন সময় তাদের ষড়যন্ত্র বিনষ্ট করতে পারেন। তোমরা শুধু আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখ, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাক।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হলে অথবা অসুস্থ হলে আল্লাহ পাক তার জন্যেও তাকে সওয়াব দান করবেন। এজন্যে প্রকৃত মুসলমান কোন দিন বিপদকে ভয় করেনা, দুঃখকে করে আলিঙ্গন। যে প্রকৃত প্রেমিক সে যখন একথা জানতে পারে যে তার দুঃখ তারই প্রিয়তমের তরফ থেকে প্রেরিত, তখন দুঃখের মাঝেও সে আনন্দ লাভ করে।

কেননা, প্রকৃত প্রেমিক নিজের মর্জি এবং খুশীর উপর তার প্রিয়তমের খুশি ও মর্জিকে প্রাধান্য দেয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ একদিন আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ তুমি আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখ, তাহলে দেখবে তিনি তোমার হেফাজত করবেন, তুমি তাকে তোমার সম্মুখে পাবে। যদি তোমার কিছুর জন্যে প্রার্থনা করতে হয় তবে তুমি শুধু তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। আর যদি কারো নিকট তোমার সাহায্য প্রার্থী হতে হয় তবে শুধু তাঁরই নিকটই সাহায্য প্রার্থী হও। আর একথা মনে রেখো, যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে ইচ্ছুক হয় তবে এতখানি উপকারই তারা করতে সক্ষম হবে যতখানি আল্লাহ পাক তোমার জন্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর যদি দুনিয়ার মানুষ তোমার ক্ষতি সাধনে একত্রিত হয় তবে এতখানি ক্ষতিই তারা করতে পারবে যতখানি আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন। মনে রেখ লেখা শেষ হয়ে গেছে, কলম তুলে ফেলা হয়েছে, কালি শুষ্ক হয়ে গেছে। (তিরমিজি শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একখানি আয়াত আমার জানা আছে যদি লোকেরা এ আয়াতের উপর আমল করে তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। আয়াত খানি হলো এই-

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(আহমদ, এবনে মাজাহ, দারমী)

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ পাক তার জন্যে পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিয্ক প্রদান করেন যা তার জন্যে অচিন্তনীয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি আমার বন্দা আমার হুকুম পালন করতো তবে আমি রাত্রিকালে তার প্রয়োজন মোতাবেক বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনে সূর্য উদিত হতো, আসমানে গর্জনের আওয়াজও সে শ্রবণ করতো না। অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষিত হতো কিন্তু মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কোন ক্ষতি হতো না এবং কৃষি কাজও চলতো আর কোন জীব-জন্তু পিপাসাগ্রস্ত থাকতো না। (আহমদ)

এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর নাফরমানীতে

মশগুল না হয় তখন তার দুনিয়াদারীর কাজ আল্লাহ পাক সহজ করে দেন। এমনকি আল্লাহ পাক রাত্রি বেলা বৃষ্টি নাযিল করেন যাতে করে মানুষের দিনের কাজে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। পক্ষান্তরে, যখন মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপে পরিপূর্ণ হয় তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেয়া দেয়। ঝড়-তুফান-বন্যা-ভূমিকম্পের ন্যায় বালা মসিবতে মানুষ গ্রেফতার হয় (আল্লাহ্ পাক রক্ষা করুন।)

মোমেনের ব্যাপার বিস্ময়কর

হযরত সোহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের ব্যাপার বিস্ময়কর, তার সব কাজই কল্যাণকর। মোমেন ব্যতীত এ সুযোগ আর কারোরই নেই। মোমেন যখন কোন প্রকার সুখ ভোগ করে তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করে, আর এ শোকর গুজারীও তার জন্যে কল্যাণকর হয়, যখন সে দুঃখ ভোগ করে, সে দুঃখের মধ্যে সবর অবলম্বন করে তবে সে সবরও তার জন্যে কল্যাণকর। (মুসলিম শরীফ)

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলীকে পরিবষ্টেন করে রেখেছেন অর্থাৎ কাফের মুনাফেকরা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের যে অপচেষ্টা করে চলেছে তা আল্লাহ পাকের নজরে রয়েছে। আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে শাস্তি দেবেন, তোমাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের কারণে তোমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার জন্যেও আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে বিনিময় দান করবেন।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٢١
إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١٢٢ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٢٣ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ
أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنْزَلِينَ ۝١٢٤ بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ
هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝١٢٥

তরজমা

(১২১) (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন অতি প্রত্যুষে আপনি ঘর থেকে বের হয়ে মোমেনদেরকে যুদ্ধের জন্যে নিদৃষ্ট স্থানে কায়েম করছিলেন এবং আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(১২২) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমাদের মধ্যে দু' দলের সাহস হারা হবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ্ পাক উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন। আর মোমেনদের আল্লাহ্ পাকের উপরই নির্ভর করা উচিত।

(১২৩) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা অত্যন্ত দুর্বল ছিলে অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

(১২৪) (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আপনি মোমেনদেরকে বলছিলেন যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন তা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়?

(১২৫) বরং হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং এমন সময় যদি কাফেররা দ্রুত গতিতে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে তবে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কে, যাঁরা এ মত পোষণ করেন তারা হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), এবনে এসহাক (রঃ) এবং সুদ্দি (রঃ)।

হযরত হাসানের (রঃ) মতে, এ আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এ আয়াত ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কেননা, এ আয়াতেই একথা রয়েছে–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিন সাহায্য করেছেন, আর এ ঘটনা অতীতের। অতএব, আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নয়, বরং ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আহযাবের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন হুকুম অমান্য করার ঘটনা ঘটেনি। অতএব, এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।[১]

শানে নুযুল সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবনে আবি হাতেম এবং আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, হযরত মোসাওয়ার এবনে মকরমা হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)-কে বললেন, আমার নিকট ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করুন। তখন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, সূরা আলে-এমরানের ১২০ নং আয়াতের পরবর্তী আয়াত পাঠ করো।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ

এ আয়াত থেকেই ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এবনে এসহাক বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্ পাক সূরা আলে-এমরানের ৬০ খানি আয়াতে ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[২]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, যদি তোমরা সবর অবলম্বন কর এবং পরহেযগারী ও সাবধানতার নীতি গ্রহণ কর তবে কাফেরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। তবে এর জন্যে পূর্বশর্ত হলো সবর ও পরহেযগারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কেননা এ যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবী কর্তৃক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করার কারণে তথা সবরের অভাবে মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি হয়। ৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন এমনকি, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ হয়। ঘটনাটি এমন ঃ

২য় হিজরীর রমজান মাসে বদর রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ হয় তাতে কাফেরদের ৭০ জন বন্দী হয়। এ অপমানজনক পরাজয়ের কারণে কাফেরদের প্রতিশোধ প্রবৃত্তি তীব্রতর হয়ে ওঠে। নিহতদের আত্মীয়-স্বজনরা সারা আরবকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। তাই ৩য় হিজরীতে ৩,০০০ সৈন্যের বিরাট দল নিয়ে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২০৪-০৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৯

সঙ্গে এ যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলকেও এ পরামর্শ সভায় ডাকা হয়। ইতিপূর্বে তাকে কখনো পরামর্শ সভায় তলব করা হয়নি। ইমাম যুহরীর মতে, ১২ শাওয়াল, হিজরী ৩ বুধবার দিন কাফেরদের ৩,০০০ সৈন্য ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অভিমত ছিল, মদীনা শরীফে অবস্থান করেই দুশমনের মোকাবেলা করা। অধিকাংশ প্রবীন সাহাবায়ে কেরামও একই মত পোষণ করেন। তারা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যখনই মদীনা শরীফের বাইরে গিয়ে দুশমনের মোকাবেলা করেছি দুশমন জয় লাভ করেছে, আর যখন আমরা মদীনা শরীফের ভেতরে থেকে লড়াই করেছি তখন আমরাই সফল হয়েছি। বর্তমানে যখন আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন, এখন আর কিসের ভয়? দুশমন যে স্থানে রয়েছে তা তাদের জন্যে মন্দ স্থান। যদি তারা শহরে প্রবেশ করে তবে পুরুষরা মুখোমুখি তাদের মোকাবেলা করবে, আর শিশু এবং নারীরা তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করবে। যদি তারা প্রত্যাবর্তন করে তবে ব্যর্থ হয়েই প্রত্যাবর্তন করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ অভিমতকে পছন্দ করেন। প্রবীন আনসার ও মোহাজের সাহাবায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন।

কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী সাহাবায়ে কেরাম যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং সত্য ও ন্যায়ের জন্যে দুশমনের মোকাবেলায় প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাত বরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মত হলো মদীনা শরীফের বাইরে গিয়ে দুশমনের মোকাবেলা করা উচিত। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত হামজা এবনে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ), হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ), হযরত নোমান এবনে মালেক (রাঃ) এবং আনসারদের একটি দল। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি যার ব্যাখ্যা হলো কল্যাণ, আর আমি দেখেছি আমার তলোয়ারের ধার বিনষ্ট হয়ে গেছে, এর তা'বীর হলো পরাজয়, আর আমি একথাও স্বপ্নে দেখেছি যে আমার হাত একটি মজবুত পোষাকের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এর অর্থ হলো মদীনা মোনাওয়্যারায় অবস্থান। যদি মদীনা মোনাওয়্যারায় অবস্থান করে যুদ্ধ করার মত তোমরা পোষণ কর তবে তা উত্তম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মত এই ছিল যে, দুশমন মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রবেশ করুক এবং রাস্তায় মোড়ে মোড়ে যুদ্ধ হোক।

আহমদ, দারমী এবং নেসায়ীর বর্ণনা হলো এই যে, আমি নিজের হাতকে মজবুত যুদ্ধ পোষাকে দেখেছি, আর গাভীকে জবেহ্ করতে দেখেছি। আমি স্বপ্নের তাবীর দিয়েছি মজবুত যুদ্ধ পোষাক হলো মদীনা আর গাভী হলো কল্যাণ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন

বাজ্যার এবং তেবরানী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন আবু সুফিয়ান এবং তার লোকেরা মদীনা আক্রমণ করলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেনঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার জুলফিকার তলোয়ার ভেঙ্গে গেছে একটি বিপদ, আর গাভীকে জবেহ্ হতে দেখেছি এটিও একটি বিপদ, আর আমার দেহে যুদ্ধ পোষাক দেখেছি তা হলো তোমাদের শহর মদীনা মোনাওয়্যারা। ইনশাআল্লাহ! দুশমন মদীনা শহরে পৌঁছতে পারবে না।

এবনে এসহাক, এবনে আকাবা এবং এবনে সাদ প্রমুখের বর্ণনা হলো, এ স্বপ্নটিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার রাত্রে দেখেছিলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেছেনঃ তলোয়ার ভাঙ্গা দেখার তাৎপর্য হলো সেই ক্ষত যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল।

এবনে হেশামের বর্ণনা হলো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তলোয়ার ভাঙ্গার তাৎপর্য হলো আমার পরিবারের কোন সদস্য শাহাদাত বরণ করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি ঐ তরবারীটিকে যখন দ্বিতীয়বার নাড়া দিলাম তখন তা আগে চেয়ে ভাল হয়ে গেছে এর তাৎপর্য হলো সেই বিজয় যা আল্লাহ পাক দান করেছেন।

এদিকে হযরত হামজা (রাঃ) বলেনঃ আমি সেই আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। যে পর্যন্ত মদীনার বাইরে গমন করে দুশমনের সঙ্গে তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ না করবো সে পর্যন্ত আমি খাবার গ্রহণ করবো না। হযরত হামজা (রাঃ) শুক্রবার এবং শনিবার রোজা ব্রত পালন করেন।

এদিকে হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) আরজ করেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। শপথ সেই আল্লাহ পাকের যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন? তিনি বললেনঃ কেননা আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি।

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেছেনঃ আসি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, আর আমি যুদ্ধের দিন পলায়ন করবো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাহু এরশাদ করেনঃ তুমি ঠিক বলেছ। হযরত নোমান সেদিনই শাহাদাত বরণ করেন।

এতদ্ব্যতীত মালেক এবনে সেনান খুদরী (রাঃ) এবং ইয়াস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম মদীনা শরীফের বাইরে গমন করতে অনুপ্রাণিত করেন।

যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর নামাজ আদায় করেন এবং সমবেত লোকদেরকে নসিহত করে এরশাদ করেনঃ যদি তোমরা যুদ্ধে সবর অবলম্বন কর তবে বিজয় তোমাদেরই হবে। সমবেত সাহাবায়ে কেরাম দুশমনের উদ্দেশ্যে বের হতে পেরে সন্তুষ্ট হন, কিন্তু অনেক সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে বের হওয়া পছন্দ করেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে স্বগৃহে প্রবেশ করেন। সাহাবায়ে কেরাম কাতার বন্দী হয়ে তাঁর অপেক্ষা করেন। এমন সময় হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) এবং হযরত উসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) সেখানে আসলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের মর্জির খেলাফ কাজ করছো। অথচ আসমান থেকে ওহী তাঁর প্রতিই অবতীর্ণ হয়, তোমাদের প্রতি নয়"। সঠিক পন্থা হলো এই যে, ব্যাপারটি তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ছেড়ে দাও। তিনি যা আদেশ করেন তা পালন কর। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলেন, যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে, যুদ্ধ পোষাক পরিধান করে, তখন তাঁর কোমরে তলোয়ার বাঁধা ছিল চামড়ার বাঁধনে এবং পাঁগড়ি পরিহিত অবস্থায় তাঁকে দেখার পর অনেকেই অনুতপ্ত হলেন যে কেন আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মতের খেলাফ করলাম! তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, আমরা ভুল করেছি। এরপর তারা আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মর্জির খেলাফ কাজ করে অন্যায় করেছি, যদি আপনি উচিত মনে করেন তবে মদীনাতে থেকেই যুদ্ধ করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ অস্ত্র পরিধান করার পর যুদ্ধ ব্যতীত তা খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়। এখন আমি যা আদেশ দেই তা পালন কর। আর এক আল্লাহর প্রতি ভরসা করে রওয়ানা হও, তোমরা সবর অবলম্বন করলে বিজয় তোমাদেরই হবে।

এদিকে মালেক এবনে আমর নামক এক ব্যক্তির জানাযা হাযির হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায আদায় করলেন। এরপর অশ্বে আরোহন করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ১৭ জন অল্প বয়স্ক ছেলেকে উপস্থিত করা হলো, তাদের বয়স ছিল ১৪ বছর। তিনি তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিলেন। যাদের বয়স ১৫ বছর হয়েছিল তাদেরকে গ্রহণ করলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), যায়েদ এবনে সা'দ (রাঃ), যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ), বরা এবনে আযেব (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আওস এবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) ছিলেন। রাফে

এবনে খোদায়েজ (রাঃ)-কে তিনি ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন বলা হলো যে তিনি তীর নিক্ষেপে পারদর্শী তখন তাঁকেও যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। তখন সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ) বললেন, আমি রাফেকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ কুস্তি লড়, তখন কুস্তিতে সামুরা এবনে জুন্দব রাফেকে হারিয়ে দিলে তাঁকেও যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৈন্যদল পরিদর্শন শেষ করলেন। এদিকে সূর্য অস্তমিত হলো, তিনি প্রথমে মাগরিব ও পরে এশার নামাজ আদায় করলেন। রাত্রে মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ)-কে ৫০ জন সাহাবীকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। মদীনা শরীফ থেকে যাত্রা কালে ১,০০০ লোক নিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন কিন্তু মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল ৩০০ সঙ্গী নিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ৭০০ ব্যক্তি রয়ে গেলেন এবং মাত্র দুটি অশ্ব তাঁর নিকট ছিল। এদিকে বনু হারেসা এবং বনু সালমা নামক দুটি গোত্রের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিল। তারা রণাঙ্গন থেকে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের হেফাজত করেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন, তারা রণক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রণকৌশল অনুসারে প্রত্যেক বাহিনীকে তার নিদৃষ্ট স্থানে মোতায়েন করেন।[১]

তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ

(হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন অতি প্রত্যুষ আপনি মুসলমানদেরকে রণাঙ্গণে যথাস্থানে মোতায়েন করতে বের হয়েছিলেন আর আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, সব কিছু শুনেন।

পরবর্তী আয়াতে বনী হারেসা এবং বনী সালমা গোত্রদ্বয়ের কথা উল্লেখ করে এরশাদ করেছেন-

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ

সে সময়কে স্মরণ কর যখন তোমাদের দুটি দল কাপুরুষতা দেখাতে ইচ্ছুক হয় অথচ আল্লাহ পাক তাদের সহায় ছিলেন, আর আল্লাহ পাকের উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫০-৫৪

আল্লাহপাক যখন ইচ্ছা করেন তখন যুদ্ধাস্ত্র, অশ্ব, সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীতই মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন, তাদেরকে জয়-মাল্যে ভূষিত করেন এবং দুশমনদেরকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে বাধ্য করেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

বদরের যুদ্ধে তোমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, হাতিয়ার এবং অশ্ব বলতে নাম মাত্রই ছিল কিন্তু আল্লাহ পাকের সাহায্যে তোমরা জয়লাভ করেছিলে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা কর এবং তাঁর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, শোকর গুজার হও, সংকল্পের দৃঢ়তা অর্জন কর।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এ আয়াতও বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক যেভাবে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন সেকথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। (হে রসূল!) আপনি স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আপনি মোমেনদেরকে বলেছিলেন যে আল্লাহ পাকের তরক থেকে যদি তিন হাজার ফেরেশতা নেমে আসে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করে তবে কি তা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে না? একথাটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে এমন সময় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যখন কাফেরদের অনেক সৈন্য ছিল এবং মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, এ কারণে মুসলমানরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ৩,০০০ সাহায্যকারী ফেরেশতা অবতরণের কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁর এ সান্ত্বনা মোতাবেক ফেরেশতা অবতরণ করেছিল। সূরা আনফালে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ এ ঘটনাটি বদরের দিনের। সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতার কথা বলেছিলেন। যেমন এরশাদ হয়েছে–

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

অতঃপর তিন হাজার ফেরেশতার কথা এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর পাঁচ হাজার ফেরেশতার কথা ঘোষিত হয়েছে।

এবনে আবি শায়বা (রঃ) এবং এবনে আবি হাতেম (রঃ) ইমাম শা'বী (রঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এই খবর পেলেন যে, কুরজ বিন যাবের নামক এক দুবৃত্ত ইসলামের দুশমনদের সাহায্যার্থে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গণে আসছে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, আর কাফের ছিল এক হাজার। কাফেররা ছিল সমরাস্ত্রে সজ্জিত, আর মুসলমানদের প্রত্যেক নয় জনের

জন্যে ছিল একটি মাত্র তরবারী। এমনি অবস্থায় যখন কাফেরদের সাহায্যে নতুন বাহিনীর অংশ গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়। তাই এরশাদ হয়েছে–

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

অর্থাৎ অবশ্যই যদি তোমরা সবর অবলম্বন কর এবং আত্মরক্ষা করে চল তথা পরহেযগারী অবলম্বন কর, আর দুশমন হঠাৎ তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে বসে তবু তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাহায্যে পাঁচ হাজার চিহ্নিত অশ্বারোহী ফেরেশতা প্রেরণ করবেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের জন্যে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ঃ

(১) জেহাদের কঠিন সময় ধৈর্য ও সবরের গুণ অর্জন করা তথা অধৈর্য না হওয়া। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দুশমনের মোকাবেলা করা।

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুম অমান্য করা থেকে আত্মরক্ষা করা তথা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন আদেশ অমান্য না করা। যদি মুসলমানগণ এ দুটি গুণ অর্জন করে তবে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য সর্বক্ষণ তাদের জন্যে প্রস্তুত থাকে। পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা শুধু বদরের যুদ্ধের জন্যেই নয়, বরং সর্বকালের জন্যে। এমনকি আজও যদি মুসলিম জাতি আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং আনুগত্য প্রকাশ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করে এবং দুশমনের মোকাবেলায় দৃঢ় সংকল্প হয়ে সবর অবলম্বন করে তবে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য অবশ্যই আসতে পারে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বদরের যুদ্ধে যখন মুশরেকদের পরাজয়ের খবর পৌঁছে তখন কুরজ এবনে যাবের তার সাহায্য নিয়ে আসতে সাহস করেনি।

কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ দুশমনের মোকাবেলায় সবর অবলম্বন করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লঅহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করা থেকে আত্মরক্ষা করে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেন। হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ পাঁচ হাজার ফেরেশতা (সৈন্য) কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে, যদি তারা সবর এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন রণাঙ্গনে ফেরেশতারা যুদ্ধ করেনি তবে হ্যাঁ, সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে এবং সাহায্য করার জন্যে উপস্থিত ছিল।

যাহ্যাক এবং একরামা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াত ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে কেননা, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুটি শর্তে সবর এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। কিন্তু মুসলমানদের কিছু লোক সবর অবলম্বন করেননি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি আদেশ অমান্য করেছেন এজন্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেননি।

মুজাহেদ (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহোদ যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তেও দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের কোন আদেশ তিনি অমান্য করেননি, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে জিব্রাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) দ্বারা সাহায্য করেছেন।

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ওহোদের যুদ্ধের দিন আমি দেখেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থেকে দু'জন সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি যুদ্ধ করছিলেন। আমি তাদেরকে কোনদিন পূর্বেও দেখিনি পরেও দেখিনি। মূলতঃ এ দু'জনই ছিলেন জিব্রাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ)।[১]

আ'মালুল কোরআন

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ থেকে الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ পর্যন্ত

আয়াত সমূহ জালেমের জুলুম থেকে, দুশমনের দুশমনী থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং জ্বীন বা মানুষের ভয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে বিশেষ ভাবে উপকারী।

নিয়মঃ

বৃহস্পতিবার অর্ধ রাত্রিতে বা অজু অবস্থায় আয়াত সমূহ লিখবে। ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত লেখক তাসবীহ এবং জিকরে মশগুল থাকবে। যখন সূর্য অনেক উপরে উঠবে তখন দু' রাকাআত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতেহা এবং "আমানার রসূল" থেকে সূরা বাকারার শেষ আয়াত পর্যন্ত পড়বে। এরপর সাতবার এস্তেগফার পড়বে এবং সাতবার "হাস্‌বি আল্লাহ...... আল আরশুল

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৬-৫৭
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২১০-১১

আযীম” পর্যন্ত পাঠ করবে। এরপর নতুন করে অজু করে আয়াত সমূহ লিখবে এবং নিজের কাছে রেখে দেবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য সফল কবে।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا
النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾
وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

তরজমা

(১২৬) এবং শুধু তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সুসংবাদ দেয়ার জন্যে তা করলেন এবং যেন তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয় (আর একথা জেনে রেখ) যে সাহায্য শুধু পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয় (এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্যে আর কারো সাহায্য নেই)।

(১২৭) (আর তা) এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ পাক কাফেরদের এক অংশকে ধ্বংস করবেন অথবা তাদেরকে পরাজিত করবেন যেন তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।

(১২৮) (হে রসূল!) এতে আপনার করনীয় কিছুই নেই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন কি শাস্তি দেবেন কেননা, তারা অত্যাচারী।

(১২৯) আর আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! ফেরেশতাদের সাহায্যের এ ঘোষণা শুধু তোমাদের অন্তরের উদ্বেগ এবং অস্থিরতা দূর করার জন্যেই করা হয়েছে, যেন তোমরা সান্ত্বনা লাভ কর এবং

তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কোন বস্তু বিশেষের মধ্যেই সীমিত নয়, তাঁর সাহায্য কারো মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের ছাড়াও তোমাদেরকে সফল করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এমনকি তোমাদের মাধ্যম ব্যতীতও তিনি কাফেরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে পারেন, তাদেরকে পরাজিত করতে পারেন অথবা এত ফেরেশতারও প্রয়োজন হয় না, বরং একজন ফেরেশতা দ্বারা পাঁচ হাজার ফেরেশতার কাজ নিতে পারেন। একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, ফেরেশতারা যা কিছু করেন তা-ও আল্লাহ্ পাকের কুদরত এবং ইচ্ছা মোতাবেকেই করেন। তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তবে কোন্ সময়ে কোন্ পরিস্থিতিতে কি করনীয় তা এক আল্লাহ্ পাকই জানেন।

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

"আর তোমাদের সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র তরফ থেকেই আসবে"।

মোমেন শুধু আল্লাহ্র প্রতিই ভরসা করে

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ বাক্যটির উদ্দেশ্য হলো মোমেনগণ যেন শুধু এক আল্লাহ্র প্রতিই ভরসা করে আর কারো প্রতি নয়, এমনকি ফেরেশতাদের প্রতিও নয়। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন মানুষের ঈমান সে পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ ব্যতীত আর সব কিছু থেকে তার মন মুক্ত না হয়। সকল সৃষ্টি থেকে মনকে মুক্ত করে একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করার মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমান লাভ করা যায়।

اَلْعَزِيْزُ

যিনি পরাক্রমশালী, যাঁর উপর কারো ক্ষমতা চলেনা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

اَلْحَكِيْمُ

যিনি বিজ্ঞানময়। ইমাম রাজী (রাঃ) লিখেছেনঃ "আল-আজীজ" শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের মহা শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর "আল্ হাকীম" শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ এলম বা জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোন্ বন্দার কি প্রয়োজন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কারো কোন অবস্থাই তাঁর নিকট গোপন নয়। আর কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করতেও তাতে বাঁধা দেয়ার কারো ক্ষমতা নেই কেননা,

তিনি পরাক্রমশালী। অতএব, মুসলমানদের জন্য সাহায্য শুধু তাঁর নিকট থেকেই আসবে।[১]

হযরত ইয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইয়ামুকের যুদ্ধে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের পাঁচজন দলপতি ছিলেন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ), হযরত ইয়াজীদ এবনে আবু সুফিয়ান, হযরত এবনে হাসানা, হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ), হযরত ইয়াজ (রাঃ)। বিদায় কালে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন যে, যদি যুদ্ধ হয় তখন প্রথম সেনাপতি হবেন হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ)। যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন হযরত ওমরকে চিঠি লেখা হলো যে মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, অতএব সাহায্য প্রেরণ করুন।

যাঁর সৈন্য সর্বত্র

হযরত ওমর (রাঃ) এ চিঠির জবাবে লিখেছিলেন তোমাদের চিঠি পেয়েছি, তোমরা আমার কাছে সাহায্যের জন্যে লিখেছ। আমি এমন এক সত্ত্বার কথা তোমাদেরকে বলছি যাঁর সাহায্য লাভ করলে সকলের উপর বিজয় অর্জন করা যায়, যাঁর সৈন্য বাহিনী সর্বত্র উপস্থিত রয়েছে, সেই মহান সত্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। তোমরা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর কেননা, বদরের দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সৈন্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম তোমাদের থেকে অনেক কম ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে বিজয় দান করেছেন। যখন তোমাদের নিকট আমার এ চিঠি পৌঁছে তখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং আমার নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়োনা। এ চিঠি পাওয়ার পর আমরা দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এবং বিজয় লাভ করেছি।[২]

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য এজন্যেই করা হয়েছে যেন কাফেরদের একটি দলকে চিরতরে নিপাত করা হয়, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়, তাদেরকে অকেজো করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে অপমানিত অপদস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয়। মূলতঃ ঘটনা তাই হয়েছিল। কেননা বদরের যুদ্ধে এ উম্মতের ফেরাউন আবু জেহেল সহ ৭০ জন দুশমন নিহত হয়। আরো ৭০ জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, আর অবশিষ্টরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। এটিই ছিল মুসলমানদের প্রতি বদরের দিনে আল্লাহ পাকের সাহায্যের ফলশ্রুতি, যা আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২১৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৮

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন।)

আলোচ্য আয়াতের لِيَقْطَعَ طَرَفًا বাক্যটি উপরোক্ত আয়াতের সাথেই সংযুক্ত, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে এজন্যে সাহায্য করেছেন যেন কাফেরদের একটি দলকে ধ্বংস করা হয়।

ইমাম কুরতবী (রঃ) তাঁর তফসীরে এবং আল্লামা জমখশরী তফসীরে কাশ্শাফে এবং মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তফসীরে মাজেদীতে, আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি তফসীরে মাহ্জারীতে আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

অবশ্য আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে একথাও লিখেছেন যে, তফসীরকারদের মধ্যে যাদের মতে আয়াতটি ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কিত, তাঁরা বলেন ওহোদের যুদ্ধে কাফেরদের ১৬ জন নেতা নিহত হয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ পাক জয়ী করেছিলেন। মুসলমানগণ গনিমতের মাল একত্রিত করা শুরু করেছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম যাদেরকে পার্বত্য পথে মোতায়েন করা হয়েছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে যুদ্ধে জয় হোক, কি পরাজয় তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করোনা। কিন্তু তারা যুদ্ধে জয় চূড়ান্ত মনে করে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করার যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরিণামেই ওহোদের যুদ্ধের জয়, সাময়িক বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলন করেছেন যে, ওহোদের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিচের পাটির সম্মুখের ডান দিকের দান্দান মুবারক শহীদ হয়। তখন দিনি এরশাদ করেছিলেন, এমন সম্প্রদায় কিভাবে সফলকাম হবে? যারা তাদের পয়গম্বরের সঙ্গে এই ব্যবহার করে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। তখন নাযিল হয়–[২]

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

অর্থাৎ (হে রসূল!) এতে আপনার কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ পাক কাফেরদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদেরকে আযাব দেবেন। তাদের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

বস্তুতঃ ওহোদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা (রাঃ)।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৪
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৯

তাঁকে শহীদ করার পর কাফেররা তাঁর নাক কান কেটে ফেলে। এমনকি কাফেরদের দলপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজার (রাঃ) কলিজা বের করে তার ক্রোধ চরিতার্থ করে। এদিকে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। শুধু যে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে তাই নয়, বরং লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া ভেঙ্গে কপাল মুবারকে ঢুকে পড়ে এমনকি, কিছুক্ষণের জন্যে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ঐ সময়ই কাফেররা এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, তাঁর শাহাদাত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পান তখন দুবৃত্ত কাফেরদের সম্পর্কে বদদোয়া করার ইচ্ছা করেন, আর এমন অবস্থায় এটিই স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা

কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। শত্রুরা যত অত্যাচার উৎপীড়নই করুক না কেন তিনি যেন তাদের ব্যাপারে আরো ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। তাঁর বদদোয়ায় তারা ধ্বংস হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা তিনি তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে লুটিয়ে দেন, তারা আজ ইসলামের শত্রু হলেও কাল ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, এটিই ছিল আল্লাহ পাকের মর্জি। তাই তিনি এরশাদ করেনঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

অর্থাৎ –এই কাফেরদের আল্লাহ্ পাক তওবার তওফিক দেবেন অথবা ধ্বংস করবেন– এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকই গ্রহণ করবেন, এটি তাঁরই মর্জির ব্যাপার, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হেদায়েত করতে পারেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বদদোয়া করবেন না।

এ আয়াত কখন নাযিল হয়

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, এ আয়াত ওহোদের যুদ্ধ সম্পকেই নাযিল হয়েছে। তবে কি অবস্থায় কখন এ বিষয়ে একাধিক বিবরণ রয়েছে।

(১) যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বদদোয়া করার ইচ্ছা করলেন তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(২) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দলপতি আবু সুফিয়ান, হারস এবনে হিশাম, সাফওয়ান এবনে উমাইয়াকে লা'নত দেয়ার জন্যে দোয়া করলেন তখন এ

আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তীতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ইসলাম কবুল করার তওফিক দান করেন।

(৩) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজার (রাঃ) নাক কান কর্তিত দেখার পর মুসলমানগণ বললেন, যদি আল্লাহ পাক কাফেরদের উপর আমাদের বিজয়ী করেন তবে আমরাও তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ওহোদের যুদ্ধে যেসব মুসলমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করেছেন যার পরিণামে মুসলমানদেরকে চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তাঁদের প্রতি বদদোয়া করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন এবং এমন বদদোয়া থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিরত রাখেন। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মত পোষণ করতেন।[১]

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, কাফেরদের চরম জুলুম অত্যাচারের কারণে হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনে তাদের প্রতি লা'নত করার ইচ্ছা হয়। আর এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ পাক তাঁকে এ আয়াত দ্বারা কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করা থেকে বিরত রাখেন।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতটির অর্থ হলো (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ)

আমার সৃষ্টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা একমাত্র আমার যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

অর্থাৎ– সাবধান! হুকুম তো একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। আরো এরশাদ হয়েছে–

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

আগে পরে এক আল্লাহ পাকেরই হুকুম বহাল থাকে। যা কিছু হয় এক আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছাতেই হয়, আর যা কিছু হবে তা আল্লাহ পাকের মর্জিতেই হবে। প্রশ্ন হলো কাফেরদের প্রতি লা'নত করা থেকে বিরত রাখার হেকমত কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন ভূত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের। আজ যে কাফের রয়েছে, কাল সে তওবা করে ইসলাম কবুল করতে পারে, আর যদি সে তওবা নাও করে তবে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮.পৃষ্ঠা-২১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯

তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ হয়ত খাঁটি মোমেন হতে পারে কিন্তু বদদোয়ার মাধ্যেমে ধ্বংস করে দিলে এর কোনটিই হবে না। মূলতঃ এ কারণেই বদদোয়া করতে বিরত রাখা হয়েছে।[১]

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

আসমান জমিনে, আকাশে পাতালে যা কিছু রয়েছে তার উপর একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহ পাকেরই, সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ঈমানের সম্পদ দ্বারা ভাগ্যবান করবেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে কুফরের জন্যে শাস্তি দেবেন, সবই তাঁর মর্জির ব্যাপার আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল,অতীব দয়াময়। তিনি যদি কাউকে তাঁর দয়ার ধন্য করে ঈমানের তওফিক দান করেন তা তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অনন্ত অসীম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ
لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾
وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

তরজমা

(১৩০) হে মোমেনগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(১৩১) আর সেই দোযখকে ভয় করো যা কাফেরদের জন্যে প্রস্তত করা হয়েছে।

(১৩২) এবং তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের তাবেদারী কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(১৩৩) তোমরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হও আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের ন্যায়, যা পরহেযগার লোকদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২১৯

(১৩৪) যারা স্বচ্ছলতা এবং অভাবের সময় (আল্লাহ্ পাকের পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে, আর আল্লাহ্ পাক নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সুদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, সুদখোরীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করার বিশেষ তাগিদ করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াতে ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে সুদ গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উভয় আয়াতের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উভয় আয়াতের ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে এতটুকু কষ্ট হয় না। পূর্ববর্তী আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফেক নেতা ওহোদের রণাঙ্গণ থেকে ঠিক যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে যুদ্ধ না করেই মুসলমানদের মনোবল বিনষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে বাড়ী ফিরে আসে এবং বনু হারেসা এবং বনু সালমা নামক দুটি গোত্রও প্রায় মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। পরে অবশ্য আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন। যুদ্ধে মনোবল হারানোর কারণ হলো ঈমানের দুর্বলতা এবং হারাম রিয্ক ও সুদখোরীর মাধ্যমে মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দুর্বলতা কাপুরুষতায় রুপান্তরিত হয়। ফলে ত্যাগের আদর্শ বিস্মৃত হয়, প্রাণ কাঁপে দুরু-দুরু। সুদ হলো অর্থ লোলুপতার, স্বার্থপরতার, কার্পণ্যতার জীবন্ত নিদর্শন। যে সুদখোর হবে সে কোন দিন আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হতে পারবে না। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সঙ্গীদের জীবিকা উপার্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তাদের কাপুরুষতা এবং জেহাদ বিমুখতা তথা ওহোদের রণাঙ্গণ থেকে পলায়নের মূল কারণ উপলব্ধি করতে কারোই কষ্ট হবে না। যাহোক আলোচ্য আয়াতে সুদের লেন-দেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে যদিও দ্বিগুণ চর্তুগুণ সুদ তথা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ না করার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু অন্যান্য আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম হওয়ার শর্ত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়নি।

অতএব, সর্ব প্রকার সুদ থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনে (সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "তফসীরে নূরুল কোরআন" তৃতীয় খণ্ডের ১৪-১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক তথা আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাক। এর ফলে হয়তো তোমরা সফল হবে অর্থাৎ দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করবে, আখেরাতে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এবং বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

"আর ভয় কর সেই অগ্নিকে যা কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দোযখের অগ্নি মূলতঃ কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে যদি কোন মুসলমান কাফেরদের ন্যায় পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে সে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাগিদ করা হয়েছে যে, তোমরা কাফেরদের ন্যায় কাজ করোনা এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত দোযখের শাস্তিকে ভয় করে চল।

আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা

ইমাম কুরতবী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে শাস্তির ঘোষণা তাদের জন্যে, যারা সুদকে হালাল মনে করতো। কেননা যে হারাম ঘোষিত জিনিসকে হালাল মনে করে সে কুফরী করে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এতে মোমেনদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে যেন কোন মোমেন সুদকে হালাল মনে না করে।

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মন্তব্য করেছেন যে এ আয়াত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের মধ্যে সর্বাধিক ভয়ের আয়াত। কেননা, এতে দোযখের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে সেসব লোকদেরকে যারা আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করে এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেনা।

'তফসীরে মাদারেকে' হযরত ইমাম আবু হানীফার (রঃ) কথাটি এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে–[১]

كان ابو حنيفة (رح) يقول هى اخوف اية فى القران حيث اوعد الله المنافقين بالنار المعدة للكافرين ان لم يتقوه فى اجتناب محارمه

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে, কাফেরদের জন্যে যে দোযখ প্রস্তুত করা হয়েছে তার শাস্তি সর্বাধিক। উম্মতে মোহাম্মদিয়ার পাপীষ্ঠ লোকদের জন্যে যে শাস্তির

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৪

ব্যবস্থা রয়েছে তা হবে অন্য দোযখে। আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো লিখেছেন, এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে যারা সুদখোর তারা কুফরের পার্শ্বে এসে হাযির হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, দোযখ মূলত কাফেরদের জন্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। মুসলমান হয়ে যারা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ অমান্য করে এবং কাফেরদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দোযখের শাস্তি দেবেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা আমরা ইতিপূর্বে তফসীরে মাদারেক থেকে উল্লেখ করেছি।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) শুধু এক বাক্যে আয়াত খানির তফসীর করেছেন তিনি বলেছেনঃ

واتقوا النار اى اخشوا النار فى اكل الربا التى اعدت اى خلق للكافرين

অর্থাৎ তোমরা সুদখোরীর ব্যাপারে সে অগ্নিকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।[২]

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা কিছু আদেশ করেছেন তা মেনে চল, আর যে সব বিষয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সে সব বিষয় থেকে বিরত থাক। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে দোযখের শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, আর এ আয়াতে আল্লাহর রহমতের খোশখবরী দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ কর। শুধু এভাবেই তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে, জীবন সাধনায় তোমরা হবে সফলকাম।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল আল্লাহর আযাবের সতর্কবাণী, আর এ আয়াতে রয়েছে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভের নিশ্চয়তা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ নাজাতের পূর্ব শর্ত

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভ ও করুণা-ধন্য হওয়ার জন্যে যেভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যকে একান্ত জরুরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক তেমনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর অনুসরণকেও চির শান্তি ও চির মুক্তি লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

অর্থাৎ "যে রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো সে যেন আল্লাহর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করলো"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা যায় না। অতএব, কেউ যদি একথা বলে যে, যা আল্লাহর কোরআনে আছে তা আমি মানবো আর যা পবিত্র কোরআনে নেই তা মানবো না সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। বর্তমান যুগে কিছু অর্ধশিক্ষিত আধুনিক লোকদের দেখা যায় যে তাদেরকে শরীয়তের কোন বিধান সম্পর্কে বলা হলে তারা জিজ্ঞাসা করে এই বিধানের কথা পবিত্র কোরআনের কোন্ আয়াতে আছে? অথচ একথা শুধু যে বাস্তবতা বিরোধী তাই নয়; বরং শরীয়ত বিরোধীও। কেননা, পবিত্র কোরআনে মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই মূলনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শরীয়াতের বিধান বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারি। পবিত্র কোরআনে নামায এবং যাকাতের তাগিদ রয়েছে শতাধিক আয়াতে। কিন্তু নামায ও যাকাতের নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। তিনি শরীয়তের বিধান সমূহের উপর আমল করার নিয়ম-কানুন হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্যেই তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মানুষকে কিতাব এবং হেকমতের শিক্ষা দান করেন, আর তাঁর শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকেরই শিক্ষা, তাঁর কথা আল্লাহ পাকেরই কথা- একথাটিও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, বরং তাঁর সব কথাই আল্লাহর ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়, এমনকি আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর। আর যে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ যুগে যারা এসব কথা বলে যে, "পবিত্র কোরআনে যা আছে আমরা শুধু তাই মানবো"- এমন কথা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি বিরোধী। মূলতঃ এ কারণেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের কথা পৃথক পৃথক ভাবে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ করেছেন-

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং আল্লাহর রসূলের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহীমে বিষয়টিকে আল্লাহ পাক যেভাবে এরশাদ করেছেন তা-ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এরশাদ হয়েছেঃ

الۤرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ- الاية

(আলিফ, লাম, রা। (হে রসূল!) আপনার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে মানুষকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। অর্থাৎ মানুষকে গোমরাহী থেকে বের করে আনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি।)

যেমন পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

(হে রসূল!) যা কিছু পবিত্র কোরআনে নাযিল হয়েছে তার মর্মবাণী যেন আপনি মানুষের নিকট বর্ণনা করেন।

এজন্যেই হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ

تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ وَالْعَمَلَ بِهٖ

"(অর্থাৎ) আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পবিত্র কোরআন শিখেছি এবং কিভাবে তার উপর আমল করবো তাও শিখেছি"

অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস এবং অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়।

প্রিয়নবী (সঃ)-এর সতর্কবাণী

বর্তমান যুগে যারা হাদীস শরীফকে অস্বীকার করে অথবা যারা কোন বিষয়ের প্রতি আমল করার জন্য শুধু পবিত্র কোরআনের আয়াতের দলিল অনুসন্ধান করে তাদের এ ফেতনা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

"আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় না পাই যে, সে আরাম কেদারায় বিশ্রামরত রয়েছে এবং আমার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে এই মন্তব্য করছেঃ আমরা এসব বিষয় জানি না, আল্লাহর কিতাবই (পবিত্র কোরআন) আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহর কিতাবে যা কিছু রয়েছে আমরা তার উপরই আমল করব"।

এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিজী, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ শরীফে। এতদ্ব্যতীত বায়হাকী ও মসনদে আহমদেও এই হাদীসখানি সংকলিত হয়েছে।

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

মাগফেরাত ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও

আর তোমরা আল্লাহর মাগফেরাত ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। অর্থাৎ অনতিবিলম্বে এমন সৎ কাজে মশগুল হও, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ হয়।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন এর অর্থ হলোঃ

سارعوا الى اداء الفرائض

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফরজ কাজ সমূহ সুসম্পন্ন করার জন্যে ছুটে আস। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো–

سارعوا الى الاسلام

অর্থাৎ তোমরা ইসলামের দিকে দ্রুত ছুটে আস, ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নে দ্রুত অগ্রসর হও।

আবুল আলিয়া বলেছেন এর অর্থ হলো–

سارعوا الى الهجرة

অর্থাৎ তোমরা অনতিবিলম্বে হিজরত কর।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো,

سَارِعُوْٓا اِلَى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

তোমরা দ্রুত নামাজের প্রথম তকবীর পাওয়ার জন্যে হাযির হও। আর সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন- এর অর্থ হলো–

سارعوالى اداء الطاعات

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে দ্রুত বেগে অগ্রসর হও। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য দ্রুত এগিয়ে আস।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, তোমরা অনতিবিলম্বে ছুটে আস জেহাদের জন্যে। আর একরামা বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা অনতিবিলম্বে ছুটে আস তওবার দিকে, অর্থাৎ তোমরা যাবতীয় পাপাচার থেকে অনতিবিলম্বে তওবা কর। এক কথায় বলা যায়, সৎ কাজের দিকে তোমরা অনতিবিলম্বে অগ্রসর হও।[১]

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

এবং দ্রুত ছুটে আস সেই জান্নাতের দিকে যার প্রস্থ হলো আসমান যমিনের সমান, তার দৈর্ঘ্য কত হবে? তা ভেবে দেখ। তবে তাঁর এল্ম আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো নিকট নেই।

মসনদে আহমদে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, রুম সম্রাট প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চিঠি এ মর্মে প্রেরণ করে যে, আপনি আমাকে যে জান্নাতের দাওয়াত দিয়েছেন তার প্রস্থই হলো আসমান যমিনের সমান, তাহলে বলুন দোযখ কোথায় রইল? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "সোবহানাল্লাহ! যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় থাকে"?

অর্থাৎ যখন রাতের আগমন হয় তখন দিন আমরা দেখি না, কিন্তু দিন কোথাও থাকে। এমনিভাবে যদিও দোযখ আমরা দেখি না, কিন্তু কোথাও তো দোযখ অবশ্যই থাকে।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৩
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬

জান্নাত কোথায়?

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছেঃ জান্নাত আসমানে না যমিনে? তিনি বলেছেনঃ কোন্ আসমানে ও যমিনে জান্নাতের স্থান সংকুলান হবে? তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে জান্নাত কোথায়? তিনি বললেনঃ সপ্ত আসমানের উপরে, আরশের নিম্নদেশে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ সাহাবায়ে কেরামের মতে জান্নাত হলো সপ্ত আসমানের উপরে, আর দোযখ হলো যমিনের সপ্ত স্তরের নিম্ন দেশে।[১]

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

"এই জান্নাত প্রকৃত মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে"।

প্রকৃত মুত্তাকীর পরিচয়

প্রকৃত ও পরিপূর্ণ পরহেযগার তারাই যারা আল্লাহর বন্দেগীতে নিজেকে বিলীন করে দেয়, যারা আল্লাহ পাকের সর্বপ্রকার নাফরমানী থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলে। যারা আল্লাহর পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে।

জান্নাতীদের বিশেষ গুণাবলী

পরবর্তী আয়াতে জান্নাতীদের বিশেষ গুণের উল্লেখ রয়েছে–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

"যারা সুখে দুঃখে আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না, সকল অবস্থায় আল্লাহর রাহে ব্যয় করে"।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ পরহেযগার লোকদের গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম দানশীলতার গুণের উল্লেখ করেছেন। কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী। পক্ষান্তরে, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, দোযখের নিকটবর্তী। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ব্যক্তি থেকে আল্লাহ পাকের মহান

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-২৫

দরবারে উত্তম বলে বিবেচিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার শাখা গুলো পৃথিবীতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, যে এ শাখাগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি শাখাকে ধরবে। (দানশীলতার পরিচয় দেবে) এ শাখাটি দানশীল ব্যক্তিকে বেহেশতে টেনে নিয়ে যাবে। আর কৃপণতা দোযখের একটি বৃক্ষ, যার শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যে এ শাখা ধরে রাখবে তথা আল্লাহর রাহে দান করতে কার্পণ্য করবে, সে শাখা তাকে টেনে দোযখে নিয়ে যাবে। (দারে কুতনী, বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "এক দেরহাম এক লক্ষের উপরে জয়ী হয়েছে"। এক জন সাহাবী আরজ করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! একথাটির তাৎপর্য কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি তার অগাধ সম্পদ থেকে এক লক্ষ দেরহাম দান করল। আরেক ব্যক্তি যার মাত্র দুটি দেরহাম রয়েছে, তন্মধ্যে সে একটি দেরহাম আল্লাহর রাহে দান করল। এ ব্যক্তির দান আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ এক লক্ষ দেরহামের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয়।[১]

বেহেশ্তবাসীগণের আরেকটি গুণ হলো তারা ক্রোধকে দমন করে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ

অর্থাৎ যারা ক্রোধকে দমন করে তারা হবে বেহেশতবাসী।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক হাদীস কুদসীতে এরশাদ করেছেন, "হে বনী আদম! যদি তুমি ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর, অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করে ক্রোধকে দমন করো তবে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ রাখবো, তোমার ধ্বংসের সময় তোমাকে আমি রক্ষা করবো। অন্য একখানি হাদীসের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে হজম করে, আল্লাহ্ পাক তার উপর থেকে স্বীয় আযাব সরিয়ে নেন। আর যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কথা থেকে নিজের রসনাকে বিরত রাখে আল্লাহ্ পাক তার দোষকে গোপন রাখেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন ওজর পেশ করে আল্লাহ পাক তার ওজর কবুল করেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে এরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি বীর পুরুষ নয়, যে অন্যকে পরাজিত করে, বরং প্রকৃত বীর পুরুষ সে যে নিজের ক্রোধকে প্রশমিত করে। (মসনদে আহমদ)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৪

হযরত হারেসা এবনে কোদামা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে তাঁকে নসীহত করার জন্য আরযী পেশ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি রাগ করোনা, উক্ত সাহাবী বললেন, আরো নসীহত করুন। তিনি এরশাদ করলেন, "রাগ করোনা, রাগ করোনা"। (মসনদে আহমদ)

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত আবু জর (রাঃ) রাগান্বিত হলেন, ঐ অবস্থায় তিনি বসে গেলেন, এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, এর কি অর্থ? তখন তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কারো ক্রোধ দূর না হয় তবে সে যেন শুয়ে পড়ে। (মসনদে আহমদ)

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, ওরওয়াহ এবনে মোহাম্মদ রাগান্বিত হলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজু করতে বসে গেলেন এবং বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শ্রবণ করেছি। তিনি এরশাদ করেছেন, "ক্রোধ শয়তানের তরফ থেকে, আর শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট, আর অগ্নি নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা। অতএব তোমরা ক্রোধের সময় অজু করতে বসে পড়"।

অতএব, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো যারা ক্রোধকে প্রশমিত করে তারা হবে বেহেশতবাসী।

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে তারাও হবে বেহেশতবাসী। যারা মানুষের অপরাধে ক্রোধকে দমন করে এবং সুখেঃ-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাহে দান করে তারাই বেহেশতবাসী।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এহসানকারীদের পছন্দ করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেনঃ যে মন্দ ব্যবহার করে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হলো এহসান। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এহসানের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি এরশাদ করেছেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের এবাদত এভাবে কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পার, তবে একথা বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন"।

মূলত হিংসা, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা প্রভৃতি মন্দ চারিত্রিক দুর্বলতা দূর করা এবং দানশীলতা, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, ক্ষমা ও ঔদার্য্য এবং পরোপকারের গুণ অর্জনের মাধ্যমেই চির শান্তি নিকেতন বেহেশত লাভে ধন্য হওয়ার খোশ খবরী রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

তরজমা

(১৩৫) আর যারা কোন প্রকাশ্য পাপ কাজ বা নিজেদের প্রতি কোন অবিচার করে বসে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কার্যের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক ব্যতীত কে আছে যে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলেছে তার মধ্যে জেনে শুনে জেদ করেনা।

(১৩৬) তারাই সে সব লোক যাদের পুরস্কার হলো তাদের পালন-কর্তার নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্‌ত, যার তলদেশ থেকে নহর প্রবাহিত হয়, তারা সেই বেহেশ্‌তে চিরদিন থাকবে। নেককারদের পুরষ্কার কত উত্তম!

(১৩৭) নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতিক্রান্ত হয়েছে, অতএব তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাত কত ভয়াবহ এবং শোচনীয় হয়েছে!

(১৩৮) এটি সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা আর পরহেযগারদের জন্যে দিশারী ও উপদেশ।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! মনে হয় বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের নিকট বড় সম্মানিত ছিল। কেননা তাদের কেউ রাত্রে কোন পাপ কাজ করতো সকালে তার গৃহের দুয়ারে লিপিবদ্ধ অবস্থায়

দেখা যেত যে, তোমার এ পাপ কাজের জন্যে কাফ্ফারা আদায় কর। যেমন নিজের কান কেটে ফেল বা নিজের নাক কেটে ফেল বা এই কাজ কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাটি শ্রবণ করে নীরব হলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আতা (রঃ) বলেনঃ আয়াত খানি নাযিল হয়েছে নেভহান নামক এক খেজুর বিক্রেতা সম্পর্কে। ঘটনার বিবরণ এই, একজন সুন্দরী মহিলা তার দোকানে খেজুর ক্রয় করতে আসে। নেভহান বলল এর চেয়ে ভাল খেজুর আমার ঘরে আছে। আপনি ইচ্ছা করলে আমার ঘরে আসতে পারেন। অবশেষে সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে নেভহান তার ঘরে গেল এবং স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে ফেললো। স্ত্রীলোকটি বললো, আল্লাহকে ভয় করো। একথা শ্রবণ করা মাত্র নেভহান তাকে ছেড়ে দিল। সে অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

বিস্ময়কর ঘটনা

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হিযরতের পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললেন, তখন সাঈদ এবনে আবদুর রহমান ও সা'লাবাতুল আনসারীর মধ্যেও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন অভিযানে তশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তাঁর সাথে গমন করেছিলেন সাঈদ এবনে আবদুর রহমান। তাঁর বাড়ী-ঘর দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন সা'লাবাতুল আনসারীর উপর। সালাবা সাঈদের বাড়ীর কাজ করে দিয়ে যেতেন, একদিন ইবলিস শয়তানের ধোকায় পড়ে সা'লাবা পর্দা সরিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সাঈদের সুন্দরী স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করলেন। এমন অবস্থায় সাঈদের স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার ভাই আল্লাহর রাহে জেহাদে গিয়েছেন তুমি কি তাঁর আমানত খেয়ানত করতে উদ্দত হয়েছ? এতটুকু কথা সা'লাবার অন্তরে এক তুফান সৃষ্টি করলো, তিনি সেখান থেকে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে চিৎকার করে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এলাহী! আমি পাপী, আমি গুনাহগার। কিন্তু তুমি যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি যে দয়াবান।

এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মদীনায় যারা ছিলেন, সকলেই তাঁদের গাজী ভাইদের সম্বর্ধনায় এলেন। কিন্তু সাঈদের ভাই সা'লাবাকে দেখা গেলো না, সাঈদ বাড়ীতে এসে সব খবর জানতে পেরে সা'লাবার অনুসন্ধান করলেন এবং বললেনঃ ভাই সা'লাবা। তুমি আমার সঙ্গে চলো। সা'লাবা বললেনঃ আমি এভাবে যাব না, তুমি

আমার হাতকে আমার ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে সেই রশি ধরে একটা অপমানিত গোলামের মত আমাকে টেনে যাও, তবে আমি যাব, অবশেষে তাই করা হলো, এমনকি সা'লাবার কন্যা খামসানাও পিতাকে রশি দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন। প্রথমতঃ তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট হাযির হলেন এবং পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করার পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার এ অন্যায়ের জন্যে তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি-না। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ ঘটনা শ্রবণ করে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং সা'লাবাকে বের করে দিলেন, এরপর তারা হাযির হলেন হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট এবং তওবার পন্থা বলতে বারবার অনুরোধ করলে তিনিও তা প্রত্যাখান করলেন। এরপর আসলেন হযরত আলীর (রাঃ) নিকট, কিন্তু তিনিও বললেন, আমার নিকট তোমার জন্যে তওবার ব্যবস্থা নেই।

এরপর সা'লাবা হাযির হলেন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এবং সঙ্গী ভাই সাঈদ ও কন্যা খামসানাকে বললেনঃ আশা করি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেই এরশাদ করলেনঃ তুমি দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। তখন সা'লাবা বিনীতভাবে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আমি আমার মুজাহেদ ভাইয়ের স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করেছি, আমি তওবা করতে চাই, আমার তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তোমার জন্যে তওবা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সা'লাবার কন্যা খামসানা বললোঃ হে আমার পিতা! আজ থেকে আপনি আমার পিতা নন্ যে পর্যন্ত না আপনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সন্তুষ্ট করেন।

এরপর সা'লাবা পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেনঃ এলাহী! আমি ওমরের নিকট হাযির হয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে প্রহার করতে চেয়েছেন, আমি আবু বকর (রাঃ) ও আলীর (রাঃ) নিকট হাযির হয়েছি, তাঁরাও আমাকে প্রত্যাখান করেছেন। এরপর আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মহান দরবারে হাযির হয়েছি, তিনিও আমাকে নিরাশ করেছেন।

কিন্তু তুমি আমার মালিক! আমি তোমার গোলাম, তোমার সুমহান দরবারে এই গোলাম হাযির হয়েছে, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কর তবে আমার খুশীর সীমা থাকবে না, আর তুমি যদি আমাকে নিরাশ কর তবে আমার ন্যায় হতভাগা আর কেউ নেই। এভাবে সারা রাত তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং আল্লাহ্র দরবারে কাঁদতেন।

ঠিক এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একজন ফেরেশতা হাযির হলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেন এই বিশ্ব জগৎকে, এই সমগ্র মানব জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি, না আপনি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ নিঃসন্দেহে সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ পাক। এরপর ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আমি আমার বন্দাকে ক্ষমা করেছি, এ সুসংবাদ তাকে পৌঁছে দিন। এরপর প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সা'লাবাকে আমার নিকট কে নিয়ে আসবে? তৎক্ষণাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তাঁকে নিয়ে আসি, আর তখনই দণ্ডায়মান হলেন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ)। তাঁরা বললেনঃ আমরা তাঁকে নিয়ে আসি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। এরপর তাঁরা সা'লাবাতুল আনসারীর সন্ধান করতে লাগলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে কৃষিকর্মে লিপ্ত লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেনঃ আপনারা কি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির সন্ধান করছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন একজন বললেনঃ তিনি রাত্রিকালে এখানে আসেন, এ বৃক্ষতলে এসে উচ্চস্বরে আল্লাহ্র দরবারে কাঁদতে থাকেন।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) তাই নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যখন রাত হলো তখন সা'লাবা উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের হুজুরে সেজদা রত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্নার শব্দ শ্রবণ করে তাঁরা সা'লাবার নিকট গমন করে বললেন ঃ হে সা'লাবা! চলো আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমরা কি অবস্থায় দেখে এসেছ? তাঁরা বললেন ঃ তা যেমন আল্লাহ্ পাকের পছন্দ, আর যেমন তোমার আন্তরিক ইচ্ছা ঠিক তেমন অবস্থায়ই তাঁকে দেখে এসেছি। এরপর তাঁকে নিয়ে তারা মসজিদে নববীতে হাযির হলেন, তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে, হযরত বেলাল (রাঃ) নামাজের একামত বলছেন, ফজরের নামাজ শুরু হয়ে গেছে, তাঁরা সর্বশেষ কাতারে শরীক হয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করছিলেন, প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে এ সূরা শ্রবণ করেই সা'লাবা চিৎকার করে উঠলেন, আর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

তখন তিনি আরো একটি চিৎকার দিলেন এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। নামায শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'লাবার নিকট এসে সালমান

ফার্সী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, তার মুখে একটু পানির ছিঁটা দাও, তখন সালমান ফার্সী (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সা'লাবা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

এমন সময় তার কন্যা খামসানাহ্ হাযির হয়ে পিতার মৃতদেহ দেখে কাঁদতে লাগলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ হে খাম্সানাহ! তুমি কি এতে রাজী নও যে, আমি তোমার পিতা হই এবং ফাতেমা হবে তোমার বোন, সে বললোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই রাজী আছি।

এরপর তাঁকে কবরস্থানে পৌঁছানো হলো, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানাযার সঙ্গে রইলেন। কবরের পার্শ্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কদম মুবারক রাখছিলেন না, বরং আঙ্গুলের উপর ভর করেই তিনি হাঁটছিলেন। দাফন কার্য সমাপ্তির পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে এ অস্বাভাবিক ভাবে চলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেন হে ওমর! কবরস্থানে এত অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমা হয়েছিল যে, মাটিতে পা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

কোন কোন তফসীরকার বর্ণনা করেছেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কোরআনের এ আয়াত নাযিল হয়ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهَ.....وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

এবং যারা অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয়েছে, নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, এরপর তারা আল্লাহ পাকের স্মরণ করেছে, তাঁর সমীপে তাদের গুনাহর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে? বস্তুতঃ যারা আন্তরিত ভাবে অনুতপ্ত হয়ে কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এভাবেই ক্ষমা করেন (আল্লাহ্ পাক আমাদেরকেও এর তওফিক দান করুন)।[১]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ক্ষমা করার এ ঘোষণা শুধু এ ব্যক্তির জন্যে না সকল মানুষের জন্যে?

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬-৬৭

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ঘোষণা সকল মানুষের জন্যে।

ইবলিসের ক্রন্দন

তিরমিজি শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আততাফ এবনে খালেদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইবলিস শয়তান তার সৈন্য নিয়ে চিৎকার আরম্ভ করে এবং তার মাথার উপর মাটি ফেলতে থাকে। তার চিৎকার শুনে পৃথিবীর সব দিক থেকে তার সৈন্যরা হাযির হয় এবং জিজ্ঞাসা করে আপনার কি হয়েছে? সে বলে পবিত্র কোরআনে এমনি একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যার কারণে কোন আদম সন্তান তার গুনাহ্র কারণে আর ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে না। তারা বললোঃ সে আয়াত খানি কি? সে তখন আলোচ্য আয়াতের কথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়। ইবলিসের কর্মীরা বললোঃ আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা বনী আদমকে এমন ভাবে পাপাচারে লিপ্ত রাখবো যে, তারা তওবার কোন সুযোগই পাবে না এবং আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থীও হবে না, আর অন্যায় করেও নিজেদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করবে যে, তারা হক্বের উপর রয়েছে। তখন ইবলিস শান্ত হলো।[১]

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর কথা মনে করে পাপাচার থেকে তওবা করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তারা উপলব্ধি করে যে, এ কাজের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে, তখন অত্যন্ত লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন।

ক্ষমা প্রার্থনার পন্থা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মোমেন বন্দা যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়, অতঃপর ভাল করে অজু করে দু' রাকাআত নামায আদায় করে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে আল্লাহ পাক গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত খানি তেলাওয়াত করেন।[২] (তিরমিযী শরীফ)

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৭

আর আল্লাহ ব্যতীত কে তাদের গুনাহ্ মাফ করবে? অর্থাৎ কোন নবী, ওলী ফেরেশতা কারো হাতেই মানুষকে মাফ করার অধিকার নেই। মাফ শুধু এক আল্লাহ পাকই করতে পারেন, আর কেউ নয়। এতে বিশেষভাবে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের ধারণা হলো গুনাহ্ মাফ করার অধিকার রয়েছে হযরই ঈসা (আঃ)-এর এমনকি, তাঁর প্রতিনিধিদেরও। একথা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[১]

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে একথার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক ক্ষমা প্রার্থীকে মাফ করবেন কেননা, আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম। তিনি রহমানুর রহীম, তাঁর দয়া মায়া অন্তহীন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ– الايه

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন ঃ হে বন্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ্ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান"।

প্রকৃত মুসলমান নিরাশ হয় না

মূলতঃ প্রকৃত মুসলমান কখনো কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না, হতে পারে না। কেননা সকল দুয়ার বন্ধ হলেও বন্দার জন্যে দয়াময়, করুণাময়, প্রেমময় আল্লাহ্ পাকের দ্বার কোন সময়ই রুদ্ধ হয় না। তবে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে একটি শর্ত আছে, তাহলো–

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

অর্থাৎ– তওবার সঙ্গে সঙ্গে পাপ কার্যের জন্যে পাপীকে অনুতপ্ত হতে হবে, শুধু তাই নয়; বরং পাপকার্য সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই পাপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং সে সংকল্পের উপর অটল অবিচল থাকতে হবে। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পাপ কাজ অব্যাহত রেখে ক্ষমা প্রার্থী হয় সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে বিদ্রুপ করে"। (বায়হাকী)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ সগীরা গুনাহ যদি নিয়মিত ভাবে সর্বদা করা হয় তবে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ "যদি কবীরা গুনাহর জন্যে

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৫

এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তবে তা কবীরা গুনাহ থাকে না। পক্ষান্তরে, যদি কোন সগীরা গুনাহ নিয়মিত করা হয় এবং জেদ করে করা হয় তবে তা সগীরা গুনাহ থাকেনা; বরং কবীরা গুনাহে পরিণত হয়"। (দায়লামী)

وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তাদের মন্দ কাজের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে তারা অবগত। তারা জানে যে পাপ কার্যের পরিণতি হয় অত্যন্ত মন্দ এজন্যে তারা পাপ কার্যকে অব্যাহত রাখে না, বরং পাপাচারকে পরিহার করে চলে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যে এই গুনাহ্ মাফ করবেন একথা এ ব্যক্তি জানে।

হোসাইন এবনে ফজলে (রঃ) বলেছেন যে এ বাক্যটির অর্থ হলো তারা এ বিষয়ে জানে যে তাদের একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি তাদের গুনাহ মাফ করবেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এ বাক্যটির অর্থ হলো তারা জানে যে গুনাহ্ যত বড়ই হোক ক্ষমা তার চেয়ে বড়।

আর একদল তফসীরকার বলেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো তারা জানে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি ক্ষমা করবেন।

মুসলিম শরীফ ও বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোন বন্দা একটি গুনাহ্ করে, অতঃপর আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার দ্বারা একটি গুনাহ্ হয়ে গেছে আমাকে মাফ করুন। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমার বন্দা জানতে পেরেছে যে, তার প্রতিপালক রয়েছে এবং তিনি অপরাধ ক্ষমাও করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষ পাকড়াও করেন। আমি আমার বন্দাকে ক্ষমা করেছি। কিছুদিন পর এ ব্যক্তি আরেকটি গুনাহ্ করে এবং আরজ করেঃ হে পরওয়ারদেগার! আমার দ্বারা আরো একটি গুনাহ্ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন যে, আমার বন্দা জানে যে তার একজন মালিক রয়েছে যিনি গুনাহ্ মাফ করেন। আমি আমার বন্দাকে মাফ করে দিয়েছি।

এমনিভাবে আরও কিছু দিন পর সে আরো একটি গুনাহ্ করে এবং আরজ করেঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমার বন্দা জানে যে, তার একজন মালিক রয়েছেন যিনি গুনাহ মাফ করেন, ক্ষেত্র বিশেষে পাকড়াও করেন। আমি আমার বন্দাকে মাফ করে দিয়েছি।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭০

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি একথা জানে যে আমি তার গুনাহ মাফ করতে সক্ষম, আমি তাকে মাফ করে দেই, কত গুনাহ রয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি না, যদি সে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে।[১]

ফেরেশতারা করমর্দন করতো

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়, আখেরাতের চিন্তা, আল্লাহর ভয় আমাদের মনে খুব বেশী হয়। এক কথায় আমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাই। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে চলে যাই তখন আর এ অবস্থা থাকেনা। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সাংসারিক চিন্তায় এবং কর্মে মশগুল হই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ শোন! আমার সম্মুখে অবস্থান কালে তোমাদের অন্তরে যে অবস্থা হয় তা যদি সর্বদা থাকত তবে ফেরেশতারা এসে তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতো, তোমাদের মোলাকাতের জন্যে তারা তোমাদের বাড়ীতে হাযির হতো। শোন! যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতেন এবং তোমাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে হাযির করতেন যারা গুনাহ করতো এবং এরা ক্ষমা প্রার্থী হতো, আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করতেন।

মূলতঃ গুনাহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া একান্ত কর্তব্য। ক্ষমা প্রার্থনা না করে গুনাহ অব্যাহত রাখা এবং জেদ ধরা চরমতম অন্যায়। যারা গুনাহ করার পর এজন্যে অনুতপ্ত হয় এবং বিনীতভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে আর কৃত অন্যায়কে পরিহার করে এবং তাকওয়া পরহেযগারীর নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাতের খোশখবরী। এরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

এরাই সে সব লোক যাদের প্রতিদান হলো মাগফেরাত তথা আল্লাহ পাক যারা তওবাকারী তাদেরকে মাফ করবেন এবং এমন জান্নাত দান করবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয় আর সে জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৯

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনকারী যারা তওবাকারী উভয়ের জন্যেই রয়েছে এ খোশখবরী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গুনাহ থেকে তওবাকারী সে ব্যক্তির ন্যায় যে গুনাহ করেনি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই জান্নাত তৈরী করা হয়েছে ঈমানদার, নেককার এবং পরহেযগার লোকদের জন্যে আর দোযখ তৈরী করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে। কিন্তু যারা মোমেন হয়েও কবীরা গুনাহর মধ্যে মশগুল থাকে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে কিছু দিন দোযখের শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে পবিত্র করে বেহেশত দান করবেন। যেমন কোন কোন খণিজ দ্রব্যকে অগ্নির মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন করা হয়।[১]

وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

কত উত্তম নেককারদের এই প্রতিদান! আর নেককার হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনাকারী। গুনাহর মাধ্যমে যে বন্দা আল্লাহর নাফরমান বা অবাধ্য হয় সে যখন অনুতপ্ত হয়ে কৃত অন্যায়ের জন্যে সঠিক তওবা করে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ পাক শুধু যে তাদেরকে ক্ষমা করেন তাই নয়, বরং এ ক্ষমা প্রার্থনার পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত দান করেন, এর চেয়ে বড় খোশখবরী আর কি হতে পারে!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

এ পৃথিবীতে তোমরা নতুন নও; বরং তোমাদের পূর্বেও পৃথিবীতে বহু জাতি এসেছে এবং বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়েত মেনে চলেছে তারা সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, আল্লাহর নবীগণের সাথে শত্রুতা করেছে, আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। বিশ্বাস যদি না হয় তবে বিশ্ব ভ্রমণ কর এবং আল্লাহর নাফরমানদের পরিণাম দেখতে চেষ্টা কর। তোমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আল্লাহ নাফরমানদের সর্বনাশা পরিণামের বহু জলন্ত নিদর্শন আজও এ পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আপাতঃদৃষ্টিতে, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সম্পদ, শক্তি এবং বিজয় দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছুই নেই কেননা, তাদের চরম সর্বনাশ অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যারা মুসলমান, যারা আল্লাহর অনুগত, যারা সত্যের অনুসারী তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। আপাতঃদৃষ্টিতে তাদের দুর্বলতা, দুর্যোগ পরিলক্ষিত হলেও

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-২৭

অবশেষে সত্য ও ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই কেননা, এটিই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের অমোঘ বিধান।

هٰذَا بَيَانٌ

অর্থাৎ এই পবিত্র কোরআন যাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে সত্য ও ন্যায়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা, যেন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতির চোখ খুলে যায় এবং এ জীবন ও পরজীবন সম্পর্কে তারা সুশিক্ষা লাভ করে, আর এই কোরআনে রয়েছে মুত্তাকী ও পরহেযগার লোকদের জন্যে হেদায়েত, নসিহত এবং সৎ পথের সুশিক্ষা। মুত্তাকীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো শুধু তারাই পবিত্র কোরআনের দ্বারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। বস্তুত যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তারাই আল্লাহর কালাম পাঠ করে, আল্লাহর নবী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে। পরকালের চিন্তা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

وَلَا تَهِنُوْا
وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ
الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾
وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾
اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

তরজমা

(১৩৯) এবং তোমরা সাহস-হারা হয়োনা আর চিন্তিতও হয়োনা, তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি প্রকৃত মোমেন হও।

(১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তারাও খেয়েছে। আর আমি যে মানুষের মাঝে দিন কাল পালাক্রমে পরিবর্তন করে থাকি যেন আল্লাহ্ পাক প্রকাশ্য ভাবে অবগত হন যে প্রকৃত মোমেন এবং তোমাদের মধ্যে

থেকে যেন তিনি কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ পাক জালেমদের আদৌ পছন্দ করেন না।

(১৪১) আর যেন আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে পবিত্র করেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করেন।

(১৪২) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে কে সংগ্রামী মুজাহেদ এবং বিপদে ধৈর্য ধারণকারী তা জেনে নেবেন না?

(১৪৩) এবং তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই তার আকাঙ্ক্ষা করেছিলে, এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখে নিলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমাদের পূর্বে বহু জাতি অতীত হয়েছে, বহু বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, আল্লাহ পাক তাঁর বিধান সম্পর্কে মানব জাতিকে বারে বারে অবহিত করেছেন। তবু পথভ্রষ্ট মানুষ সত্যের বিরোধিতা করেছে, নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। অবশেষে তারা ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে। ঠিক এভাবেই ওহোদের যুদ্ধে কাফেররা সাময়িকভাবে বিজয় লাভ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হেনেছে এমনকি, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মুবরাক রক্তাপ্লুত হয়েছে। এমনি নৈরাশাজনক পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান

মুসলিম মুজাহেদদের মনোবল বৃদ্ধি করার নিমিত্তে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা ভগ্ন-হৃদয় হয়োনা, চিন্তিতও হয়োনা। অবশেষে বিজয় তোমাদেরই, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদিকে যখন মুজাহেদগণ আহত রক্তাপ্লুত শহীদানের পবিত্র দেহ দাফন কার্যে রত, প্রতিটি মুসলিম ক্রন্দনরত ঠিক এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করে দেয়। তাদের আহত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নবজীবনের স্পন্দন অনুভুত হয়। আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হে মোমেনগণ! তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত তবে শর্ত হলো তোমাদেরকে প্রকৃত মোমেন হতে হবে। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসে অটল অবিচল থাকতে হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, হে মোমেনগণ! তোমাদের অবস্থা কাফেরদের চেয়ে অনেক উত্তম। কেননা যদিও তোমাদের ৭০ জন মুজাহেদ ওহোদের রণাঙ্গণে শহীদ হয়েছে কিন্তু এক বছর পূর্বে কাফেরদেরও ৭০ জন নিহত হয়, শুধু তাই নয়; বরং তাদের ৭০ জন তোমাদের হাতে বন্দীও হয়, অথচ তোমাদের একজনও তাদের হাতে বন্দী হয়নি। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমন অপমান থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে অপমানিত করেছেন। আর তোমরা জেহাদ করছো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আর তারা যুদ্ধ করছে শয়তানের জন্যে। এতদ্ব্যতীত তোমাদের যুদ্ধ সত্য দ্বীনের জন্যে আর তারা যুদ্ধ করেছে বাতিলের জন্যে।

অতএব, তোমরাই বিজয়ী, তোমাদের অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভাল। এতদ্ব্যতীত এ জেহাদের জন্যে তোমরা আখেরাতে শুভ পরিণতি লাভ করবে, আর তারা ভোগ করবে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি।[১]

এ বাক্যটির তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো ওহোদের যুদ্ধে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার জন্যে তোমরা সওয়াবের আশা কর কিন্তু কাফেরদের সওয়াবের কোন আশা নেই। তোমাদের শহীদগণ জান্নাতে রয়েছেন, আর কাফেরদের তরফ থেকে যারা নিহত হয়েছে তারা দোযখে রয়েছে। ওহোদের যুদ্ধের পর যখন মুসলমানগণ আহত এবং ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় ছিলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন কাফেরদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করতে। এমন সময় এ আয়াত নাযিল হয় এবং মুসলমানদের মুমূর্ষু দেহে যেন নবপ্রাণ ফিরে আসে, কাফেররা পলায়নে বাধ্য হয়।

বিজয় লাভের পূর্বশর্ত

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও, তোমাদের ঈমান যদি সুদৃঢ় থাকে তবে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কেননা যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য অবশ্যই লাভ করে থাকে। অতএব, সাহস-হারা হয়োনা এবং সাময়িক পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়োনা কেননা, মর্দে মোমেন কোন অবস্থাতেই সাহস-হারা হয় না। আর তা তাদের জন্যে শোভনও নয়। অতএব প্রকৃত মো'মেন হওয়া বিজয় লাভের পূর্ব শর্ত।

কোন কোন তফসীরকার আয়াতের এ অর্থও করেছেনঃ হে মোমেনগণ! ওহোদের যুদ্ধে যা ঘটে গেল তার জন্যে ব্যথিত মর্মাহত হয়ে বসে থেকোনা এবং ভবিষ্যতে শৈথিল্যকে প্রশয় দিও না। যদি প্রকৃত মোমেন হও তবে অবশেষে তোমরাই হবে জয়ী।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭১-৭২

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! যদি যুদ্ধে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তবে স্মরণ কর ইতিপূর্বে তারাও তোমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও জর্জরিত হয়েছে। যদি তোমাদের কিছু লোক শাহাদাত বরণ করে থাকে তবে তাদেরও নেতৃস্থানীয় অনেকে তোমাদের হাতে নিহত হয়েছে। আর পৃথিবীর বুকে জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ মানব জাতির মধ্যে চক্রের ন্যায় পালা বদল করে থাকে। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত থাকে। কখনও একদল জয়ী হয়, আবার কখনও সে দলই পরাজিত হয়– এটি আমোঘ বিধান।

ওহোদের যুদ্ধে বিপর্যয়ের হেকমত

আর এতে হেকমত হলো এই যে, প্রকৃত মোমেন কে আর মুনাফেক কে তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে দেয়া ছিল এ পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। ইসলামের জন্যে যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন হয় এমন কঠিন মুহূর্তে কে সবর অবলম্বন করে আর কে সবরের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, যারা শাহাদাতের দুলর্ভ সুযোগ লাভের জন্যে ব্যাকুল ছিল তাদেরকে সে সুযোগ দেয়াও ওহোদের যুদ্ধের এ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে কাফেরদের সাময়িক বিজয় হয়েছে কিন্তু মনে রেখ আল্লাহ পাক এ জালেমদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

এতদ্ব্যতীত, মুসলমানদের গুনাহ দূর করা, তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করা, কাফেরদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করাই হলো ওহোদের যুদ্ধের এ বিপর্যয়ের কারণ। কেননা কাফেররা তাদের এ সাময়িক বিজয়ে অহংকারে অন্ধ হয়ে যাবে, ফলে আরো বেশী দৌরাত্ম করবে এবং তা তাদের চরম ধ্বংসের কারণ হবে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে কখনও পছন্দ করেন না।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের দিন হযরত যোবায়ের এবনে মোতএমকে (রাঃ) নেতা নির্বাচন করে ৫০ জন সাহাবায়ে কেরামকে ওহোদ পাহাড়ের গিরি পথে মোতায়েন করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন যুদ্ধে জয় হোক কি পরাজয় তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই যখন মুসলমানদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে কাফেররা পলায়ন করতে থাকে এবং রণাঙ্গণে যুদ্ধরত মুসলমানগণ গনিমতের সম্পদ একত্রিত করতে থাকে তখন গিরি পথে মোতায়েন ৪০ জন সাহাবী এ বিজয়কে চূড়ান্ত বিজয় মনে করে রণাঙ্গনে হাযির হলেন। এ সুযোগে কাফেররা পেছন থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে ওহোদের যুদ্ধে বিপর্যয়ের সূচনা করে। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ হয়। হযরত আমীরে হামজা (রাঃ) সহ ৭০ জন মুসলমান শাহাদাত করণ করেন। এই সময় আবু সুফিয়ান তিনবার ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মধ্যে কি (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আছেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জবাব দানে সাহাবায়ে কেরামকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় প্রশ্ন করে তোমাদের মধ্যে কি আবু তালহার পুত্র বর্তমান আছে? এবারও কোন জবাব দেয়া হয়নি। এরপর সে জিজ্ঞাসা করে এবনে খাত্তাব কি তোমাদের মধ্যে আছে? এবারও কোন জবাব দেয়া হয়নি, তখন সে তার সাথীদেরকে বলে এরা সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। তখন হযর ওমর (রাঃ) সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুই মিথ্যাবাদী। যাদের নাম তুই উল্লেখ করেছিস তাঁরা সকলেই জীবিত আছেন।

আবু সুফিয়ান বললোঃ আজকের দিন বদরের দিনের বদলা হলো। তোমাদের যারা এ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাদের কারো কারো বিভিন্ন অঙ্গ কর্তন করা হয়েছে। যদিও এর আদেশ আমি দেইনি। কিন্তু কাজ একেবারে মন্দ হয়নি। এরপর সে হোবলের জয়! বলে শ্লোগান দেয় (হোবল হলো তাদের মূর্তির নাম)। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'তোমরা এর জবাব দাওনা কেন'?

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ 'আমরা কি জবাব দেব'?

তিনি এরশাদ করলেনঃ 'তোমরা বল আল্লাহু আকবর'।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বললোঃ আমাদের উজ্জা আছে, তোমাদের নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ-ক্রমে সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আল্লাহ পাক আমাদের মওলা, তোমাদের মওলা নেই।[১]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আবু সুফিয়ান হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললোঃ তোমার ইচ্ছা হলে আমাদের কাছে আসতে পার। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ওমর যাও, দেখ তার কি কাজ আছে। এ নির্দেশ মোতাবেক হযরত ওমর (রাঃ) গমন করলেন। তখন আবু সুফিয়ান বললো, ওমর আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছিঃ আমরা কি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করেছি? হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ, 'না'। তিনি তো এখনও তোমার কথা শ্রবণ করছেন। আবু সুফিয়ান বললোঃ তুমি আমার দৃষ্টিতে এবনে কুমাইয়া থেকেও সত্যবাদী এবং সত্য শপথকারী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭২-৭৩

এবনে কুমাইয়া কোরায়শকে বলেছিল যে, আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করেছি। অতঃপর আবু সুফিয়ান বললোঃ এ বছর শেষ হবার পর পুনরায় তোমাদের সঙ্গে মোকাবেলা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ বলে দাও, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এ অঙ্গীকার হয়ে গেল।

এমনি একখানি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ- যেসব মুসলমান রণাঙ্গনে সুদৃঢ় ঈমান এবং সংকল্পে দৃঢ়তার পরিচয় দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ পাক প্রকাশ্যভাবে জেনে নেন।

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ

অর্থাৎ তোমাদের কিছু লোককে শাহাদাতের মর্তবা দান করি অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো কেয়ামতের দিন অন্য জাতির ব্যাপারে যেসব মুসলমান সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে নির্বাচন করি।

এবনে আবি হাতেম একরামার (রঃ) একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ওহোদের দিন যখন রণাঙ্গণ থেকে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন মদীনা শরীফ থেকে কিছু নারী বের হয়ে পড়লেন এবং দেখলেন, দু' ব্যক্তি উষ্ট্রের আরোহন করে আসছে। তখন একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা? উষ্ট্র আরোহীরা বললোঃ তিনি জীবিত আছেন তখন স্ত্রীলোকটি বললোঃ এখন আর কোন চিন্তা নেই, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের থেকে কিছু লোককে যদি শহীদও করে দেন। এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

আল্লাহ পাক জালেম তথা কাফের মুনাফেকদের আদৌ পছন্দ করেন না।

এ আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানগণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর প্রিয় হাবীব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ওহোদের রণাঙ্গণে এত বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এর তাৎপর্য কি? তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক কোন দিনও কাফের মুনাফেকদের পছন্দ করেন না। তবে মাঝে মধ্যে তারা যে বিজয় লাভ করে তার কারণ হলো তাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দেয়া এবং মুসলমানদের পরীক্ষা গ্রহণ করা।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আর যা কিছু ওহোদের যুদ্ধে ঘটেছে তার এটিও একটি কারণ যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন যেন মোমেনদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেন। এ যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের গিরি পথে যাদেরকে মোতায়েন করেছিলেন তাদের কয়েকজন সময় হওয়ার পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করেছিলেন, এটি ছিল সত্যিই গুনাহর কাজ।

কল্যাণ লাভের পন্থা

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ ওহোদের যুদ্ধের এ বিপর্যয়ের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করতে চান। এর দ্বারা মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক এ শিক্ষা দান করলেন যে, মুসলিম জাতির বিজয়, সুখ-শান্তি, সৌভাগ্য এক কথায় যাবতীয় কল্যাণ লাভের পন্থা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূণ অনুসরণ। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মধ্যে যে বা যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করবে তাদের ব্যর্থতা অবধারিত হবে।

وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ কাফেরদেরকে এ সাময়িক বিজয় দান করা হয়েছে তাদের ধ্বংসের লক্ষ্যে। কেননা, এ বিজয়ের কারণে তারা অহংকারী হবে আর অহংকার পতনেরই কারণ হয়।

মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন যে আধুনিককালের একজন পাশ্চাত্য ইতিহাস বেত্তা ওহোদের যুদ্ধ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন যে, "যদিও ওহোদের যুদ্ধে পৌত্তলিকরা বিজয় লাভ করেছে কিন্তু এ সাময়িক বিজয়ই তাদের স্থায়ী পতনের কারণ হয়েছে"।[১]

আর এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানগণ যখনই কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তার দুটি কারণ থাকে–

(১) গুনাহ দুর করার জন্যে অথবা

(২) তাদের মর্তবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা কি এমনিই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে? আর তোমাদের কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না? এমনটিতো হওয়ার নয়। জান্নাত আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, অমূল্য নেয়ামত, যা অদ্বিতীয়, যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, যার সম্পর্কে চিন্তা করাও সম্ভব নয়, যাতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, যার সৌরভ গৌরব অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, সেই জান্নাতের প্রবেশ করা এত সহজ নয় যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না করেন এবং তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাহের মুজাহেদ, আর কে জেহাদের কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বনকারী তা প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত না হয় সে পর্যন্ত কিভাবে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে? অতএব, জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার লাভ করতে হলে তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আল্লাহর রাহে জেহাদের সময় চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হবে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি তারা সর্বদা আক্ষেপ করে বলতেন, যদি আবার আল্লাহ পাক জেহাদের এমন কোন সুবর্ণ সুযোগ দান করেন তবে আমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেব এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবো। তাদের লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরাইতো শাহাদাতের তথা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলে। আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করার যে কামনা বাসনা সেদিন তোমাদের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেই কামনা পূর্ণ হওয়ার সুযোগই তো এসেছে ওহোদের রণাঙ্গণে মৃত্যুর মাধ্যমে অতএব, এতে আক্ষেপের কিছুই নেই।

হাদীস শরীফে আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলোঃ দুশমনের মুখোমুখি হওয়া কামনা করোনা, কিন্তু যদি তাদের মুখোমুখি হও তবে সুদৃঢ়, অবিচলিত থেকো।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن
مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ
عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّن
مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

তরজমা

(১৪৪) আর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রসূল এ জগতে এসেছেন এবং চলে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ পাকের ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ পাক অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবেন।

(১৪৫) আর আল্লাহ পাকের হুকুমে নির্ধারিত সময় ব্যতীত কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারেনা এবং যে দুনিয়ার পুরস্কার চায় আমি তাকে দুনিয়া থেকেই তা দান করবো, আর যে আখেরাতের পুরস্কার চায় আমি তাকে তা-ই দেব, আর আমি অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবো।

(১৪৬) এবং অনেক নবী ছিলেন. বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা সাহস হারা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে নাই এবং নত হয় নাই আর আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

তফসীরুল কোরআন

আর (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে বহু রসূল আগমন করেছেন এবং পৃথিবী থেকে গমনও করেছেন। কোন রসূলই চিরদিন পৃথিবীতে থাকেননি, অতএব. যদি (হযরত)

মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এন্তেকাল হোক অথবা তিনি শাহাদাত বরণ করেন তবে কি তোমরা আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে চলে যাবে? মনে রেখ যারা আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে যায়, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে।

নাম মোবারক প্রসঙ্গ

পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক 'মোহাম্মদ' ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আলে এমরানের ১৪৪ নং আয়াতে।

'মোহাম্মদ' শব্দটি 'হামদুন' থেকে নিষ্পন্ন। 'হামদুন' শব্দের অর্থ প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি, প্রতিদান, হক্ব আদায় করা (কামুস)। 'তাহমীদ' শব্দের অর্থ হলো সর্বদা প্রশংসা করা। অতএব, 'মোহাম্মদ' শব্দটির অর্থ হলো সর্বদা যাঁর প্রশংসা করা হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ 'মোহাম্মদ' সে ব্যক্তি যার অসংখ্য প্রশংসা সর্বদা করা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ 'মোহাম্মদ' সে ব্যক্তি যার মধ্যে যাবতীয় গুণাবলীর বিপুল সমাবেশ ঘটে। কেননা প্রশংসার যোগ্য সে ব্যক্তিই হন, যিনি সর্বগুনে গুণান্বিত।

হযরত হাসান এবনে সাবেত (রাঃ) বলেছেনঃ তোমরা কি জান না? যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাকে পবিত্র কোরআন দিয়ে প্রেরণ করেছেন আর তাঁকে সম্মানিত করার লক্ষ্যে তাঁকে এই পবিত্র নাম দান করেছেন।

অতএব, আরশের মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক হলেন 'মাহমুদ' আর তাঁর রসূল হলেন, 'মোহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ 'মোহাম্মদ' শব্দটির অর্থ হলো যাঁর প্রশংসা অধিক পরিমাণে করা হয় অথবা বার বার করা হয়। অথবা এর অর্থ হলো যিনি যাবতীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত।

ইমাম রাগেবের ভাষায়ঃ

يقال فلان محمد اذا كثرت خصالة المحموده

অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মোহাম্মদ একথা তখন বলা হয় যখন তাঁর মধ্যে প্রশংসনীয় গুণাবলী দেখতে পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে এই নামটির খুব একটা প্রচলন ছিল না। আল্লামা আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে হাবীব বোগদাদী (মৃত্যু-২২৫ হিঃ) লিখেছেনঃ আরব দেশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৭

ওয়াসাল্লামের পূর্বে ৭ জনের এ নাম রাখা হয়। তাদের মধ্যে একজন হলো মোহাম্মদ এবনে সুফিয়ান এবনে মাজাশেয়। এ ব্যক্তির পিতা সিরিয়ার একজন পাদ্রীর নিকট শ্রবণ করেছিল যে সর্বশেষ নবী হিসেবে যিনি আগমন করবেন তাঁর নাম হবে মোহাম্মদ। এজন্যে সে তাঁর পুত্রের এ নামকরণ করেছে।

তাজুল উরুস এবং লেসানুল আরব গ্রন্থে এই নাম সহ বাকী ৬ জনের নামের উল্লেখ রয়েছে।[১]

আল্লামা দরিয়াবাদী আরো লিখেছেন, মওলানা আবদুর রহমান নদভী পবিত্র নামের তাৎপর্য সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। তার কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব তাঁর নাম রাখেন মোহাম্মদ। একটি শুভ নাম হিসেবে এই আশায় যে পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা করা হবে, আবদুল মোত্তালেব তাঁর পৌত্রের এ নাম রাখেন। পরবর্তীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাবতীয় গুণাবলীর কেন্দ্র এবং সকল প্রশংসার যোগ্য এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে আকর্ষণীয় এবং শান্তিদূত রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ইঙ্গিত পেয়েই হয়তো আবদুল মোত্তালেব তাঁর পৌত্রের এ নাম রেখেছেন। অভিধান গ্রন্থ কামুসে 'হামদ' শব্দের অন্যতম অর্থ বর্ণিত হয়েছে কাযাউল হক্ব। অতএব, 'মোহাম্মদ' শব্দটির একটি অর্থ হবে যার হক্ব আদায় করে দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানব জাতিকে যতখানি উন্নতি অগ্রগতি প্রদান করার ইচ্ছা ছিল, আর স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির যে হক্ব ছিল তা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হয়েছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। গুণে-জ্ঞানে, এল্‌ম এবং আমলে, আকৃতি, প্রকৃতিতে, বিবেক-বুদ্ধিতে এবং চরিত্র মাধুর্যে মানুষ যতখানি উন্নতি করতে পারতো তার পরিপূর্ণ এবং উন্নততর, উচ্চতর রূপ বাস্তবায়িত হয়েছে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে, তাই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। সর্বকালে প্রশংসিত মানুষ, তাঁর ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি নিজেই তাঁর দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রশংসা সর্বত্র, তাঁর চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা-স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনিই মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী"।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৭

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মোযেজার মধ্যে তাঁর নাম মোবারকও অন্যতম মোযেজা। তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে এ নামের বরকতের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত, প্রশংসিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর মোবারক নাম উচ্চারিত হয় প্রতি দিন পাঁচ বার করে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে এবং তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়, নাম মোবারক আকাশ বাতাসকে সর্বদা মুখরিত করে রাখে। তাঁর প্রশংসা শুধু যে মুসলমানগণই করেন তাই নয়; বরং ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকল জাতির সকল দেশ ও পরিবেশের মানুষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাশ্চাত্যের বহু অমুসলিম লেখক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর প্রংশসা করে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসবই তাঁর পবিত্র নামের বরকত সমূহের বহিঃপ্রকাশ।

তাঁর পবিত্র নামেই রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণতার আভাস। সমস্ত নবী রসূলগণের যত মোযেজা, যত গুণাবলী প্রদান করা হয়েছে তা একা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যা কোন নবীকে দান করা হয় নাই এমন বহু মোযেজা, গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য একা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। তাঁর পবিত্র নামের পরিপূর্ণতার এ তাৎপর্যই একথা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট যে, তিনি শুধু একজন নবী নন; বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, এবং সর্বশেষ নবী ও নবীগণের দলপতি। এজন্যেই তাঁর পর আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই, আর কোন নবীর অস্তিত্বের সম্ভাবনাও নেই। পাশ্চাত্য জগতের যেসব বিখ্যাত চিন্তাবিদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবন এবং অনিন্দ্য-সুন্দর জীবনাদর্শ সম্পর্কে লেখা পড়া করেছেন তারা তাঁর গুণাবলী স্বীকার করে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তাঁর মহান আদর্শের ভিত্তি হলো ঈমানদারী এবং সততা ও সত্যবাদিতা। এমনকি তাঁর নবুওয়্যতের যুগেও শত্রুরা তাঁর একটি দৃষ্টির মোকাবেলা করতে পারেনি। আবদুল্লাহ এবনে সালাম বিখ্যাত ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি যেভাবে ইসলাম কবুল করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য।

আবদুল্লাহ এবনে সালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারা মুবারকের দিকে দেখা মাত্রই চিৎকার করে উঠে বলেছেনঃ

هذا ليس بوجه كذاب

এটি অবশ্যই কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকে যে আকর্ষণ রয়েছে এবং তাঁর চেহারা মোবারকে যে

আকর্ষণ ছিল তা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। 'মোহাম্মদ' শব্দটির আভিধাণিক ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁর প্রতিটি অংশই প্রশংসার যোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্যের সন্ধান এভাবে পাওয়া যায় যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, তাঁর প্রতিটি অনুমোদন, তাঁর প্রতিটি চিন্তা চর্চা চির প্রশংসিত, চির অভিনন্দিত। তাঁর দাওয়াতে দ্বীন, তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে প্রশিক্ষণ প্রদান, তাঁর সংস্কার, তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা, তাঁর যুদ্ধ পরিচালনা, তাঁর শান্তি চুক্তি সম্পাদনা, ব্যক্তিগত এবাদত-বন্দেগীর সাধনা, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর আরাধনা, মানুষের প্রতি তাঁর মায়া মমতা, কঠিন বিপদে তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাঁর সুবিচার প্রতিষ্ঠা, পরোপকার তথা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা এর কোনটি সর্বকালে প্রশংসিত হয়নি? মোটকথা, যেভাবে ইসলামী জীবন বিধান সর্বত্র প্রশংসিত, যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত, ঠিক তেমনি ইসলামের পয়গম্বর ইসলামের নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামও তাৎপর্যবহ, বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত, যার ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর প্রিয়নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এমন পবিত্র নাম দান করেছেন। আর পবিত্র সেই নবী যাঁকে আল্লাহ পাক যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন।

আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না

তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেহেতু পর্বতের দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়েরের নেতৃত্বাধীন ৫০ জন লোক মোতায়েন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধে জয় হোক কি পরাজয়, তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করবে না। এমনকি যদি তোমরা দেখ যে পাখীরা মুসলমানদের লাশ ভক্ষণ করছে তবু তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না। মনে রাখবে যতক্ষণ তোমরা এ স্থানে মোতায়েন থাকবে ততক্ষণ আমাদের পরাজয় হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য বীর মুজাহেদগণের বীরত্ব ও জেহাদী প্রেরণার মোকাবেলায় দুশমন বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। তারা পলায়ন করতে শুরু করলো। এমনকি পৌত্তলিকদের যেসব মেয়েরা তাদের সাহস বৃদ্ধির জন্যে রণাঙ্গনে এসেছিল তারাও প্রাণ বাঁচাবার তরে পলায়ন করতে লাগল। এমন অবস্থায় মুজাহেদগণ গণিমতের মাল তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ একত্রিত করতে লাগলেন। এ

দৃশ্য দেখে গিরি পথে মোতায়েন মুজাহেদগণ চিন্তা করলেন, আমাদের বিজয় চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। গনিমতের মাল সংগ্রহ করাই এখন শ্রেয়। তাদের দলপতি আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন এ নির্দেশতো যুদ্ধ জয়ের জন্যে ছিল, আর তা হয়েছে। তাই তারা রণাঙ্গনে চলে আসলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) মাত্র ১১ জন সঙ্গী নিয়ে তাঁর স্থানে অবিচল রইলেন, মুশরেকদের দলপতি খালেদ (তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি) এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে গিরি পথ দিয়ে পশ্চাত দিক থেকে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করলো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁর ১১ জন সঙ্গী নিয়ে ২৫০ জন আক্রমণ কারীর মোকাবেলা করলেন কিন্তু তা আর কতক্ষণ? তাঁরা শহীদ হলেন। এখন সামনে এবং পেছনে মুসলমানদের দুশমন, যুদ্ধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। এবনে কুমাইয়া নামক এক দূরাত্মা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো যার দ্বারা তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হলো। তাঁর চেহারা মোবারক রক্তাপ্লুত হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শয়তান গুজব রটিয়ে দিল যে, তিনি নিহত হয়েছেন। এ দুঃসংবাদ শ্রবণের কারণে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। হযরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় ব্যক্তিও মাটিতে বসে গেলেন। এই সুযোগে মুনাফেকরা বলতে লাগলোঃ যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে আর নেই তখন আর মুসলমান থাকার প্রয়োজন কি? পুরাতন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়। তার জবাবে হযরত আনাস এবনে নজর (রাঃ) বললেনঃ যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়েও থাকেন কিন্তু তাঁর আল্লাহ তো আছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর এ পৃথিবীতে তোমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন সে উদ্দেশ্যে তোমরাও প্রাণ বিলিয়ে দাও। একথা বলেই তিনি অনতিবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বীর বিক্রমে দুশমনের প্রতি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের জন্যে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করলেন। এই সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ডাক দিলেন বললেন ঃ

إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা আমার নিকট আস, আমি আল্লাহ্র রসূল। এরপর বিখ্যাত সাহাবী কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) উচ্চস্বরে মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বললেনঃ হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ আমাদের প্রিয় রসূল আমাদের মাঝে আছেন। এ

ঘোষণা শ্রবণ করা মাত্র মুসলমানগণ চর্তুদিক থেকে দ্রুত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে এসে দণ্ডায়মান হলেন এবং বীর বিক্রমে দুশমনের মোকাবেলা করতে লাগলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরা নব বলে বলীয়ান হলেন। মুসলমানদের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যুহ ভেদ করা দুশমনদের পক্ষে সম্ভব হলোনা, এমন অবস্থায় তারা রণাঙ্গন ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাযিল হলো আলোচ্য আয়াতঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রসূল পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অতএব তিনিও যদি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তবে তা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয় কেননা, কোন রসূল চিরদিন পৃথিবীতে থাকেননি। যদি তাঁর স্বাভাবিক এন্তেকাল হয় অথবা তিনি যদি শাহাদাত বরণ করেন তবে কি তোমরা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করবে? মনে রেখ, যারা সত্য ধর্ম ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে এবং ইসলামকে আল্লাহ্র নেয়ামত হিসেবে উপলব্ধি করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই পুরষ্কার দান করবেন।

এ আয়াতের তফসীর আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয়, এ দুঃসংবাদ শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক থেকে চাদর সরিয়ে চুম্বন করলেন এবং ক্রন্দন অবস্থায় বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ পাক আপনার জন্য দুটি মৃত্যু আনবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্যে লিপিবদ্ধ ছিল তা এসে গেছে। এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন হযরত ওমর (রাঃ) বক্তৃতারত রয়েছেন। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে বিশ্বাস করছিলেন না। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমরকে (রাঃ) নীরব হতে বললেন। এরপর উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবাদত করতো তার জানা উচিত যে, তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের এবাদত করতো তার আনন্দিত হওয়া উচিত যে আল্লাহ পাক চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। এরপর হযরত আবু বকর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩৭৮-৮১

(রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। উপস্থিত লোকেরা ক্ষণিকের জন্যে উপলব্ধি করলেন যেন আয়াত এই মাত্র অবতীর্ণ হয়েছে। তখন প্রত্যেকে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সহ সকলেই বিশ্বাস করলেন যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়েছে।[১]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

অর্থাৎ– মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না। অতএব, এ ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত বা নিরাশ হবার কিছুই নেই। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। আর মৃত্যুর সময় যদি আসে তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। জীবন এমন বস্তু যাকে কোন ভাবেই ধরে রাখা যায় না। আর মৃত্যু এমন বস্তু যাকে প্রতিরোধ করার তো প্রশ্নই ওঠে না এমনকি, ক্ষণিকের জন্যে বিলম্বও করা যায় না।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেনঃ যেহেতু মুনাফেকরা ওহোদের যুদ্ধে রটিয়ে ছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়েছে। তার জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কারো মৃত্যু হয়না।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ মর্মে যে, মৃত্যু ভয়ে তোমরা জেহাদ পরিত্যাগ করোনা। কেননা মৃত্যুর নির্ধারিত সময় না আসলে কারো মৃত্যু হয় না। অতএব, জেহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভয়ের কোন কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ এখানে একথাও উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে হেফাজত করেছেন, কেননা দুশমনরা তাঁকে হত্যা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাক তাঁকে হেফাজত করেছেন, আল্লাহ্ পাক হলেন তাঁর সাহায্যকারী, তাই তারা তাঁর ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক যাকে রাখেন, কেউ তাকে মারতে পারেনা।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণার তাৎপর্য হলো, যেহেতু মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে ওহোদের যুদ্ধের পর বলতো, যদি এই মুসলমানগণ আমাদের সঙ্গে থাকতো, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো তবে মৃত্যু বরণ করতে হতো না।

তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, কোন মৃত্যুই আল্লাহর হুকুম ব্যতীত হয় না। অতএব, তোমাদের এসব উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অহেতুক।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা ৪, পৃষ্ঠা-৩০

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক بِاِذْنِ اللّٰهِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (অর্থাৎ) "আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না"। এভাবে "ইজন" বা অনুমতির তাৎপর্য কি? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না, কিন্তু তার অবস্থা বা ব্যবস্থা কি হয়?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ (১) এই "ইজন" বা অনুমতির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের আদেশ অর্থাৎ আল্লাহ পাক মালাকুল মওত আজরাঈল (আঃ)-কে রুহ কবজ করার আদেশ প্রদান করেন। এ আদেশ ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না। আর কারো জন্যে এ আদেশ হলে, সে কোন অবস্থাতেই জীবিত থাকেনা, থাকতে পারে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

"আল্লাহ পাকের ব্যাপারে এমনই হয়, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, "হও" আর তা হয়ে যায়"।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে "ইজন" বা অনুমতির তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের মর্জি, ইচ্ছা, তাঁর সিদ্ধান্ত কেননা, জীবন ও মৃত্যু, অস্তিত্ব ও লয়ের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর কারো নয়।

আলোচ্য আয়াতের "ইজন" শব্দটির তাৎপর্য হলো 'এল্‌ম', এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের এলমে যার মৃত্যুর সময় যা নিদৃষ্ট রয়েছে সে সময় না হওয়া পর্যন্ত কারো মৃত্যু হয়না। আর যখন সে মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন অবশ্যই সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসে তখন তা ক্ষণিকের জন্যেও বিলম্ব হয়না এবং সময়ের পূর্বেও আসে না"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, "ইজন" শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের মর্জি, ইচ্ছা, তাঁর সিদ্ধান্ত। অতএব আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাকের মর্জি এবং সিদ্ধান্ত ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না। প্রত্যেকের তকদীর আল্লাহ পাকই নির্দিষ্ট করেছেন, আর তাতে জীবন ও মৃত্যুর সময় নির্ধারিত আছে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত তকদীর অনুসারে এবং তাঁর মর্জি মোতাবেকই মানুষের মৃত্যু হয়, এতদ্ব্যতীত হয় না।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ- যারা দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিদান চায় আমি তাদেরকে স্বীয় মর্জি মোতাবেক যা তাদের জন্যে নিদৃষ্ট করে রেখেছি তা তাদেরকে দান করি, আর যারা স্বীয় আমলের বিনিময়ে আখেরাতের সাফল্য কামনা করে আমি তাদেরকে আখেরাতে সওয়াব দান করবো। এ আয়াতে কটাক্ষ করা হয়েছে তাদের প্রতি, যারা ওহোদের যুদ্ধে গনিমত প্রত্যাশী হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করেছিলেন। আর যারা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও অবিচলিত অজেয় রয়েছেন তাদের সম্পর্কে খোশখবরী রয়েছে এভাবে-

وَسَنَجۡزِى الشّٰكِرِيۡنَ

যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে চরম বিপদেও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে তারা আখেরাতে প্রতিদান লাভ করবে এবং দুনিয়াতেও তারা এর শুভ পরিণতি ভোগ করবে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যারা নিজের আমলের এ সুযোগকে আল্লাহ্‌র নেয়ামত মনে করে তার কদর করে এবং দৃঢ় সংকল্প থাকে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কিছুই চায় না, বরং জেহাদের সুযোগকেই দুর্লভ নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এত মহান পুরস্কারে সম্মানিত করবেন যা মানুষের জন্যে কল্পনাতীত। এজন্যেই আয়াতে বিনিময় দান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তবে কি বিনিময় দান করবেন তা নির্দিষ্ট করেননি। এর তাৎপর্য হলো এই যে, এমন বিনিময় দান করবেন যা হবে মানুষের চিন্তার উর্ধ্বে। তাই প্রতিদান নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যার নিয়ত হলো আখেরাতের সাফল্য, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেননি। দুনিয়া তার নিকট বিনীত হয়ে হাযির হয়। আর যার উদ্দেশ্য বা নিয়তই হলো এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লাভ এবং লোভ আল্লাহ পাক তাকে তার পর মুখাপেক্ষীতা দেখিয়ে দেন, তার মনের শান্তি দূরীভূত হয়, আর দুনিয়ার সম্পদ সে এতখানিই লাভ করে, যতখানি আল্লাহ্ পাক তার জন্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমলের মাহাত্ম, গুরুত্ব এবং প্রতিদান যে আমল করে তার নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। অতএব, যে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের জন্যে হিযরত করবে তা আল্লাহ পাক এবং রসূলের জন্যই হবে। পক্ষান্তরে,

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩

যে অর্থ সম্পদ লাভের আশায় অথবা কোন নারীর পাণি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় হিযরত করবে তার হিযরত সে উদ্দেশ্যের জন্যেই হবে।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন একজন শহীদকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেন প্রাণ দিয়েছ? সে বলবে, আপনার রাহে প্রাণ দিয়েছি। আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ না, তুমি এজন্যে প্রাণ দিয়েছ যেন তোমাকে বীর বলা হয় আর তা বলা হয়েছে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

ওহোদের যুদ্ধে যে সমস্ত মুসলমান দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ওহোদের রণাঙ্গণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কোন নতুন ঘটনা নয়; বরং ইতিপূর্বে বহু নবী রসূলকে এবং উম্মতদেরকে এমন বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। এমনকি এর চেয়ে কঠিনতর এবং ভয়াবহ বিপদের মোকাবেলা তারা করেছে কিন্তু তারা ভেঙ্গে পড়েনি, সাহস-হারা হয়নি, এর চেয়ে জটিল পরিস্থিতিতেও তারা দুর্বল হয়নি। শত্রুর মোকাবেলায় মাথা নত করেনি। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি।

হে মুসলমানগণ! তোমরা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। তোমাদের আরো অধিক দৃঢ়তা অর্জন করা কর্তব্য। যারা দুশমনের মোকাবেলায় চরম কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বন করে, ধৈর্যের পরিচয় দেয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সম্মানিত করেন।

যারা ওহোদের যুদ্ধের চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সন্ধি করার চিন্তা করেছিল তাদের প্রতি এ আয়াতে কটাক্ষ করা হয়েছে এবং জেহাদে কাফেরদের মোকাবেলায় আরো দৃঢ়তা অর্জনের এবং অবিচলিত ও অজেয় থাকার তাগিদ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে رِبِّيُّونَ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো অনেক দল। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ বলেছেন, এর অর্থ হলো হাজার হাজার। কালবী বলেছেন, এতে ১০ হাজার লোক পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো অনুসারীগণ।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮২-৮৩

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَ
ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾
فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

তরজমা

(১৪৭) আর একথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিলনা যে, তারা বলতো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহ সমূহ এবং আমাদের কার্যে সীমা লংঘন তুমি ক্ষমা কর, আর আমাদেরকে অবিচলিত ও সুদৃঢ় রাখ, আর কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী কর।

(১৪৮) ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের পুরস্কার দান করেন এবং আল্লাহ পাক নেককারদেরকে ভালবাসেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে যে সব আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তি জেহাদে অংশ গ্রহণ করতেন তাদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা জেহাদের কঠিন মুহূর্তে অবিচল এবং অজেয় থাকতেন, ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিতেন। কোন অবস্থাতেই দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না।

আর আলোচ্য আয়াতে পূর্বকালের আল্লাহ ওয়ালা লোকেরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেন, তার একটি নমুনা বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে যে মুনাজাত পেশ করতেন তা হলো এই যে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিগত জীবনে আমাদের যত গুনাহ হয়েছে তা মাফ করুন। বর্তমানে জেহাদের সময় আমাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থী তা-ও মাফ করুন। আমাদেরকে সংকল্পের দৃঢ়তা দান করুন। আমরা যেন দুশমনের মোকাবেলায় অবিচলিত অজেয় থাকতে পারি তার তওফিক দান করুন। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন, আমাদেরকে বিজয় দান করুন।

এ দোয়ার বিবরণের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মোমেন মাত্রকে নিজেদের ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে, কোন সৎ কাজ করার সুযোগ হলে তাকে আল্লাহ্ পাকের তৌফিক মনে করতে হবে, সে সৎ কাজের জন্যে কোন অবস্থাতেই অহংকার করবে না কেননা, কোন সৎ কাজই আল্লাহ্ পাকের তৌফিক ব্যতীত সম্ভব হয়না। অতএব, সৎ কাজ করা সম্ভব হলে তজ্জন্যে গর্ব-গৌরব নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে

যেন এ উপলব্ধি সর্বদা অন্তরে জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ পাক দয়া করে তৌফিক দিয়েছেন বলেই এই সৎ কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। আর আল্লাহ পাক কত দয়াবান ও মেহেরবান যে, তিনি প্রথমে সৎ কাজের তৌফিক দান করেন, এরপর সেই সৎ কাজের জন্যে সওয়াবও দান করেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ যত সৎ কাজই করুক না কেন, আর যত সুন্দরতর করেই করুক না কেন, আল্লাহ পাকের মহান শানের, তাঁর মহান দরবারের উপযুক্ত করে কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। তাই দায়িত্ব পালনে মানুষের ত্রুটি হবে একথা চির নিশ্চিত। এজন্যে সৎ কাজ করে, এমনকি জেহাদে অংশ গ্রহণ করেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কোরআন বিশ্ব মুসলিমের সম্মুখে এ শিক্ষাই তুলে ধরেছে। সূরা ফোরকানে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

"আর যারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের দরবারে সেজদা রত অবস্থায় এবং দন্ডায়মান অবস্থায়"।

যারা এ অবস্থায় সারা রাত আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের দরবারে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মিনতি জানায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

"এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে দোযখের শাস্তি দূরে রাখ, দোজখের শাস্তিতো নিশ্চিত ধ্বংস"। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, জেহাদের ন্যায় সৎ কাজ করা সত্ত্বেও যেন মানুষ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হয়।

এতদ্ব্যতীত একথাটিও চিন্তার বিষয় যে, বর্তমানে আল্লাহ্ পাক সৎ কাজের তৌফিক দান করেছেন এজন্যে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু ভবিষ্যতে যে তৌফিক পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এজন্যে মুসলমান মাত্রকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রতিদিন দোয়া প্রার্থী হতে হয় যেন আল্লাহ্ পাক সর্বদা তাঁর বন্দেগীতে মশগুল থাকার তৌফিক দান করেন। আলোচ্য আয়াতে আরেকটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষ যত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে অথবা দুশমনের নিকট পরাজিত হয় তার অন্যতম কারণ হলো মানুষের পাপাচার। এজন্যেই সর্বপ্রথম আলোচ্য আয়াতে অতীত পাপাচারে থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার তালীম দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا

অর্থাৎ- তারা বলেছেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদের গুনাহ সমূহ! 'জানব' অর্থ গুনাহ তার বহু বচন হলো 'জুনুব' অর্থাৎ সকল গুনাহ।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ শব্দটির মধ্যে সগীরা কবীরা সর্বপ্রকার গুনাহ শামিল হয়েছে। এরপর বিশেষভাবে কবীরা গুনাহর জন্যে আরেকটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছেঃ

وَاِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنَا

অর্থাৎ- আর যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাদের কাজে।

'এসরাফ' শব্দটির অর্থ হলো 'এফরাত' অর্থাৎ কোন কাজে বাড়াবাড়ি করা।[১] যেমন এ শব্দটি আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এভাবে ব্যবহার করেছেনঃ

یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ

"হে আমাদের সেই বন্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ বা জুলুম করেছ"। এমনিভাবে এ শব্দটি অন্য আয়াতে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

অর্থাৎ- তোমরা পানাহার কর তবে বাড়াবাড়ি করোনা তথা সীমালংঘন করোনা এবং সম্পদের অপচয় করোনা।

কখনো কখনো সৎ কাজ করার সময়ও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, যা আল্লাহ্র নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এমন কাজ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার তা'লীম দেয়া হয়েছে।

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান কর। এ কথাটির কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাক মোমেদেরকে সাহায্য করার এবং বিজয় দানের অঙ্গীকার করেছেন।

কোরআনে করীমের ভাষায়–

حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ

"মোমেনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব"।

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

"নিশ্চয় আমাদের সৈন্যরা হবে বিজয়ী"।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ পৃথিবীতে মোমেনদের যে দুঃখ কষ্ট এবং মসিবত আসে তা তাদের গুনাহ্র কারণে এবং আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে। যেমন এরশাদ হয়েছে–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই আসে তোমাদের মসিবত, আর তোমাদের অনেককে আল্লাহ্ পাক মাফ করে দেন। অতএব, বিপদাপদ বা বালা মসিবতের সময় মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হলো নিজ নিজ গুনাহ্র জন্যে লজ্জিত, অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। এরপর আল্লাহ্ পাকের সাহায্য এবং রহমতের জন্যে মোনাজাত করা। কেননা তওবা এস্তেগফারের কারণে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ

যারা এভাবে দোয়া করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে পুরষ্কার দান করেন। দুনিয়ার পুরষ্কার হলো সাহায্য, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ, দুশমনের পরাজয়, প্রশংসা, অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত হওয়া এবং সন্দেহের অন্ধকার দূর হওয়া, গুনাহ্র কাফ্ফারা হওয়া। আর আখেরাতের সওয়াব হলো জান্নাত।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ দুনিয়ার পুরষ্কার হলো আল্লাহ্ পাকের সাহায্য এবং যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ। আর ইমাম কাতাদা বলেছেনঃ দুনিয়ার পুরস্কার হলো বিজয় এবং ক্ষমতা লাভ, আর আখেরাতের পুরষ্কার হলো আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি এবং রহমত লাভ করা। আর ইমাম কাতাদা আখেরাতের পুরষ্কার সম্পর্কে বলেছেন, তা হলো জান্নাত।[১]

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"আর আল্লাহ্ পাক নেককারদেরকে ভালবাসেন"।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এহ্সান শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ– الحديث

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯-পৃষ্ঠা-২৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬

অর্থাৎ-"তুমি এভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পার তবে একথা পূর্ণ বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন"। অতএব, এহসানের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাককে হাযির নাযির জেনে তাঁর বন্দেগী করা। তিনি আমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড লক্ষ্য করছেন এবং আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সৎ হলে পুরষ্কার আর মন্দ হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে- একথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করা। যারা পূর্ণ একীন এবং বিশ্বাস নিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করে তারাই নেককার, আর এমন নেককারদেরকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন, ভালবাসেন।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ যেহেতু তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছে-

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا- الاية

(হে পরওয়ারদেগার! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর।) তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এহসানের গুণে গুণান্বিত বা নেককার বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভালবাসেন বলেও ঘোষণা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার এবং তাঁর নৈকট্য লাভের একটি মাত্র পথই রয়েছে আর তা হলো নিজের অপরাধ স্বীকার করা, কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া এবং বিনয় ও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্ ওয়ালাগণ যখন জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করেছেন তখন আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মোহসিন বা নেককার বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন নেক কাজ আল্লাহ্ পাকের তৌফিক ব্যতীত সম্ভব নয়। মূলতঃ আল্লাহ্ পাকই নেক কাজের তৌফিক দান করেন আর সেই নেক কাজের জন্যে সওয়াবও তিনিই দান করেন।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে-

(১) যারা আল্লাহ্ ওয়ালা তারা পয়গম্বরগণের সঙ্গী হয়ে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণ করেন- এটি আল্লাহ্ ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য।

(২) সত্যিকার মুসলমান গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয় না, নিক্ষিপ্ত থাকে না, সর্বদা সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, ইসলামের জন্যে সজাগ, সতর্ক, সক্রিয় এবং জেহাদে রত থাকে। এ পর্যায়ে কোন প্রকার বিপদ বা কষ্টকে বড় মনে করেনা,

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯

আর কোন বাধাই তারা মানে না; বরং জেহাদের চরম এবং কঠিন মুহূর্তেও ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। আত্মত্যাগে পিছপা হয় না।

(৩) প্রকৃত মুসলমান সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করতে থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করতে থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের নিকটই দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্যে ফরিয়াদ করতে থাকে।

(৪) অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দান করেন বিজয় এবং আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং সবার উপরে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি।[১]

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ
تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾
سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَ
بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

তরজমা

(১৪৯) হে মোমেনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

(১৫০) বরং আল্লাহ পাকই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনিই উত্তম সহায়ক।

(১৫১) অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শেরক করেছে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন দলিল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং তাদের স্থান জাহান্নাম, আর তা জালেমদের জন্যে অত্যন্ত মন্দ স্থান।

তফসীরুল কোরআন

কাফেরদের অনুসরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর

ওহোদের যুদ্ধে যখন ইসলামের দুশমনরা গুজব রটিয়ে দেয় যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে, তখন মুনাফেকরা কিছু দুর্বল মুসলমানদের এ পরামর্শ দেয় যে তোমরা তোমাদের প্রাক-ইসলামী ধর্মে ফিরে যাও। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৭০

এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের ফাঁদে পড় তথা তাদের পরামর্শ গ্রহণ কর এবং তাদের অনুসরণ কর, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলামের পূর্বে যেভাবে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলে ঠিক তেমনি গোমরাহীর আঁধার গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। যারা এভাবে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলো তারা কাফেরদের কোন্ দল এ বিষয়ে তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কোন্ দলের কথা বলা হয়েছে?

হযরত আলীর (রাঃ) মতে তারা হলো মুনাফেক, আর তাদের অনুকরণের তাৎপর্য হলো মুনাফেকদের এ পরামর্শ গ্রহণ করা যে যা হবার হয়ে গেছে এখন আর নির্বুদ্ধিতার কোন সুযোগ নেই, নিজেকে আর কোন ভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না,তোমাদের সাবেক ধর্মে তোমরা ফিরে যাও। যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী হতেন তবে এমন ঘটনা ঘটতো না (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালেক)।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কাফের অর্থে আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদেরকে বলা হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে, 'হে মোমেনগণ! যদি তোমরা এ কাফেরদের কথা মেনে চল তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "কাফের" বলতে আবু সুফিয়ানকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, তখন আবু সুফিয়ানই ছিল কাফেরদের নেতা, সে-ই ছিল তখন সকল ষড়যন্ত্রের নেতা। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কাফের হলো আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার সঙ্গী মুনাফেক দল। কেননা তখন তারাই আহত-চিত্ত মুসলমানদেরকে নানা প্রকার প্রলোভন দিয়ে বিভ্রান্ত করার হীন চেষ্টা করেছিল। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতে কাফের বলা হয়েছে ইহুদীদেরকে। কেননা, ইহুদীরা মদীনা শরীফ এবং তার উপকণ্ঠে বাস করতো এবং মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "কাফের" বলতে সর্বপ্রকার কাফেরকেই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের পরামর্শ মোতাবেক ইসলাম পরিত্যাগ কর অথবা তারা যেমন গোমরাহীর কথা বলে তা গ্রহণ কর তবে তারা ঈমান আনয়নের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩

পর তোমাদেরকে কুফরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আর এ অবস্থায় তোমরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মোমেনগণকে কাফের এবং মুনাফেকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন, যদি তোমরা তাদের কথা মান তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমরা অপমানিত হবে। তাদের আকাঙ্ক্ষাই হলো এই যে, তারা দ্বীন ইসলামের নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করে।

আল্লাহ্ পাকই তোমাদের অভিভাবক

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ

অর্থাৎ- তোমরা কাফেরদের অনুকরণ এজন্যে করবে যে, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে, এটি হবে সবচেয়ে বড় মূর্খতা কেননা, তারা হলো চরম অসহায় এবং বিভ্রান্ত; বরং মনে রেখ আল্লাহ পাকই তোমাদের অভিভাবক। তিনিই তোমাদেরকে দুশমনের মোকাবেলায় সাহায্য করবেন এবং দুশমনের ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করে দেবেন। আল্লাহ পাকই উত্তম সাহায্যকারী, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তোমাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাত। সকলের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, আল্লাহ্ পাক মহান দাতা, তাঁর নিকট কোন কার্পণ্য নেই।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাঁর বন্দাকে সাহায্য করেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে চাওয়ার আগেই তাঁর বন্দাকে দান করেন। কেননা তিনি প্রত্যেক বন্দার প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারেই সাহায্য প্রার্থী হও, তাঁর প্রতিই ভরসা রাখ, আর তাঁর নিকটই সাহায্য কামনা কর।

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ- الاية

বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের পর ১৬ই শাওয়াল তারিখে যখন আবু সুফিয়ান মক্কা প্রত্যাবর্তন করেছিল তখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বললোঃ আমরা মুসলমানদেরকে এভাবে রেখে এসে ভাল কাজ করিনি, বরং এ সুযোগে তাদের মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। চল আবার ফিরে যাই এবং তাদের সঙ্গে পুনরায় মোকাবেলা করি। এই ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের অন্তরে এক প্রকার ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা পুনরায় আক্রমণের ইচ্ছা বাতিল করে দেয়। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! ওহোদের রণাঙ্গণে তোমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা ছিল

তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এখন তোমরা রণক্লান্ত, আহত হওয়া সত্ত্বেও দুশমন তোমাদের প্রতি পুনরায় আক্রমণ করতে সাহস করবে না। কেননা, আমি তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দেব। বস্তুতঃ তাই হয়েছিল। কাফেররা পুনরায় আক্রমণের সাহস আর করেনি, আর মুসলমানগণ হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করেন।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষ দান

এ আয়াতে তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত যবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে পাঁচটি এমন জিনিস দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি।

(১) দুশমনকে ভীত সন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

(২) আমার জন্যে যমিনকে নামাযের স্থান এবং মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে যেখানেই নামাযের সময় আসুক সেখানেই পবিত্র স্থানে নামায আদায়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) আমার জন্যে গণিমতের মাল বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে।

(৪) আমাকে কেয়ামতের দিন শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(৫) প্রত্যেক নবী তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু আমাকে সর্বকালের সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।[২]

ইতিহাসের বিরল ঘটনা

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন দুশমনকে ভীত সন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে, তাঁর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ওহোদের যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি ঘটনা বিরল। তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত এ যুদ্ধে অবশেষে যখন কাফেররা বিজয় লাভ করলো তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, কাফেররা প্রাণের মদীনায় প্রবেশ করবে কেননা, ওহোদের রণাঙ্গণ থেকে মদীনা শরীফের দূরত্ব মাত্র ৪ মাইল কিন্তু কাফেররা এ দুঃসাহস করেনি। রণাঙ্গণ থেকে তারা মক্কায়

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৫-৮৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা- ৪, পৃষ্ঠা-৩২

রওয়ানা হয়ে যায়। অথচ, আহত রক্তাপ্লুত এবং রণক্লান্ত মুসলমানগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মদীনা শরীফ থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ পর্যন্ত দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেন। শুধু তাই নয়; বরং তিন দিন পর্যন্ত সেখানে মুসলমানগণ ক্যাম্প করেন এবং দুশমনের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। এবনে হেশামের ভাষায়–

قال ابن اسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الى حمراء الاسد وهى من المدينة ثمانية اميال

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং সোম, মঙ্গল এবং বুধ- এই তিন দিন সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি এ কর্মসূচী এজন্যে নিয়েছেন যেন দুশমনরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে, মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করেননি এজন্যেই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছে।[১]

আর কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে শেরক করেছে। আর তাদের জন্যে দোযখের শাস্তি অবধারিত।

বর্ণিত আছে, ওহোদের যুদ্ধ শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ) বা হযরত আলীকে (রাঃ) বললেনঃ তোমরা দুশমনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর, যদি তারা উষ্ট্রের উপর আরোহন করে তবে বুঝতে হবে তারা মক্কা প্রত্যার্বতন করছে। আর যদি তারা অশ্বে আরোহন করে তবে উপলব্ধি করবে যে, তারা মদীনা শহরে প্রবেশ করে লুটতরাজ করার কর্মসূচী নিয়েছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা এত দ্রুত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল যেন তারা পলায়ন করছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন, তুমি আমার এই হুকুম সকলকে জানিয়ে দাও যে, সকলে যেন দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে তৈরী হয়ে যায়। তবে গতকালের লড়াইয়ে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তারা যেন এতে শরীক না হয়। সাহাবায়ে কেরাম এ আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুশমনের পিছু ধাওয়া করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন, অথচ তারা ছিলেন আহত এবং রণ-ক্লান্ত কিন্তু তাঁরা ইসলামের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ ত্যাগের মনোভাব দেখে খুশি হয়ে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! বনী সালমার প্রতি দয়া কর, কেননা এ গোত্রের অধিকাংশ লোক আহত

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯

ছিলেন। হযরত রাফে (রাঃ)-এর অবস্থ এত গুরুতর ছিল যে, তাঁর ভাই তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, হযরত আলী (রাঃ) পতাকা বহন করছিলেন এবং দুশমনের পশ্চদ্ধাবনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কাফেররা 'রহা' নামহ স্থানে আলোচনা করলো যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা যে কিছুই করতে পারলাম না! মুসলমানদের একজনকেও বন্দী করতে পারলাম না। কোন ধন-সম্পদও হস্তগত হলোনা। খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় খবর পায় যে, মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো। এভাবে পবিত্র কোরআনের বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল।[১]

বস্তুতঃ পৌত্তলিকতা এবং কাপুরুষতা সম্পূর্ণ অবিচ্ছদ্য, আর তৌহিদ বা একত্ববাদ শক্তির উৎস। মক্কায় পৌত্তলিকদের পলায়নের মাধ্যমে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। আর আহত ক্ষত বিক্ষত মুসলমানগণ যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে তাতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য লাভে যারা ধন্য হয় তারা চির অপরাজেয় থাকে। আজকের দিনেও মুসলিম জাতি যদি এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং একীন নিয়ে একতাবদ্ধ এবং একটি সুসংহত, সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তবে এ বিশ্ব এক নব রূপ ধারণ করবে। ইসলামের মহিমা দেখে বিশ্ববাসী বিস্ময়াভিভূত হবে এবং যেভাবে পূর্বকালের মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন আজকের মুসলমানরাও ইনশাআল্লাহ্ সরাসরি আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। তবে এর জন্য পূর্বশর্ত হলো খাঁটি ঈমান, নেক আমল এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য।

পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"এবং তোমরা সাহস-হারা হয়োনা আর চিন্তিতও হয়োনা। তোমরাই হবে অবশেষে জয়ী, যদি প্রকৃত মোমেন ও খাঁটি মুসলমান হও"।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৭

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ
اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ
فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۭ وَ
اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا
تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

তরজমা

(১৫২) এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন। যখন তাঁর হুকুমে তোমরা কাফেরদেরকে বিনাশ করেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই সাহস-হারা হয়ে পড়লে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতবিরোধ করলে, যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কাম্য এবং প্রিয় বস্তু দেখিয়েছিলেন তখন তোমরা নাফরমানী করেছিলে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক দুনিয়ার লাভ চায় আর কিছু লোক আখেরাতের সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হয় তাদের থেকে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, আর আল্লাহ্ পাক মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

(১৫৩) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা উর্ধ্ব মুখে ছুটছিলে, পেছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করেছিলেনা, আর আল্লাহ্র রসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে কষ্টের পর কষ্ট দিলেন যাতে যা হস্তচ্যুত হয়েছে অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্যে তোমরা দুঃখ বোধ না কর। এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

(১) ওহোদের যুদ্ধের পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারা প্রত্যাবর্তন করলেন, ওহোদ রণাঙ্গণে মুসলমানগণ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন তার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হতে

থাকে যে, আল্লাহ পাক তো আমাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছিলেন তাহলে এমন বিপদ কেন হলো? তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন।

(২) কোন কোন তফসীরকারের মতে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি একটি দুম্বা জবেহ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর এ স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছিলেন এভাবে যে, ওহোদের যুদ্ধে মুশরেকদের পতাকাবাহী ছিল তালহা এবনে ওসমান। সে এই ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

(আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন) অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন।

(৩) যেহেতু আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা সবরের নীতি গ্রহণ কর এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাক সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার জন্য দুটি শর্ত ছিল (১) সবর এবং (২) পরহেযগারী। কিন্তু যারা গিরি পথে প্রহরায় মোতায়েন ছিল তারা ঐ স্থান ছেড়ে দেয়ার কারণে এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আহরণে চলে যাওয়ায় শর্তের রবখেলাফ কাজ হয়েছে।

(৪) হয়তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছিল তার শর্ত ছিল আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৎপর হওয়া। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

"আর আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যারা সাহায্য করবে তাঁর দ্বীনকে"। অতএব, আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্যে এটি ছিল একটি পূর্বশর্ত।

(৫) অথবা আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের যে প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখিত হয়েছে তাহলো এ আয়াতে–

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

অর্থাৎ "আমি কাফেরদের অন্তরে ভয় ভীতি সৃষ্টি করে দেব," আর এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন।

(৬) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিরি পথে মোতায়েন সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এ স্থানে কর্তব্যরত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জয়ী থাকবো। বাস্তবে তাই হয়েছিল। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন, মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রথম দিকে জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু যখন গিরি পথে মোতায়েন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করলেন তখনই মুসলমানদের জয় পরাজয়ে পরিণত হলো।[১]

إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মুসলমানদেরগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যুদ্ধের সূচনায় বাস্তবে পরিণত হয়। মুসলমানগণ কাফেরদের কচু কাটা করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ৯ জন পতকাধারী ধরাশায়ী হয় এবং তারা পলায়ন পর হয়। মুসলিম জাতির কাঙ্ক্ষিত বিজয় তখন সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়ে উঠে, কিন্তু গিরি পথে মোতায়েন সাহাবাগণের ভুলের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে এবং যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়। যখন তোমরা সাহস-হারা হয়ে পড়লে এবং পরস্পর মতবিরোধ করলে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করলে তখন তোমরা দুর্বল হয়ে পড়লে, যার পরিণতি এই যে, তোমাদের প্রিয় এবং কাঙ্ক্ষিত বিজয় পরাজয়ে পরিণত হলো।

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا

মূলতঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভের প্রয়াসী রয়েছে। আর কিছু লোক আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য অন্বেষণকারীও রয়েছে। কেননা, ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কারণ হলো গনিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের প্রতি লোভ, আর এ কারণেই কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করেছেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমাদের মাঝেও যে কিছু দুনিয়া পিয়াসী লোক রয়েছে তা ইতিপূর্বে জানতাম না।

ثُمَّ صَرَفَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের পরস্পরের অনৈক্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার কারণেই ওহোদ রণাঙ্গণে বিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধের পট পরিবর্তন না হয়। একটু আগে যে পৌত্তলিকরা মুসলমানদের আক্রমণ সইতে না পেরে পলায়নে তৎপর হয়েছিল তারাই পুনরায় আক্রমণে তৎপর হলো এবং তোমরা পলায়নের চেষ্টা করতে লাগলে। অবশ্য এ বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৯

এই, আল্লাহ পাক তোমাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, তোমাদের মধ্যে কে খাঁটি এবং প্রকৃত মোমেন, আর কে কৃত্রিম।

কয়েক জনের অন্যায়ের জন্য সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হয়

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ যদিও অত্যন্ত সামান্য সংখ্যক লোকই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করেছিলেন কিন্তু তার শোচনীয় পরিণাম সকলকে ভোগ করতে হয়েছে। কেননা কখনো কখনো কয়েকজনের অন্যায়ের জন্যেই সকলকে পরিণতি ভোগ করতে হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

"আর তোমরা ভয় কর সে শাস্তিকে যা তোমাদের কয়েক জনের অন্যায়ের কারণে আসবে"। তবে এমন বিপদ যখন আসে তখন তার দুটি দিক থাকে–

(১) যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্যে তা শাস্তি স্বরূপ আসে।

(২) যারা আল্লাহর অনুগত এবং তাবেদার হয় তাদের জন্য ঐ বিপদ অধিক সওয়াব লাভ এবং পরকালীন জীবনের উন্নতির কারণ হয়।

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ

অর্থাৎ যদিও তোমাদের কয়েকজনের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সমগ্র মুসলিম সমাজ এত বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তবু আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, এ ঘটনার কারণে যেন একে অন্যের প্রতি দোষারোপ না করে পরস্পর পরস্পরকে মন্দ না বলে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করার কারণেই কাফেররা মুসলমানদের প্রতি অতর্কিত আক্রমণ করার সুযোগ পায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তোমরা যখন কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়েছ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, শুধু যে ক্ষমা করেছেন তাই নয়, বরং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারা ক্ষণিকের জন্যে জয়ী হয়েও জয়কে ধরে রাখতে পারেনি, বরং প্রত্যাবর্তনে তারা বাধ্য হয় এবং মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কেননা, আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বেশী মেহেরবান। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে–

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

"মোমেনদের প্রতি আল্লাহ পাক অত্যন্ত মেহেরবান, তাঁর যখন ইচ্ছা হয় তখন তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন"।

অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত বেশী দয়াবান। এজন্যে গুনাহর পরও আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন। আর যদি মুসলমানদের প্রতি কোন বিপদ আপতিত হয় তা-ও আল্লাহ পাকের দয়ার কারণেই হয়। কেননা ঐ বিপদের কারণে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি কি বলবো তোমাদেরকে সে আয়াতের কথা যা পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, যে আয়াত সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, আয়াত খানি হলো এই–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

"আর যে মসিবতই তোমাদের উপর আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ।"

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

হে আলী! আমি তোমাদের নিকট এ আয়াতের তফসীর বর্ণনা করি। যদি তোমাদের প্রতি কোন রোগ বা কোন বিপদ আসে তবে মনে করবে যে, তা তোমাদের কৃতকর্মের জন্যেই আসে। তবে এমন লোকদেরকে আখেরাতে শাস্তি দেয়া করুণাময় আল্লাহ পাকের শানের খেলাফ। আর যদি দুনিয়াতে আল্লাহ পাক শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেন তবে আখেরাতে শাস্তি হবে কি-না তা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

সেই কঠিন মুহূর্ত

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ

সে সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা দুশমনের অতর্কিত আক্রমণের কারণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে উর্ধ্বমুখে ছুটছিলে, এমনকি পেছনে ফিরে তাকাবার মত অবস্থাও তোমাদের ছিল না। অথচ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে একথা বলে তোমাদের ডাকছিলেনঃ 'হে আল্লাহর বন্দাগণ! আমার নিকট আস'। অতঃপর কা'ব যখন উচ্চস্বরে ডাক দিলেন তখন তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে উপস্থিত হলে। আলোচ্য আয়াতে ওহোদের যুদ্ধের সেই কঠিন মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মসনদে আহমদে একখানি সুদীর্ঘ হাদীস সংকলিত হয়েছে তাতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। দুশমনরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি

চর্তুমুখী হামলা করতে থাকে, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "কেউ আছে কি যে এদের মোকাবেলা করবে"?

একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত তালহা (রাঃ) হামলাকারী কাফেরদের মোকাবেলায় প্রস্তুত হলেন কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি এখন অপেক্ষা কর। তখন একজন আনসারী সাহাবী দুশমনের মোকাবেলা শুরু করলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ১১ জন সঙ্গী একের পর এক দুশমনের মোকাবেলা করে শহীদ হলেন। অবশেষ হযরত তালহা (রাঃ) দুশমনের মোকাবেলায় আসলেন এবং বীর বীক্রমে লড়াই করলেন। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত কায়েস এবনে হাজেম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি দেখেছি হযরত তালহা (রাঃ) যে হাতকে তিনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ওহোদের দিন তাঁর নিকট রক্ষিত তীরগুলো দিয়েছিলেন। আমি দুশমনকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছি, সেদিন দু' ব্যক্তিকে আমি দেখেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডানে এবং বামে থেকে লড়াই করেছিলেন। অথচ তাদেরকে ইতিপূর্বে কখনও আমি দেখিনি। তাঁরা ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এবং হযরত মিকাঈল (আঃ)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলেন, একে একে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি শুধু এতটুকু বলেছিলেন, "কে আছে যে কাফেরদের বাধা দেবে এবং জান্নাতে গমন করে আমার সঙ্গী হবে"?

উবাই এবনে খালফ নামক মুশরেক শপথ করেছিল যে, সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবে। তিনি তাঁর এ শপথের কথা শ্রবণ করে বলেছিলেনঃ সে নয়, বরং আমি ইনশাআল্লাহ তাকে হত্যা করবো। ওহোদের দিন সে মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত লৌহ নির্মিত জেরা দ্বারা আবৃত অবস্থায় অগ্রসর হলো এবং বলছিল আজ আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে ধ্বংস করবো। হযরত মাসআব এবনে ওমায়ের (রাঃ) তার মোকাবেলা করে শাহাদাত বরণ করেন। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলে তিনি তাঁকে তাক করে একটি বর্ষা নিক্ষেপ করলেন। সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং আর্তনাদ করতে লাগল, অবশেষ সে দোযখে পৌঁছে গেল।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে যে, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে চারটি দান্দান মোবারক ওহোদের যুদ্ধে মুশরেকদের হাতে শহীদ হয়েছিল সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এরশাদ করেছিলেন, আল্লাহ্র কঠিন গজব সে লোকদের উপর যারা তাদের নবীর সঙ্গে এ ব্যবহার করে, আর আল্লাহর গজব সে ব্যক্তির জন্যে যাকে আল্লাহ্র রসূল হত্যা করে।

একজন মোজাহের বর্ণনা করেন যে, ওহোদের দিন চর্তুদিক থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে তীর বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরত এবং রহমতে সেগুলো এদিক সেদিক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কপাল মোবারকে লোহার কড়া ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) দাঁত বসিয়ে কড়াগুলো বের করতে চাইলেন কিন্তু তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল কড়া বের হলো না। তিনি দ্বিতীয় বার চেষ্টা করলেন। তখন কড়াটি বের হয়ে আসল কিন্তু তাঁর আরেকটি দাঁতও ভেঙ্গে গেল। কপাল মোবারক থেকে রক্ত ছুটলো তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রক্ত চুষে পান করে ফেললেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ কেউ জান্নাতী দেখতে চাইলে এ ব্যক্তিকে দেখ।[১]

ওহোদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর কথা অমান্য করে যে দুঃখ দিয়েছিলে তার বদলে তোমরা ও দুঃখ পেলে। ভবিষ্যতে কখনো যেন এ অবস্থা না হয় এ শিক্ষা গ্রহণ কর, যত লোভনীয় মোহনীয় বস্তুই সম্মুখে থাকুক অথবা যত বিপদই হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র রসূলের কথা অমান্য করোনা।

তফসীরকারগণ আলোচ্য বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখের পর দুঃখ অর্থাৎ প্রথমে বিজয় হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ এটি হলো প্রথম দুঃখ। আর নিজেদের লোকজনের শাহাদাত বরণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শহীদ হওয়ার সংবাদ হলো দ্বিতীয় দুঃখ। কোন কোন তফসীরকারের মতে ওহোদের যুদ্ধের সূচনায় মুসলমানদের যে বিজয় হয়েছিল তা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং গনিমতের মাল হাতছাড়া হওয়া এবং আপনজনদের আহত নিহত হওয়া হলো প্রথম দুঃখ। আর তার চেয়ে বড় দুঃখ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দুঃসংবাদ। ইমাম রাজী (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২]

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৯

আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তোমাদের কোন আচরণ বা কোন অবস্থাই তাঁর অজানা নয়, তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ এবং তার নিয়ত বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আমল মাত্রেরই নিয়ত অনুসারেই হবে বিনিময়।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً
مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ إِنَّ
الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ
اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

তরজমা

(১৫৪) অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাদের উপর নাযিল করেছেন দুঃখের পর শান্তি তন্দ্রা রূপে, যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর এক দল তাদের জীবনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলো, তারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে জাহেলী যুগের অজ্ঞ লোকদের ন্যায় অবাস্তব ধারণা করলো এই বলে যে এ কাজে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করেনা, তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, তারা বলে যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকতো তবে আমরা এভাবে নিহত হতাম না, (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকতে আর যার সম্বন্ধে হত্যা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সে অবশ্যই তার হত্যার নির্দিষ্ট স্থানে বের হয়ে আসতো। আর তা এজন্যে যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ পাক তা পরীক্ষা করবেন। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ পাক তা সংশোধন করবেন এবং আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরের কথা ভাল ভাবেই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক কাফেরদের বিরুদ্ধে মোমেনদেরকে সাহায্য করবেন- এ প্রতিশ্রুতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। সে সাহায্য ওহোদের যুদ্ধের চরম কঠিন মুহূর্তে মুসলমানগণ লাভ করেছেন। যখন মুসলিম বাহিনীকে কাফেররা দুদিক থেকে আক্রমণ করেছে এ অবস্থায় তারা দিক-বিদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করে, আপন জনদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। অধিকাংশ মুসলিম মুজাহেদই আহত, রক্তাপ্লুত অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের গুজব শ্রবণ করে।

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য

এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে সাহায্য করলে তাদেরকে তন্দ্রাহত করার মাধ্যমে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا

(অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করেন তোমাদের দুঃখের পরে ঝিমুনী রূপে।)

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং লীলাখেলা বোঝার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারোই নেই। রণাঙ্গণে যখন অনেক সঙ্গী-সাথী শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা ছিল দুর্বল চিত্ত মুনাফেক তারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করছিল। এমন সময় যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান সত্যিকার ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রেমে মুগ্ধ মত্ত ছিলেন তাদেরকে আল্লাহ পাক শান্তি দিলেন ঝিমুনীর মাধ্যমে। ক্ষণিকের জন্যে তাঁরা তন্দ্রাহত হলেন। রণাঙ্গণে দণ্ডায়মান অবস্থায় তন্দ্রা তাদেরকে পেয়ে বসলো। এমনকি হযরত তালহার (রাঃ) থেকে তরবারি খসে পড়লো, এটি যে আল্লাহ পাকের থেকে এক বিশেষ রহমত ও করুণা একথা মুসলিম মুজাহেদগণ উপলব্ধি করলেন। কেননা তন্দ্রার মাধ্যমে তাদের শুধু যে ক্লান্তিই দূর হলো তাই নয়, বরং তাঁরা নতুন শক্তি লাভ করলেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মোযেজা। এ তন্দ্রার পর মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই বিপর্যয়ের সময়ও তাঁর মোমেন বন্দাদেরকে সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়ত, সামান্য সময়ের এ তন্দ্রার কারণে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত স্বরূপ রণ-ক্লান্ত মুসলমানদের ক্লান্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হলো এবং তারা নব বলে বলীয়ান হলেন।

তৃতীয়তঃ যখন কাফেররা কিছু সংখ্যক মুসলমানদেরকে শহীদ করলো ঐ অবস্থায় তন্দ্রাহত হওয়ার কারণে মুসলমানগণ তাদের আত্মীয়-স্বজনকে মৃত অবস্থায় দেখলেন না, যাতে করে তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

এতদ্ব্যতীত কাফেররা সমস্ত মুসলমানদেরকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা বাতিল হলো, আল্লাহ্ পাকের হেফাজত তাদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে মুসলমানদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হলো এবং আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থায় যদি তন্দ্রা আসে তবে তা হয় বিজয়ের লক্ষণ। ওহোদের যুদ্ধের এই তন্দ্রার পর সাহাবায়ে কেরাম যখন যখন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় যুদ্ধ করেন তখন অল্পক্ষণ পর দুশমন রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল সিফ্ফিনের যুদ্ধে। হযরত আলী (রাঃ)-এর সৈন্যরাও তন্দ্রাহত হয়েছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ওহোদের রণাঙ্গণে তন্দ্রা দান করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তন্দ্রা আসে তবে তা আল্লাহর তরফ থেকে শান্তির আলামত মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি নামাযের অবস্থায় তন্দ্রা আসে তবে তা হয় শয়তানের তরফ থেকে কেননা, রণক্ষেত্রে তন্দ্রার কারণ হলো আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মানব মনের পবিত্রতার লক্ষণ, আর নামাযে যদি তন্দ্রা আসে তবে তা হয় আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ।

বস্তুতঃ রণ-ক্লান্ত অবস্থায় এবং দুশমনের মুখোমুখি অবস্থায় এবং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় ও রণাঙ্গণে যদ্ধ রত অবস্থায় নিদ্রা বা তন্দ্রা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ রহমতই লাভ করেছিলেন ওহোদের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনী। শুধু ওহোদের যুদ্ধেই নয়, বরং বদরের যুদ্ধেও আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে এ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে শান্তি ঝিমুনীরূপে নাযিল হয়।

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫

যখনই মুসলমানগণ আল্লাহর নেয়ামত এবং রহমত লাভে ধন্য হচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে মুনাফেকদের কি অবস্থা ছিল তা বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে। কেননা মুনাফেকরা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। তারা আত্মরক্ষার চিন্তায় ছিল বিভোর। ইসলাম বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন চিন্তাই তাদের ছিল না। এরা হলো আবদুল্লাহ এবনে উবাই, মোহতাব এবনে কোশাইর। তাদের ভয় ছিল আবু সুফিয়ান যদি ফিরে এসে পুনরায় আক্রমণ করে তবে আমাদের গতি কি হবে? এ দুশ্চিন্তার কারণে তাদের নিদ্রা-তন্দ্রা উধাও হয়ে যায়। তারা বর্বরতার যুগের ন্যায় আল্লাহ পাকের সম্পর্কেও ভিত্তিহীন ধারণা করে। তারা আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভাবে যদি আল্লাহ পাক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও থাকেন তবে সে সাহায্য কোথায়? আমরা যা দেখছি তা হলো এখানেই তো মুসলমানরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। মদীনায় হয়তো ফিরে যাওয়া হবে না। মুনাফেকরা বলতে লাগলোঃ আমরাতো বলেছিলাম মদীনা থেকে বের না হতে, আমাদের কোন কথাতো চলে না, আমাদের কোন পরামর্শও গ্রহণ করা হয় না। যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো তবে এভাবে আমরা নিহত হতাম না। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, যাবতীয় ব্যাপার এক আল্লাহর হাতেই রয়েছে। মানুষের হাতে কিছুই নেই। এ পৃথিবীতে যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, মানুষের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-অসাফল্য, জয় এবং পরাজয় সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়। এ মুনাফেকরদের আস্ফালন মুসলমানদের মনের কষ্টের কারণ হতে পারে। যখন তারা বলে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করলে আজ এমন অঘটন ঘটতো না এবং রণাঙ্গণে এত লোক নিহত হতো না তার জবাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন তোমারে এসব আস্ফালন এবং অনুতাপ সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেননা আল্লাহ পাক মানুষ মাত্রেরই মৃত্যুর সময় এবং স্থান লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

(যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসে তখন তা এক মুহূর্ত আগেও আসে না এবং এক মুহূর্ত বিলম্বও করে না সঠিক সময়ে আসে।) সূরা মুলকে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"তিনিই আল্লাহ পাক যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবনকে। যেন তোমাদের পরীক্ষা করেন যে তোমাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে"।

এখানে একথাটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, এ আয়াতে হায়াতের পূর্বে মওতের উল্লেখ রয়েছে। কেননা হায়াত লাভের পূর্বেই মওতের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ যদি এ মুনাফেকরা ওহোদের রণাঙ্গণে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন না করে তাদের ঘরেও বসে থাকতো তবু যদি ওহোদের ময়দানেই তাদের মৃত্যু লিপিবদ্ধ থাকতো, যে কোন অবস্থায় তাদেরকে সেখানে অবশ্যই যেতে হতো এবং অবশ্যই তাদের মৃত্যু হতো।

অতএব, তাদের এসব কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ পৃথিবীতে আগমন হলে মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে অবশ্যই গমন করতে হবে। কিন্তু ভাগ্যবান তারা যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করার তৌফিক দান করেন। এ মৃত্যু অতি আনন্দের, অতি সৌভাগ্যের, এমন মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ হয় গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত, লাভ করে অমরত্ব।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। তবু তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমাদের অন্তরের গোপন রোগ ব্যাধি প্রকাশ করার মাধ্যমে তোমাদের স্বরূপ প্রকাশ করাই ছিল এ বিপর্যয়ের উদ্দেশ্যে। যারা প্রকৃত মোমেন, তারা যেন তাদের কর্ম তৎপরতার পুরষ্কার লাভ করে আর মুনাফেকদের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আর আল্লাহ পাক অর্ন্তযামী, তিনি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের যাবতীয় ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আলোচ্য আয়াতে শানে নুযুল সম্পর্কে এবনে রাহবীয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েবের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে হযরত যোবায়ের এবনুল আওয়াম বলেছন যে আমার এখনও দুঃখ রয়েছে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, অত্যন্ত ভয়ের সময় ছিল, এমন সময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে তন্দ্রাহত করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের উপরই ঝিমুনী এসেছিল। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে আমি যখন সম্পূর্ণ তন্দ্রাহত তখন আমি স্বপ্নের মত শ্রবণ করলাম যে মুনাফেক মোহতাব এবনে কোশাইর বলছিল, "যদি আমাদের কোন অধিকার থাকতো তবে আমরা এখানে মৃত্যু মুখে পতিত হতাম না"। একথার জবাবেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন আলোচ্য আয়াত ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ থেকে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ পর্যন্ত নাযিল করেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

এ আয়াতের একটি অর্থ হলো সব কিছু আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা আদেশ দিয়ে থাকেন। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো ঃ নিশ্চয় শান, ক্ষমতা, বিজয় একমাত্র আল্লাহর দলের জন্যেই নিদৃষ্ট। আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদেরকেই সাহায্য দান করবেন এবং তাঁর দুশমনদেরকে অপমানিত ও কোপগ্রস্ত করবেন।[১]

আর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলো প্রকৃত বিজয় একমাত্র আল্লাহ পাক এবং তাঁর আওলিয়ায়ে কেরামের জন্যে অতএব, যারা আল্লাহর দল তারাই হবে বিজয়ী। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো সাময়িকভাবে সে বিজয় প্রকাশ পায় না।[২]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

তরজমা

(১৫৫) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে (রণাঙ্গণে) দু' দলে মোকাবেলা হওয়ার দিন যারা সরে পড়েছিল তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল। অবশ্য আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব সহিষ্ণু।

তফসীরুল কোরআন

ওহোদের যুদ্ধে চরম বিপর্যয়ের সময় প্রকৃত মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা সরে পড়েছিলেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, তাদের পূর্বকৃত পাপের কারণে শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং রণাঙ্গন থেকে তারা সরে পড়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহর কারণ হয়। ঠিক

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯২

যেভাবে একটি সৎ কাজ আরেকটি সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে, ঠিক তেমনি একটি পাপ কাজ আরেকটি পাপের দিকে আহবান জানায়।

এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মোমেনদেরও কখনো কখনো পদস্খলন হয়ে যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে যেহেতু শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হয় এজন্যে গুনাহর কাজের সম্পর্ক শয়তানের সঙ্গে করাই হলো সঠিক পন্থা। যেমন এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا

অর্থাৎ তাদের পূর্বকৃত পাপের পরিণামে শয়তানই তাদের প্ররোচিত করেছে। যেমন হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) সম্পর্কে সূরা বাকারায়ে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا

অর্থাৎ অতঃপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাষায় আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

"এটি শয়তানের কাজ"।[১]

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা

অতএব, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা হলো সর্বদা শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সচেষ্ট থাকা মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, কোন কারণে যদি কোন অন্যায় হয়ে যায় তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। কেননা যদি তওবা এস্তেগফারে বিলম্ব করা হয় তবে একটি পাপ আরো একটি নতুন পাপের কারণ হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে যে পাপ কার্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো ওহোদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করে ৫০ জন তীরন্দাজদের মধ্যে ৪০ জনের নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করা। এতে গনিমতের মাল বা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের প্রতি লোভ প্রমাণিত হয় যা একটি পাপ কাজ।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আহত এবং ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছেন। আর এক তৃতীয়াংশ দুশমনের মোকাবেলা থেকে সরে পড়েছিলেন, আর এক তৃতীয়াংশ মানবতার দুশমন

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬১
তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১

কাফেরদের মোকাবেলায় দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। বর্ণিত আছে, যখন তাঁরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন স্ত্রীলোকেরা তাদেরকে তিরষ্কার করে বলেছেন যে তোমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রণাঙ্গণে ফেলে পালিয়ে এসেছ? যারা সেই চরম মুহূর্তে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। ৭ জন মোহাজের ও ৭ জন আনসার। মোহাজেরদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), তালহা এবনে ওবায়দুল্লা (রাঃ), আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ্ (রাঃ) এবং হযরত যোবায়ের এবনুল আওয়াম (রাঃ)। আর আনসারদের মধ্যে খোবাব এবনুল মুনযের (রাঃ), আবু দোযানা (রাঃ), আসেম এবনে সাবেত (রাঃ), হারস এবনে সাম্মাহ (রাঃ), সাহাল এবনে হানিফ (রাঃ), ওসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ), সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ)। বর্ণিত আছে, তাঁদের মধ্যে ৮ জন সেদিন মৃত্যুর শপথ করেছিলেন অর্থাৎ “প্রাণ যায় যাবে কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে যাব না”। যারা একথার শপথ করেছিলেন তাঁরা হলেন মুহাজেরীনদের মধ্যে তিনজন হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং আনসারদের মধ্যে পাঁচ জন। হযরত আবু দোযানা (রাঃ), হারস্ এবনে সাম্মাহ (রাঃ), খোবাব এবনুল মুনজের (রাঃ), আসেম এবনে সাবেত (রাঃ) এবং সাহাল এবনে হানিফ (রাঃ)।[১]

শয়তানের প্ররোচনা

بِبَعۡضِ مَا كَسَبُوۡا

এ বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা ওহোদের যুদ্ধ থেকে সরে পড়েছিলেন তাদের দ্বারা ইতিপূর্বে কোন গুনাহ হয়েছিল, যে কারণে শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং শয়তানের প্ররোচনা ও ধোকায় পড়ে তারা রণাঙ্গন থেকে সরে পড়েছিলেন। অতএব, এই সরে পড়া ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণে নয়, এমনিভাবে দুনিয়ার লোভে রণাঙ্গণ থেকেও পলায়ন নয়; বরং শয়তানের ধোকায় ভূলক্রমে তারা রণাঙ্গন থেকে সরে পড়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যখন তারা গিরি পথ থেকে সরে পড়েছিলেন সেই পাপ কার্যের পরিণতিতে শয়তান তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে পলায়নের জন্যে প্ররোচনা দেয়।

তৃতীয়ত, গিরি পথে থাকার ব্যাপারে তীরন্দাজগণ পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারই পরিণামে শয়তান তাদেরকে ধোকা দিকে সক্ষম হয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিশেষ কোন একটি গুনাহর কারণে এ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০-৫১

অন্যায়টি হয়েছে। মূলতঃ তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য বা নাফরমান হননি এবং দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগও করেনি বরং এ ঘটনায় একটি পদস্খলন হয়েছে মাত্র।

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক এজন্যে তাদের কোন লোককেই শাস্তি দেননি; বরং সকলকে মাফ করে দিয়েছেন। এতদ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের এ পদস্খলন কুফরের কারণে নয়; বরং ভুলের কারণে কেননা, কুফরের পাপ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করেবেন না বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ ঘোষণা–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না"।

এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য গুনাহ্ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন। যেহেতু আল্লাহ্ পাক ওহোদের যুদ্ধের এ ঘটনার কারণে যে গুনাহ্ হয়েছে তা মাফ করে দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এজন্যে দোষারোপ করা বৈধ নয়।

মিশরবাসী যখন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সমালোচনা করেছিল যে, তিনি ওহোদের যুদ্ধ থেকে সরে পড়েছিলেন, বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না এবং হুদাইবিয়ার চুক্তির সময়ও ছিলেন অনুপস্থিত। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) তাদের সমালোচনার প্রতি-উত্তরে একথাই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ পাক ওহোদের যুদ্ধের এ ঘটনাকে মাফ করে দিয়েছেন। অতএব এজন্যে কাউকে দোষারোপ করা যায় না। আর বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাড়ীতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমাকে বদরের যুদ্ধে শরীক হওয়ার সওয়াব দেয়া হবে এবং গণিমতের মালের অংশ দেয়া হবে। আর হোদায়বিয়ার চুক্তির সময় না থাকার কারণ এই যে, মক্কাবাসীর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন হযরত ওসমান গনি (রাঃ)। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাঁকেই প্রেরণ করেছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এটি ওসমানের হাত আর এই হাতকে তাঁর বাঁ হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এভাবে ওসমানের (রাঃ) বয়আত হলো। (বোখারী শরীফ)

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ওহোদের যুদ্ধের ঘটনার জন্যে কোন সাহাবীকে দোষারোপ করা যাবে না।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৪

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব সহিষ্ণু"।

আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁর এ গুণ আখেরাতে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। তিনি 'হালীম' তথা অতীব সহিষ্ণু। তাঁর এ গুণটি দুনিয়াতেই অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে তাদের গুনাহর জন্যে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করেন না, বরং তওবা এস্তেগফারের সুযোগ দান করে থাকেন। অতএব কোন পাপকার্য হওয়া মাত্র আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীতভাবে তওবা এস্তেগফার করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ
اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

তরজমা

(১৫৬) হে মোমেনগণ! তাদের ন্যায় হয়োনা যারা কাফের, এবং তাদের ভ্রাতৃবৃন্দগণ যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করে বা জেহাদে গমন করে তখন তারা বলে, আমাদের নিকট যদি তারা থাকতো তবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো না অথবা নিহত হতো না। এমন ধারণা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই জীবন ও মৃত্যু দান করেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।

(১৫৭) আর যদি তোমরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ কর, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং দয়া লাভ করবে। এ ক্ষমা এবং দয়া তাদের সঞ্চিত ধন সম্পদ থেকে অতি উত্তম।

(১৫৮) যদি তোমাদের মৃত্যু হয় অথবা তোমাদেরকে নিহত করা হয় (সকল অবস্থায়) তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকট একত্রিত করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

মুনাফেকরা মুসলমানদের মনে দুঃখ বৃদ্ধি করার জন্যে এবং আক্ষেপ সৃষ্টি করার জন্যে প্রকাশ্যে দরুদ ও অনুভূতির ভাব প্রকাশ করে বলতো কেন যে মিছেমিছি এরা ওহোদ রণাঙ্গণে গমন করে প্রাণ দিল, যদি তারা আমাদের কথা শ্রবণ করতো তবে অন্তত মারা পড়তো না।

জীবন ও মৃত্যুর বিধান অলংঘনীয়

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সর্তক করেছেন যে তারা যেন মুনাফেকদের ন্যায় এমন ভিত্তিহীন কথা না বলে। কেননা যে এ পৃথিবীতে আগমন করে তাকে এখান থেকে গমনও করতে হয়, জীবন ও মৃত্যু কাছাকাছি, পাশাপাশি, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো মৃত্যু, মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে জীবনের অবসান ঘটে এটি চির সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র রব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধান, এর কোন পরিবর্তন নেই, এ নিশ্চিত সত্যকে প্রতিরোধ করা যায় না। জীবনকে কোন অবস্থাতেই ধরে রাখা যায় না। আর মৃত্যুকে কোন অবস্থাতেই বাধা দেয়া যায় না। যে ধ্রুব সত্য কোনদিন মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও আনতে পারবে না তা হলো মানুষের জীবন ও মৃত্যু, এ বিয়ষটি আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ নিজের হাতে রেখেছেন। জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এ সত্যকে বারে বারে ঘোষণা করেছেন, যেমন এ আয়াতেও এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ

আর আল্লাহ পাকই জীবিত করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত করেন। এ সম্পর্কে সূরা জুমআয় এরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই মহান সত্তার নিকট যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে তিনি তোমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করবেন"। আরো এরশাদ হয়েছে–

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

(তোমরা যেখানেই থাক না কেন, যত সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে)। আরো এরশাদ হয়েছে–

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

(অর্থাৎ) তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে আসবেন। আর শুধু যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তাই নয়, বরং প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর জন্যে যে সময় এবং স্থান নিদৃষ্ট রয়েছে তাতেও কোন পরিবর্তন হবার নয়। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসে না, আর ক্ষণিকের জন্যে বিলম্বও হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসে তখন তা বিলম্বেও আসে না আগেও আসে না"।

অতএব, মুনাফেকদের একথা যে মুসলমানগণ যদি ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতো তবে নিহত হতো না সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বাজে কথা। কেননা জীবন মৃত্যু সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহর হাতে। কত লোক যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে, ক্ষত বিক্ষত হয় কিন্তু মরে না। অথচ কত লোক ঘরে বসেই মৃত্যু বরণ করে। বিখ্যাত মুসলিম বীর পারস্য বিজয়ী মুজাহেদ হযরত খালেদ এবনে ওয়ালীদ (রাঃ) জীবনের এক বিরাট অংশ রণাঙ্গণে অতিবাহিত করেছেন, তাঁর দেহে কত আঘাত সহ্য করেছেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বগৃহে অতএব, ওহোদের যুদ্ধে শরীক না হলে মৃত্যু হতো না-এমন বাজে কথা যেন মুসলমানগণ না বলে তার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ- হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদের ন্যায় হয়োনা। তফসীরকারগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে কাফের বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? কোন কোন তফসীরকারের মতে, এতে সকল কাফেরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে মুনাফেক হোক অথবা মুশরেক বা অন্য কেউ। আর আল্লামা এবনে জরীর সহ অনেক তফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতে 'কাফারু' শব্দটি মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল, মোহতাব এবনে কোশাইর এবং তাদের দলবল এরাই মোমেনদেরকে এসব কথা বলে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করতো। এ পর্যায়ে

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, শুধু মৌখিক ইসলামের কথা বললে মুসলমান হওয়া যায় না। যেমন কেয়ামিয়া নামক বাতিল ফেরকার লোকদের এ অভিমতই ছিল কেননা, যদি শুধু মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে মুসলমান হওয়া যেত তবে এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফেকদেরকে কাফের বলতেন না, মুনাফেকরা যদিও আন্তরিকভাবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস করতো না কিন্তু মুখে সর্বদা নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো।[১]

কাফেরদের অনুকরণ থেকে বিরত থাক

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদেরকে কাফের বলা হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন, কাফেরদের মত না হওয়ার যে তাগিদ এ আয়াতে রয়েছে তার কারণ হলো, যারা কোন সম্প্রদায়ের মত নিজেদেরকে গড়ে তোলে তারা সে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। হাদীসের ভাষায়-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), আর সংকলিত হয়েছে আবু দাউদ শরীফে।

অতএব, কোন সম্প্রদায়ের এমন অনুকরণ থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য যা কুফরের কারণ হতে পারে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের যে অনুকরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা কুফরের কারণ হয়। কেননা মুনাফেকরা বলেছে মুসলমানগণ যদি ওহোদের যুদ্ধে না যেত তবে তারা নিহত হতো না। তাদের একথাটির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তকদীরকেও অস্বীকার করা হয়েছে। আর তকদীরকে অস্বীকার করা কুফর।[২]

لِاِخْوَانِهِمْ

মুনাফেকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতো, এতদ্ব্যতীত মদীনাবাসী আনসারী সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো সাথে তাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল, তাই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে তাদের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ৯৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৫

মূলতঃ এসব বাজে এবং ভিত্তিহীন কথার কারণে মুনাফেকদর অন্তরে আল্লাহ পাক আরো আক্ষেপ বৃদ্ধি করে দেন। মুসলমানগণ যখন তাদের ফাঁদে পড়লেন না তখন তাদের আক্ষেপ এবং পরিতাপ আরো বেড়ে গেল।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন। মুনাফেকরা কি বলছে এবং কোন্ পথে চলছে, আর মুসলমানগণ তাদের অনুসরণ থেকে কতখানি দূরে সরে থাকছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, প্রত্যেকের আমল এবং নিয়ত অনুসারেই হবে তার পরিণাম।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ

হে মোমেনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ কর তবে তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, যদি তোমরা ভ্রমণ না কর অথবা জেহাদে অংশ গ্রহণ না কর তবু কোন একদিন মৃত্যু তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে। তখন তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে এবং উপলব্ধি করবে যে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা অত্যন্ত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের জীবন ধন্য, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর রাহে অনন্ত অফুরন্ত নেয়ামত আর তখন এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, তোমাদের সারা জীবনের সঞ্চয় আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। আর যদি তোমরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ কর তবে তোমাদেরকে তো আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে, আর কারো কাছে নয়। অতএব, প্রত্যেকেরই আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ
فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾
اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

তরজমা

(১৫৯) (হে রসূল!) আল্লাহ্ পাকের রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিন চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশ-পাশ থেকে দূরে সরে পড়ত। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

(১৬০) যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সাহায্য না করেন, তবে তাঁর পর কে তোমাদের সাহায্যকারী হবে? আর আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করা মোমেনদের একান্ত কর্তব্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক যে তাদেরকে ক্ষমা করেছেন একথার ঘোষণা রয়েছে এবং মুনাফেকদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর সাহাবায়ে কেরামের ত্রুটিকে ক্ষমা করার এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে।

ওহোদের রণাঙ্গণে যা ঘটেছে তার জন্যে কয়েকজন সাহাবীর ভুল ভ্রান্তিই দায়ী ছিল। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনে দুঃখ কষ্ট হওয়া, তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং বিরক্তি বোধ হওয়া এবং ক্রোধ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া আদৌ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু একথা সর্বজন-বিদিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্রোধ বা ক্ষোভ তাঁর নিজের জন্যে নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের জন্যে।

সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ক্ষমা ঘোষণা

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভই ছিল তাঁর যাবতীয় কর্মসূচীর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নিজের তরফ থেকে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ

(এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেছেন) অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ

অর্থাৎ- (হে রসূল!) আপনিও তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর এ নির্দেশের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণ তাঁর অন্তরের কোমলতা এবং বিনম্র স্বভাবের কথা অতি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ভাষায় এ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল!) আপনি যে তাদের প্রতি এত সদয় চিত্ত এবং কোমল হৃদয় তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। যদি আল্লাহ পাকের এই রহমত ও দয়া না হতো এবং আপনি তাদের সঙ্গে রুঢ় আচরণ করতেন, তবে তারা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেত। তারা আক্ষেপে, অনুতাপে ভেঙ্গে পড়তো, তাদের কল্যাণের পথ সুগম হতো না। এ কারণেই আল্লাহ পাক আপনার মন মেজাজ এত বিনম্র এবং আর্কষণীয় করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আর ইতিপূর্বে তাদের সাথে যেভাবে পরামর্শ করতেন এখনও তাদের সাথে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে এমনিভাবে পরামর্শ করুন।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদত মোবারক ছিল যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। এ পর্যায়ে হযরত মওলানা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিকতর পরামর্শ গ্রহণকারী আর কাউকে দেখিনি।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিয়েছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হয়ে আমাদেরকে আদেশ দেন যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়, তখন আমরা বিনা দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। যেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিলঃ আপনি এবং আপনার পরওয়ারদেগার লড়াই করুন, আমরা তা বলবো না, বরং আমরা আপনার ডানে বামে কাতার বন্দী হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের যুদ্ধের সময়ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন যে মদীনায় অবস্থান করে দুশমনের মোকাবেলা করবেন? নাকি মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবেন? এ ব্যাপারেও সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২. পৃষ্ঠা-৩৯৭

পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শ মোতাবেক যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এমনিভাবে ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার চুক্তির সময়ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন।[১] তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে পরামর্শও করুন। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করুন যদ্বারা তারা আপনার সন্তুষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। এবং তাদের সঙ্গে পূর্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করুন। পরস্পরের পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখবেন। আর একথা নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি নির্ভরশীল লোকদেরকে ভালবাসেন এবং তাদেরকে সাফল্য মণ্ডিত করেন।

রাষ্ট্র পরিচালকের কর্তব্য

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ আয়াতে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম কানুন ঘোষণা করা হয়েছে।

(১) যার হাতে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব অর্পিত হবে তাকে মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করতে হবে। তাকে হতে হবে কোমল হৃদয়ের অধিকারী, দয়া মায়া, ক্ষমা ও ঔদার্য হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য হবে আল্লাহ্ পাকের রহমত, তাঁর মহান দান।

(২) মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার এবং ক্ষমা সুন্দর হওয়া ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়।

(৩) রাষ্ট্রের নেতাকে তার সাথে যারা ঘণিষ্ট সম্পর্ক রাখে তাদের সাথে পরামর্শ করা একান্ত জরুরী।

(৪) এক আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে, তবে চেষ্টা-তদবির কম করা যাবে না।

(৫) নিজের অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করা উত্তম তবে তা মেনে নেয়া জরুরী নয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪০

(৬) যে সব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ করা বৈধ নয়, যেমন যেসব বিষয়ে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাযিল হতো সেসব বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কারো সাথে পরামর্শ করতেন না। কেননা, আল্লাহ পাকের কথাই শেষ কথা, এরপর আর কারো কথার প্রয়োজন থাকেনা।[১]

বুদ্ধিমান আপনজনদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! যদি আল্লাহর কিতাব ও আপনার ছুন্নায় কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত না পাই তবে আমরা কি করবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন, "পরহেযগার সমঝদার এবং ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিও। শুধু দু' একজনের কথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোনা"।

প্রিয়নবী (সঃ)-এর গুণাবলীর বর্ণনা

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যেভাবে সূরায়ে তওবার শেষ দু' আয়াতে এরশাদ হয়েছে। সূরা তওবার দু' খানি আয়াত হলো এই-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ- لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"(অর্থাৎ) তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট একজন রসূল আগমন করেছেন যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী। মোমেনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াদ্র এবং অতীব দয়ালু। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, আমার জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি আর তিনি মহান আরশের অধিপতি"।

এ আয়াত দ্বারা কোন কোন তফসীরকার এবং ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ এজতেহাদের বৈধতা এবং প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন কেননা, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের পরস্পরের পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা এ আয়াতে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১২

নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। কেননা, পরামর্শের সুযোগ শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই হয়ে থাকে। আর এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ কোন বিষয়ে অপরাধও করে তবে তার ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেয়া অনুচিত হবে। কেননা আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে যাদের অপরাধের কথা পূর্ববতী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দার প্রতি কত বেশী দয়াবান তা এর দ্বারা সহজেই অনুমেয়। আর ইসলাম কত বেশী গণতান্ত্রিক বিধান পেশ করে তারও একটি নমুনা এ আয়াতে লক্ষ্যণীয়। কেননা মানব রচিত সংবিধানের অনুসারী কোন রাষ্ট্র তা যত বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক না কেন এত উদারতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম হবে না।

এতদ্ব্যতীত, আরও একটি বিষয়ও লক্ষ্যনীয় তাহলো আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম এরশাদ হয়েছে–

فَاعْفُ عَنْهُمْ

অর্থাৎ ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ যদি আপনার হক্ব নষ্ট করে থাকে তবে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর এর পরবর্তী বাক্য হলো-

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাকের হক্ব সম্পর্কে তাদের যে অপরাধ হয়েছে তার জন্যে আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর যখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন তখন আল্লাহ্ পাক যে ক্ষমা করেছেন এতে আর বিন্দুমাত্রও কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম রাজী (রঃ) এজন্যেই লিখেছেন যে জেহাদ থেকে পলায়নের ন্যায় বড় কবীরা গুনাহ আর কি হতে পারে! কিন্তু আল্লাহ্ পাক সাহাবায়ে কেরামের কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা অন্যায় এবং অবৈধ।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

(হে রসূল!) আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।)

সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শের তত্ত্বকথা

(১) ইমাম রাজী (রঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করা তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি যে গভীর মহব্বত রয়েছে তারও প্রমাণ বহন করে।

যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে মান-মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু তবু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কল্যাণের ক্ষেত্রে হয়তো এমন কথা কারো মনে আসতে পারে যা তাঁর মনে আসবে না। তাই সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর একখানি হাদীসে তিনি এরশাদও করেছেনঃ

انتم اعرف بامور دنياكم وانا اعرف بامور دينكم

অর্থাৎ- তোমাদের দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তোমরা ভাল জান আর তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে আমি সর্বাধিক বেশী জানি।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, এরশাদ করেছেনঃ যে সম্প্রদায় তাদের বিষয় সমূহ পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

(৩) হযরত হাসান এবং সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ এ বাক্যটির তফসীরে বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার এ আদেশ এজন্যে দেয়া হয়েছে যেন অন্যরা পরামর্শের ক্ষেত্রে এই আদেশের অনুসরণ করে এবং পরামর্শ করা এ উম্মতের জন্যে একটি নিয়মে পরিণত হয়।

(৪) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, তারা মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল মদীনায় অবস্থান করেই দুশমনের মোকাবেলা করা। পরে যখন তাদের পরামর্শ মোতাবেক বের হলেন তখন যা ঘটবার তা ঘটে গেল। এখন যদি তাদের সাথে পরামর্শ করা বর্জন করেন তবে ওহোদের যুদ্ধে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তার কষ্ট তাঁর অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। তাই আল্লাহ পাক এমন মর্মান্তিক ঘটনার পরও সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন যেন একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে ক্ষমার করার পর তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে কোন কষ্ট রয়নি।

(৫) যদিও এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের অভিমত বা জ্ঞান দ্বারা কোন বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে; বরং এ আদেশ এজন্যে দেয়া হয়েছে যেন সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত এবং তাঁর অনুকরণে সাহাবায়ে কেরামের আন্তরিকতা সম্পর্কে তিনি সঠিক ধারণা করতে পারবেন।

(৬) "(হে রসূল!) আপনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন"। এর অর্থ এই নয় যে আপনি তাদের পরামর্শের মুখাপেক্ষী, বরং আপনি এজন্যে তাদের সাথে

পরামর্শ করুন যেন সঠিক পথের অনুসন্ধানে সকলেই যৌথ প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করে এবং একই বিষয়ে সকলে একাত্মতা ঘোষণা করে।

(৭) আল্লাহ পাক যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন তখন একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, আর এ কারণে একথাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে; তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে মানব সমাজে।

(৮) বড় বড় রাষ্ট্র প্রধানগণ শুধু তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথেই পরামর্শ করেন যারা হয় তাদের নিকট অত্যন্ত ঘণিষ্ঠ, আর সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা ওহোদের যুদ্ধে যে গুনাহ হয়েছে যদিও আল্লাহ পাক তা মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু তাদের অন্তরে এ ভাবনার অবতারণা হতে পারে যে যদিও আল্লাহ পাক আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন কিন্তু আমাদের পূর্বের সেই মান মর্যাদা হয়তো রয়নি। তাই আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার আদেশ দানের মাধ্যমে একথা প্রকাশ করেছেন যে, তওবার পর তাদের পূর্ব মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি, বরং তা বেড়েছে। কেননা, এ ঘটনার পূর্বে আমার রসূলকে আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দেইনি, কিন্তু এ ঘটনার পর আমি তাঁকে তোমাদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছি। অতএব, তোমাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে অধিকতর হয়েছে। পূর্বে তোমাদের মর্যাদা ছিল তোমাদের আমলের কারণে, আর এখন তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে আমার দান এবং আমার ক্ষমা ধন্য হওয়ার কারণে, যাতে করে তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর যে, তোমাদের আমলের চেয়ে আমার ক্ষমা এবং দান অতীব মহান।[১]

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ- যখন পরস্পর পরামর্শের পর কোন সিদ্ধান্ত হয়, আর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর তখন এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা কর এবং নিজের যাবতীয় ব্যাপারে সর্ব শক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহ পাকের উপর সোপর্দ কর এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখ। এ অবস্থাই ছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। ওহোদের যুদ্ধের দিন যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে তার ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তখন প্রবীন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ উপলব্ধি করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অভিমত মোতাবেক মদীনা শরীফে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৬

উচিত। তাঁর মর্জির খেলাফ করা আদৌ সমীচিন হবে না। তখন তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিনীত আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মর্জি মোতাবেক আমরা শহরে থেকেই দুশমনের মোকাবেলা করি। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ কোন নবীর জন্যে উচিত নয় যে, তিনি জেহাদের পোষাক পরিধান করে জেহাদ না করে তা খুলে ফেলবেন।

তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য

পবিত্র কোরআনে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার আদেশ রয়েছে বহুবার। এর তাৎপর্য হলো একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যে যাবতীয় কাজ আল্লাহ পাকের মর্জিতেই হয়। অতএব, আমার যাবতীয় কাজ আল্লাহ পাকের হাতেই সোপর্দ করি এবং সাফল্যের জন্যে তাঁরই নিকট মোনাজাত করি এবং তাঁরই উপর বিশ্বাস এবং ভরসা রাখি। আর এ আশা রাখি যে আল্লাহ পাক অবশ্যই আমাকে সাফল্য দান করবেন। এরপর যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্ত্বাকে রিয্ক বা অন্য কিছুর দাতা হিসাবে মনে না করা এবং এক আল্লাহ পাকই সব কিছুর অধিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করাই হলো তাওয়াক্কুল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক হিসাব ব্যতীত বেহেশতে যাবে। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে সব লোক কারা? তিনি এরশাদ করলেন, যারা মন্ত্র না পড়ে এবং কোন কিছুর আলামত লক্ষ্য করে ভাল-মন্দ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী না করে, আর এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ভরসা কর যতখানি করা উচিত, তবে আল্লাহ পাক তোমার রিয্ক এভাবে দেবেন যেভাবে পাখিদেরকে দিয়ে থাকেন, সে সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ উদর হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। (তিরমিজি ও এবনে মাজা)

এখানে একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ভরসা করার অর্থ সে উদ্দেশ্য সফলের জন্যে চেষ্টা-তদবির পরিত্যাগ করা নয়, বরং চেষ্টা-তদবির অব্যাহত রাখা এবং সাফলের্য জন্যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা। চেষ্টার প্রতি আশা না করা, বরং আল্লাহ পাকের প্রতি আশা করা এবং এই চিন্তা করা যে চেষ্টা করা আমার কাজ, আর সাফল্য মণ্ডিত করা আল্লাহ পাকের কাজ। এটিই হলো আল্লাহর প্রতি ভরসা করা বা তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৮

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি ভরসাকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।) অতএব, আল্লাহর প্রতি ভরসার কারণে আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা লাভ করা যায়। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! এতদ্ব্যতীত আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের কারণে আল্লাহ্ পাক দ্বীন দুনিয়ার সাফল্যের পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করে আল্লাহ্ পাক তার জন্যে যথেষ্ট।

হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছেঃ আমি আমার বন্দার ধারণার কাছে রয়েছি অর্থাৎ আমার বন্দা যদি আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে তবে তার সাথে তেমনই ব্যবহার করা হয়। আর যে মন্দ ধারণা করে তবে তার সাথে সে ব্যবহারই করা হয়।

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর প্রতি ভরসা করার আদেশ দানের পর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ (হে মোমেনগণ!) একথা বিশ্বাস রাখ, যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি আল্লাহ্ পাকই তোমাদের সাহায্য না করেন তবে তাঁর পরে কে তোমাদের সাহায্য করবে? অতএব, তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতিই ভরসা করা উচিত এবং তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। কেননা তিনি সাহায্য করলে বিজয় লাভ হয় সুনিশ্চিত। এ আয়াতের তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ كَمَا نَصَرَكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَا يَغْلِبْكُمْ اَحَدٌ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ كَمَا خَذَلَكُمْ يَوْمَ اُحُدٍ لَمْ يَنْصُرْكُمْ اَحَدٌ

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন, যেমন বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন তবে কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে অপমানিত করেন যেমন ওহোদের যুদ্ধে অপমানিত করেছেন তখন কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

আয়াতের মর্মকথা

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতের মর্মকথা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে উৎসাহিত করা এবং আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা। এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য করবেন। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا- الاية

অর্থাৎ– হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর কর এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর এমন অবস্থায় তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। আর যাকে আল্লাহ্ পাক সাহায্য করেন, তার বিজয় সুনিশ্চিত এবং দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানে তার সাফল্য অবধারিত।[১]

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

তরজমা

(১৬১) এবং কোন নবীরই এটি স্বভাব নয় যে, তিনি (গনিমতের মাল) খেয়ানত করবেন, অথচ যে খেয়ানত করবে সে কেয়ামতের দিন খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে হাযির হবে, অতঃপর প্রত্যেকেই তার কার্যাবলীর বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আর তারা কোন অবস্থাতেই অত্যাচারিত হবে না।

(১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির তাবেদার, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হবে যে আল্লাহ্ পাকের গজবের উপযুক্ত, তার আবাস দোযখ আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন স্থান।

(১৬৩) আল্লাহ্ পাকের নিকট মানুষের মর্যাদার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের তাদের যাবতীয় কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন একটি লাল রংয়ের চাদর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন এক মুনাফেক একথা বললো, হয়তো

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৮

চাঁদরটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রেখে দিয়েছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিযী শরীফ)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, মুনাফেকরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অপবাদ দিয়েছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের অর্থ হলো কোন নবীর এই স্বভাব নয় যে, তিনি গনিমতের মালে খেয়ানত করবেন। এর অর্থ হলো এক দলকে গনিমতের মাল দান করবেন এবং অন্য দলকে বঞ্চিত করবেন এ পন্থা নবীর জন্যে বৈধ নয়, বরং তাঁর কাজ হলো সমভাবে সকলের মধ্যে গনিমতের মাল বন্টন করা।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, বদরের যুদ্ধে গনিমতের সম্পদ বিতরণের পূর্বেই কয়েকজন লোক কিছু মালপত্র তুলে নিয়েছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম কাতাদা এবং হযরত রবী (রঃ) শানে নুযুল সম্পর্কে এ মত পোষণ করতেন।

কালবী এবং মোকাতেল (রঃ)-এর বর্ণনা এই, আয়াত খানি নাযিল হয়েছে ওহোদের যুদ্ধের গনিমতের মাল সম্পর্কে। যখন গিরি পথে মোতায়েন তীরন্দাজগণ গিরি পথের ঘাঁটি ছেড়ে দিলেন এবং বললেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হয়তো একথা বলবেন যে এ যুদ্ধে যার কাছে যে সম্পদ রয়েছে সে-ই তার মালিক হবে। এজন্যে সকলেই গনিমতের মাল একত্রিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ আদেশ দেইনি যে, আমার কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এ স্থান ছাড়বে না। তখন তারা বলেছিলেন, আমরা আমাদের কিছু সাথী সেখোনে রেখে এসেছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেনঃ ব্যাপার আসলে এই, তোমরা মনে করেছ যে আমি তোমাদের গনিমতের মাল দেব না, তাতে খেয়ানত করবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর অন্য একটি বিবরণ উপস্থাপন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুশমনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে কিছু লোক প্রেরণ করেন। তাদের অনুপস্থিতিতে গনিমতের মাল বিতরণ করেন। তাদের গনিমতের মালের কিছু অংশ না পাওয়াকে খেয়ানত বলা হয়েছে অর্থাৎ খেয়ানত করা নবীর শানের খেলাফ। তাঁদের দ্বারা এমন কাজ অসম্ভব, অকল্পনীয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪০০
তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪০

এ আয়াত সম্পর্কে মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলেছেন, মূলতঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে অর্থাৎ কোন প্রকার লোভ বা ভয় অথবা গাফলতের কারণে আল্লাহর নবী তাঁর নিকট অবতীর্ণ ওহীর কোন অংশ প্রকাশ করবেন আর কোন অংশ গোপন করবেন, এমন অবস্থা হতে পারে না, কোন নবী সম্পর্কে এমন কথা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অকল্পনীয়।

খেয়ানতের পরিণাম

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ যে কেউ খেয়ানত করবে সে কেয়ামতের দিন সেই খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে হাযির হবে।

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তু খেয়ানত করবে, দোযখে অনুরূপ কোন বস্তু প্রস্তুত করে তাকে দেখানো হবে এবং তাকে আদেশ দেয়া হবে যে, এ বস্তুটি নিয়ে আস, সে যাবে এবং ঐ বস্তুটি নিয়ে আসবে, কিন্তু তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সে বস্তুটি পড়ে যাবে। তখন পুনরায় তার প্রতি অনুরূপ আদেশ হবে। আর সে এ কাজে মশগুল থাকবে। আল্লাহ পাকই জানেন, কত দিন পর্যন্ত এমন শাস্তি প্রদান করা হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, খায়বরের যুদ্ধের সময় আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এ যুদ্ধে গনিমতের মাল হিসেবে উষ্ট্র, কাপড় এবং অন্যান্য আসবাবপত্র পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাদআম নামক একটি গোলাম ছিল, আমরা ওয়াদিয়ে কোরা নামক স্থানে পৌছার পর মাদআম তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যায়, তখন লোকেরা বলে তার জান্নাত মোবারক হোক কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "অবশ্যই নয়"। যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যে ছোট কম্বলটি সে খায়বরের রণাঙ্গন থেকে নিয়ে এসেছে, যা গণিমতের মাল হিসেবে তার অংশে পড়েনি, তা অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে দাউ দাউ করে তার উপর জ্বলছে। একথা শ্রবণ করে এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি ফিতা তাঁর সম্মুখে পেশ করেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি এগুলো সরকারী তহবিলে জমা না দেয়া হতো তবে অগ্নিতে পরিণত হতো।

হযরত ইয়াজিত এবনে খালেদ জোহানী বর্ণনা করেনঃ খায়বরের দিন এক ব্যক্তির এন্তেকাল হয়। লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার কথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর উপর জানাযার নামাজ পড়। একথা শ্রবণ করে সকলেই ভীত হলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাদের সাথী আল্লাহর রাহে খেয়ানত করেছে, আমরা তার আসবাব পত্র খুলে দেখলাম তাতে খায়বরের ইহুদীদের মালপত্র থেকে নেয়া কয়েকটি নকল মুক্তা ছিল (মুয়াত্তা মালেক ও নেসায়ী শরীফ)।

হযরত আবু হোমায়েদ সায়েদী বর্ণনা করেন যে, এবনে কোতায়বা নামক এক ব্যক্তিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাকাত সদকা উশুল করার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন। লোকটি কাজ শেষ করে এসে বললোঃ এগুলো আপনাদের (কিছু মাল-পত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে) আর এগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দান করলেন। আল্লাহ পাকের হাম্‌দ ও সানার পর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক যেসব কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন তন্মধ্যে কোন কোন কাজের ব্যবস্থাপনার জন্যে আমি তোমাদের কোন লোককে নিয়োগ করি। তখন সে এসে বলে যে এই সম্পদ মুসলমানদের আর এ সম্পদ আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার পিতা-মাতার নিকট স্বগৃহে কেন বসে রইল না? যদি তার দাবীতে সে সত্যবাদী হয় তবে তাকে প্রদত্ত হাদীয়া তার ঘরে অনায়াসে পৌঁছে যেত। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গ্রহণ করবে, যখন সে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন সে বস্তুকেই বহন করবে। অতএব, তোমাদের কাউকে যেন আমি এ অবস্থায় না পাই যে তোমরা আল্লাহর দবারে হাযির হওয়ার সময় উষ্ট্র বা গাভী অথবা বকরী বহনকারী হবে (হাদীসের সকল গ্রন্থ)।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দুটি মোবারক হাত উত্তোলন করে বললেনঃ হে আল্লাহ! আমি কি তোমার হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি তোমার হুকুম পৌঁছে দিয়েছি?

হযরত আদি এবনে ওমায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি আর সে তখন সুই বা তার চেয়ে অধিক কোন বস্তু আমাদের নিকট থেকে গোপন করে রাখে, তবে তাকে নিঃসন্দেহে চুরি বলা হবে। সে বস্তুটি নিয়ে অবশ্যই তাকে কেয়ামতের দিন হাযির হতে হবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রদত্ত ভাষণে (যাকাত বা গনিমতের মালে) খেয়ানতকে অত্যন্ত বড় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা খুব ভাল করে শুনে নাও কেয়ামতের দিন আমার সাথে তোমাদের কারো যেন এমন অবস্থায় মোলাকাত না হয় যে তার কাঁধে উট আরোহণ করে আছে। আর যে ঐ অবস্থায় বলে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে দোহাই দিচ্ছি, আর আমি তখন বলবো যে আমি এ অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। আমি তো তোমার নিকট আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির উল্লেখ করেন যার কাঁধে ঘোড়া অথবা বকরী আরোহণ করবে তথা সে স্বর্ণ রৌপ্য বহন করে আনবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মালেক আশ্আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় খেয়ামত হলো মাত্র এক গজ জমি চুরি করা। অর্থাৎ কোন জমি বা বাড়ীতে দু'জন শরীকদার থাকে, যদি এক ব্যক্তি অন্যের এক গজ জমিও অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় তবে কেয়ামতের দিন জমির সাতটি স্তর তাকে বহন করতে হবে।

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কোন বস্তু নেবে না। কেননা, তা হবে খেয়ানত বা চুরি। আর যে খেয়ানত করবে তাকে খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে কেয়ামতের দিন হাযির হতে হবে।

হযরত আমর এবনে মোয়াযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ খেয়ানতকারী চোরের মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং সে ব্যক্তিকে প্রহার করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাল পত্রের দায়িত্বে এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তার নাম ছিল কারকারা। তার মৃত্যু হলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সে ব্যক্তি দোযখে আছে। লোকেরা তার মাল তল্লাশি করে দেখলো যে তাতে একটি জুব্বা আছে যা সে খেয়ানত করেছিল। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ খায়বরের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামের দল আসলেন। তারা বলতে লাগলেন অমুক শহীদ হয়েছে অমুক শহীদ হয়েছে, এমন সময় একটি জানাজা আসল। লোকেরা বললো অমুক শহীদ হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, অবশ্যই নয়। আমি তাকে দোযখে দেখেছি, একটি চাদর খেয়ানত করার কারণে। অথবা তিনি এরশাদ করেছেন, একটি জুব্বার খেয়ানতের কারণে। এরপর তিনি হযরত ওমরকে (রাঃ) হুকুম দিলেন ঃ তুমি যাও এবং মানুষের মধ্যে একথা প্রচার কর যে, জান্নাতে শুধু মোমেনরাই যাবে। আমি তাঁর হুকুম মোতাবেক তিনবার এ ঘোষণা করলাম। (মুসলিম শরীফ)

এবনে মরদবিয়ায় রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি দোযখে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে ৭০ বছর পর্যন্ত সে পাথরটি যেতে থাকবে। কিন্তু তবু দোযখের তলদেশে পর্যন্ত পৌঁছবে না। ঠিক

এভাবে খেয়ানত করা বস্তু দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং খেয়ানতকারীকে বলা হবে যে, সে বস্তুটি নিয়ে আস। আল্লাহ্ পাকের কালামের এটিই হলো মর্মকথা যা তিনি এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ "আর যে খেয়ানত করবে তাকে কেয়ামতের দিন সে বস্তু নিয়ে হাযির হতে হবে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদত মোবারক ছিল এই, যখন গনিমতের মাল আসতো তখন তিনি হযরত বেলালকে (রাঃ) এ সম্পর্কে ঘোষণা করার হুকুম দিতেন। তিনি বলতেন যার কাছে যে গনিমতের মাল আছে তা নিয়ে আস। এ ঘোষণা তিনবার হতো। এরপর সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে দিয়ে অবশিষ্টাংশ সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি সামান্য কিছু মাল নিয়ে হাযির হয়ে বললো, এগুলো আমার কাছে রয়ে গেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি বেলালের ঘোষণা শুনেছিলে যা তিনবার হয়েছিল? সে বললো, হ্যাঁ, শুনেছি। তখন জিজ্ঞাসা করলেন তবে তুমি কেন আনলে না? সে কিছু ওজর আপত্তি করলো কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ওজর গ্রহণ করলেন না। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি এটি আর গ্রহণ করবো না। তুমি নিজেই কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাযির করো।[১]

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ

অর্থাৎ– প্রত্যেকটি মানুষকে কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে তার জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর বদলা দেয়া হবে। ভাল কাজের জন্য মানুষ পুরস্কার পাবে, মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি ভোগ করবে।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ

এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অবিরাম সাধনা করেছে যেমন মোহাজের ও আনসারগণ। তার পরিণাম কি সে ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যে আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করেছে। আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। যেমন মুনাফেক এবং ফাসেক, এমন কখনও হতে পারে না, বরং যারা আল্লাহর নাফরমানী করে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামী এবং আল্লাহর অবাধ্য লোকদের বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে। কোন কোন মোমেন অন্য মোমেনের চেয়ে অধিকতর মর্তবার

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০১-০৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪১-৪২
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭১-৭৩

অধিকারী হবে, আর তা হবে নেক আমল এবং এখলাসের বরকতে। এমনিভাবে নাফরমানদের শাস্তির ব্যাপারেও তাদের অন্যান্য আচরণের তারতম্যের কারণে তাদের শাস্তির ব্যাপারেও তারতম্য হবে।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন। তোমাদের সকলের আমল সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। অতএব পুরস্কার বা শাস্তি যার প্রাপ্য তা সে সঠিক ভাবেই পাবে।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾ اَوَلَمَّآ
اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۗ قُلْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾
وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۗ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ۗ
هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ
مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

তরজমা

(১৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মোমেনদের প্রতি বিশেষ এহসান করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দান করেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

(১৬৫) এবং যখন তোমাদের উপর পরাজয়ের মসিবত আসল যার দ্বিগুণ তোমরা জয়লাভ করেছিলে তখন তোমরা বললে এই মসিবত কোথা থেকে আসলো? (হে রসূল!) এ পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই (অর্থাৎ তোমরাই এ পরাজয়ের জন্যে দায়ী)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(১৬৬) এবং (রণাঙ্গন) যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল তা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ক্রমেই হয়েছিল এবং যেন আল্লাহ্ পাক (প্রকৃত) মোমেনদেরকে পরীক্ষা করে নেন।

(১৬৭) এবং যেন কারা মুনাফেক তাও (প্রকাশ্যে) জেনে নেন, আর যখন মুনাফেকদেরকে বলা হলো যে তোমরা আস, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ কর অথবা শত্রুদেরকে রুখে দাড়াও। তখন মুনাফেকরা বললো, যদি আমরা কোন নিয়মতান্ত্রিক পন্থার যুদ্ধ দেখতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা অংশ গ্রহণ করতাম। এ মুনাফেকরা ঈমানের তুলনায় নাফরমানীর নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশী। তারা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই এবং আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে খেয়ানতের অপবাদ দিয়েছে তা শুধু যে অসত্য এবং অন্যায় তাই নয়, বরং অবাস্তব এবং অসম্ভব। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমার নবী যেমন নিঃষ্পাপ, নিষ্কলংক তেমনি তিনি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ, তোমাদের মধ্য থেকেই তাঁকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং তোমাদের নিকটই তাঁকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি তোমাদের শহরেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের মাঝেই বড় হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে সততা, সত্যবাদিতা, ঈমানদারী, আমানতদারী, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পায় না। অতএব, মুনাফেকদের এ অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অচিন্তনীয়। উপরন্তু আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কালাম পাঠ করেন, তোমাদেরকে আত্মসংশোধনের শিক্ষা দান করেন। আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা এবং হেকমতের জ্ঞান তোমরা তাঁর নিকট থেকেই অর্জন কর। তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত। আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। অতএব, এজন্যে তোমাদের আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যে কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, কোন ব্যক্তি যদি অচেনা

অজানা হয় সে ব্যক্তি গুণী জ্ঞানী হলেও তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয় না। এজন্যে আল্লাহ পাক মুসলিম জাহানের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরণকে তাঁর মহান দান এবং মহা এহসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন তাঁদের অতি পরিচিত এবং একান্ত আপন জন। আরব হিসেবে তিনি আরবদের সহজাতি। আর ভাষার দিক থেকে তিনি তাদের সহভাষী এবং গোত্র ও বংশের দিক থেকে তিনি তাদের সহশ্রেণী। এতদ্ব্যতীত তাঁর ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা অনেক দিন থেকেই তাদের অত্যন্ত পরিচিত। নবুওয়্যত লাভের পূর্বে আরববাসী তাঁকে আল আমীন (বিশ্বস্ত) এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী খেতাবে ভূষিত করেছিল। তাঁর সততা, সাধুতা এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য ছিল সর্বজন-বিদিত এবং স্বীকৃত। যদি তাঁর স্থলে কোন ফেরেশতা বা জ্বীন রসূল হিসেবে প্রেরিত হতো তবে মানুষের পক্ষে তার কাছ থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব হতো না। অতএব, এমন একজন রসূল যাঁর হেদায়েতের কারণে মানুষ ফেরেশতার চেয়েও উচ্চ মর্যাতা লাভ করে তাঁকে প্রেরণ করা যে আল্লাহ পাকের অসামান্য অনুগ্রহ এবং অশেষ দয়া, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লামা পানিপত্তি সানাউল্লাহ (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "আল মোমেনীন" শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব দুনিয়ার সকল মোমেনদের জন্যে এক বিরাট নেয়ামত কিন্তু তবু যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার কোরায়শ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাক কোরায়শ বংশের প্রতি বিরাট এবং বিশেষ এহসান করেছেন। অতএব, "আল মোমেনীন" শব্দ দ্বারা কোরায়শ মোমেনদের কথা বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, এই "মোমেনীন" শব্দটি সারা আরবের সমস্ত মোমেনদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এতে

مِّنْ أَنفُسِهِمْ

শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, এর অর্থ হলো- "তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করেছেন", যেন তোমরা (আরবরা) তাঁর কথা বোঝ, তাঁর আহ্বানে সাড়া দাও।

হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করোনা। অন্যথায় দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হুজুরের প্রতি কিভাবে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি? হুজুরের মাধ্যমেই তো আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত দান করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি যদি আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর তবে তা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হবে। (তিরমিযী শরীফ)

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত "আল মোমেনীন" শব্দের ব্যাখ্যায় অন্য একদল তফসীরকার বলেছেন, এ শব্দটি দুনিয়ার সকল যুগের সকল দেশের সকল মোমেনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আরব অনারব সকলে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ দুনিয়ার সকল মোমেনের প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট এহসান স্বরূপই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যেই আগমন করেছেন আল্লাহর রসূল। এর তাৎপর্য হলো, হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্য থেকেই রসূল নির্বাচিত হয়েছেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নয়, যেন মানুষের সাথে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে তার ভিত্তিতে হেদায়েত লাভ করা, একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজতর হয়।

এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا

অর্থাৎ যদি ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে বাস করতো, তবে আমি ফেরেশতাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করতাম।

কিন্তু মানুষের হেদায়েতের জন্যে মানুষকেই রসূল হিসেবে প্রেরণ করা উচিত।[১]

মহানবীর (সঃ) আগমন বিশ্ব মানবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেনঃ

اراد به المؤمنين كلهم وما انا من انفسهم انه واحد منهم وبشر مثلهم

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে 'মোমেনীন' শব্দটি পৃথিবীর সকল মোমেনদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'মিন্ আন্ফুসিহীম' শব্দের তাৎপর্য হলো, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৪-০৫

করে মোমেনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরণ সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এহ্সান, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শুধু মোমেনদের কথা এজন্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, মোমেনগণই শুধু রসূল প্রেরণের মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাঁর মাধ্যমে মুসলমানগণই হেদায়েত লাভ করে। এ আয়াতে মুসলমানদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) "মোমেনীনের" ব্যাখ্যা সম্পর্কে উপরোল্লিখিত তথ্য সমূহ উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর এ সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) অভিমত ইমাম বায়হাকীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন-

انها قالت هذه للعرب خاصة

অর্থাৎ এ খোশ খবরীটি বিশেষ করে আরবদের জন্যে, অতঃপর আল্লামা আলূসী (রঃ) একথা বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যেই রহমত স্বরূপ আগমন করেছেন। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। কিন্তু তাঁর প্রেরণকে মোমেনদের জন্যে বিশেষভাবে এহ্সান এজন্যে বলা হয়েছে যে, মোমেনগণই হযরত রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে উপকার লাভ করে। এর একটি দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতে রয়েছে–

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন পথ-প্রদর্শক তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যারা মোত্তাকী, পরহেযগার। অথচ পবিত্র কোরআন হলো বিশ্ব-গ্রন্থ, সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ, এর তাৎপর্য এই, যদিও পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় শুধু মোত্তাকী পরহেযগারগণ। একথাটি ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন। ইমাম রাজী (রঃ) আরও লিখেছেন, কোরায়শ বংশের বা আরববাসীর উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের যে বাক্যটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ তাহলো من انفسهم অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন তোমাদের মধ্য থেকে, এ পর্যায়ে কথা হলো ঃ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪

(১) তোমরা তাঁর যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে ছিলে ওয়াকেফহাল, নবুওয়্যত লাভের পূর্বে একাধারে ৪০টি বছর তিনি তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারীসহ সকল গুণাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এতদ্ব্যতীত, তোমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত যে, তিনি কোন মানুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি, কোন বই পুঁথি পাঠ করেননি, সাধারণ নিয়মে লেখাপড়া শেখেননি এমনকি ৪০ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে কোনদিন তিনি নবুওয়্যত ও রেসালতের কথাও বলেননি।[২]

(২) তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর হলো তখন তিনি নবুওয়্যত লাভ করলেন এবং তাঁর রসনা থেকে জ্ঞানের এমন সব কথা প্রকাশিত হলো যা পৃথিবীতে আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতদ্ব্যতীত, তিনি পূর্বকালের নবীগণের যে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন তা তাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহে রয়েছে, যা তিনি কোনদিন পাঠ করেননি। অতএব বুদ্ধিমান মাত্রই একথা বিশ্বাস করে যে, তাঁর নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ না আসলে তথা তিনি আল্লাহ্ পাকের সত্য নবী না হলে এসব কথা কোনদিন বলতে পারতেন না।

(৩) এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নবুওয়্যতের কথা প্রকাশ করলেন, তখন একদিকে সারা আরব তাঁর বিরোধিতা করল, অন্যদিকে নবুওয়্যতের কথা পরিত্যাগের বিনিময়ে তাঁকে আরবের সবচেয়ে বড় ধনী হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে আরবের রাজত্ব কবুল করার আহবানও জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি সম্পদ এবং ক্ষমতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি, বরং অল্পে-তুষ্টির মহান আদর্শ পেশ করেছেন এবং কঠিন কঠোর বিপদের মোকাবেলা করেছেন ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে, সম্পদশালী হওয়ার স্থলে দারিদ্র-পীড়িত থাকা তিনি পছন্দ করেছেন।

আর যখন আল্লাহ্ পাক ইসলামকে বিজয় দান করেছেন, সারা আরব তাঁর কর্তৃত্বাধীন হয়েছে তখনও তাঁর জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। তিনি পূর্বের ন্যায় তখনও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন, দারিদ্র্যকে তিনি বিদায় দেননি, আল্লাহ্ পাকের দিকে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছেন, ক্ষণিকের তরেও ভোগ ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি, এতে একথাই প্রমাণিত ও প্রতিভাত হয় যে, তিনি ছিলেন সত্য-সাধক, তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক, তিনি ছিলেন সততা ও আমানতদারীর জীবন্ত আদর্শ।

এতদ্ব্যতীত যে কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তথা পবিত্র কোরআন তার মধ্যে রয়েছে তওহীদ এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ও পবিত্রতা অর্জনের, সত্য ও

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪,পৃষ্ঠা-১১২-১৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৮

ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার, পরকালীন জিন্দেগীর প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান, এবাদত বন্দেগীর পদ্ধতির বিবরণ, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তা'লীম, এসবের মধ্যে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আর একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের তথা পৃথিবীর কি অবস্থা ছিল? মূর্খতা বর্বরতা ছিল সর্বত্র বিরাজমান, স্বহস্তে প্রস্তুত মূর্তিপূজা ছিল আরববাসীর ধর্ম। হত্যা, মারামারি, চুরি ডাকাতি ছিনতাই ছিল এ সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তখনকার মানুষ ছিল অপমানিত, লাঞ্ছিত, এমনকি তারা ছিল মানবতার কলংক।

অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কারণে তাদের জীবনে আসে এক অভূতপূর্ব ইন্‌কেলাব, সাধিত হয় বিস্ময়কর বিপ্লব, যারা ছিল পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত তারাই হলেন সমগ্র মানব জাতির জন্যে দিশারী, যারা ছিল অপমানিত, লাঞ্ছিত তারাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যে লাভে ধন্য হওয়ার কারণে হলেন সর্বাধিক সম্মানিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। এল্‌ম, তাকওয়া পরহেযগারী এবং এবাদত বন্দেগীতে তারা হলেন অতুলনীয়। আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কারণে, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি এহ্‌সান করেছেন যখন তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হতে"।

এতদ্ব্যতীত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিয়ে গৌরব করতো মুশরেক, ইহুদী নাসারা সকলেই। এবং ইহুদীরা গৌরব করতো মূসা (আঃ)-কে নিয়ে, আর নাসারারা গৌরবান্বিত ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে। এমনিভাবে ইহুদী নাসারা জাতি গৌরব করতো যথাক্রমে তৌরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে।

কিন্তু তাদের মোকাবেলায় আরবদের নিকট তেমন কিছুই ছিলনা। অতঃপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হলো তখন আরব জাতি পৃথিবীর সকল জাতি সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করলো। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন, তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। অতএব, সকল জাতির চেয়ে অধিকতর সম্মানিত হলো আরব জাতি এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হলো উম্মতে মোহাম্মদিয়া। আর এটিই হলো مِنْ اَنْفُسِهِمْ শব্দটির তাৎপর্য।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

এ আয়াতের প্রারম্ভে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রতি তথা সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান এবং বিরাট অনুগ্রহ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব। আলোচ্য বাক্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ৪টি কার্যক্রমের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

(১) তাঁর একটি কাজ হলো এই যে, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করতেন, আর আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। অতএব, মাটির মানুষকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দিতেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

وَيُزَكِّيْهِمْ

(২) অর্থাৎ তিনি তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিতেন। মূলতঃ মানুষের মধ্যে দুটি চরিত্র বিদ্যমান থাকে। একটি ফেরেশতা চরিত্র, আরেকটি শয়তানী চরিত্র। আমরা কথাটিকে এভাবেও বলতে পারি একটি হলো সুকুমার বৃত্তি, আর একটি হলো কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তির কারণে মানুষ হিংস্র পশুর মত আচরণ পালন করে। মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যায় অনাচার, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার-ব্যাভিচার, লোভ-লালসা এসবই কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। আজকের পৃথিবীর মানুষ এ কুপ্রবৃত্তির শিকার। আধুনিক বিশ্বে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী মারণাস্ত্র তৈরীতে ব্যস্ত, কোটি কোটি ডলার মানব জাতির ধ্বংসযজ্ঞে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে ব্যয় হচ্ছে, অথচ মানুষের আত্মাকে যদি পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা যায়, যদি মানবাত্মাকে কলুষতা থেকে স্বচ্ছ, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন তথা মুক্ত করা যায় তবে এই মানুষই সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে ওঠে এবং তার মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা, পরোপকার, ন্যায় বিচার তথা মানব কল্যাণের যাবতীয় গুণাবলী সৃষ্টি হয়। মানব কল্যাণের এই মহা উপকারী কর্মসূচী নিয়েই আগমন করেছেন আল্লাহর নবী রসূলগণ। নবীগণের দলপতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নবুওয়্যত লাভের পর যে তেরটি বছর অতিবাহিত করেছেন তাতে তিনি মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং পরিচ্ছন্ন করার কাজেই অতিবাহিত করেছেন। ফলে যারা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরা সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্যে শিক্ষক হিসেবে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। মানুষকে সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে তোলার এ দায়িত্বকেই বোঝানো হয়েছে وَيُزَكِّيْهِمْ বাক্য দ্বারা।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

(৩) অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা দান করেন। পবিত্র কোরআনে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

(৪) الحِكْمَةَ। তিনি মোমেনদেরকে হেকমত শিক্ষা দিয়েছেন তথা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের গভীর তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অর্পিত এ দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন করেছেন বলেই মুসলিম জাতি বিশ্বের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান এবং উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে কোন দিন আসেনি, আর কোন দিন আসবেও না, তাঁরা ছিলেন অনন্য-সাধারণ। তাঁদের গুণাবলী বর্ণনাতীত আর তা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংসর্গ লাভের ফলশ্রুতি। তাঁকে প্রেরণ করে আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমের তথা সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি অসামান্য অনুগ্রহ করেছেন।

اَوَ لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ওহোদের যুদ্ধের বর্ণনা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমের প্রতি অসামান্য অনুগ্রহ করেছেন।

আর এ আয়াতে ওহোদের প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন তাদের মুখে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল যে, এ বিপদ কোথা থেকে আসলো? আমরাতো জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আছি। আল্লাহ পাকতো আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এ বিপর্যয় কেন আসলো? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমাদের কি এই ধারণা যে, অকারণেই ওহোদের যুদ্ধের এ বিপর্যয় এসেছে? তোমরা কি ভুলে গেলে যে, বদরের যুদ্ধে তোমরা শত্রু পক্ষকে এর চেয়ে দ্বিগুণ আঘাত হেনেছিলে। তখন তোমরা কাফেরদের ৭০ জনকে হত্যা করেছিলে, আর ৭০ জনকে বন্দী করেছিলে। ইচ্ছা করলে তোমরা সেই ৭০ জনকেও

১। হেকমতের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে তফসীরে নূরুল কোরআনের ৩য় খন্ড দ্রষ্টব্য।

হত্যা করতে পারতে। আর এই ওহোদ যুদ্ধেও এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত যে, এতে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছে কিন্তু পরাজয় হয়নি। যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানদেরই জয় হয়েছিল। মুসলমানদের হাতে ২০ জন কাফের নিহত হয়েছিল, আর শেষেও তোমাদের তরবারির মোকাবেলা করতে না পেরে কাফেররা মৃত্যু ভয়ে রণাঙ্গণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এমনি অবস্থায় এতবেশী ব্যথিত ও মর্মাহত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ

ওহোদের বিপর্যয়ের জন্য কে দায়ী?

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, ওহোদের যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের জন্যে মূলতঃ তোমরাই দায়ী। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অভিমত ছিল মদীনার ভেতর থেকে যুদ্ধ করা কিন্তু তোমাদের অতি উৎসাহের কারণে মদীনা থেকে বের হয়ে এসে যুদ্ধ করতে হলো।

দ্বিতীয়তঃ গিরি পথে মোতায়েন তীরন্দাজগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করে এবং তাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করে দুশমনের জন্যে পথ খুলে দেয়।

তৃতীয়তঃ বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে তোমাদের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল যে, ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দিতে পার। তবে একথা মনে রেখ, যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তবে আগামীতে তোমাদের ৭০ জন নিহত হবে। অথচ এরপরও তোমরা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ৭০ জন বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলে।

আল্লামা বগবী হযরত আলীর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললেনঃ মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হয়নি। তবে আগামীতে এ বন্দীদের সমান সংখ্যক মুসলমান শহীদ হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাটি মুসলমানদেরকে অবগত করলে তারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ বন্দীরা আমাদেরই গোত্রীয় লোক, আমরা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেব এবং তাদের সমান সংখ্যক লোক আমাদের তরফ থেকে শাহাদাত বরণ করবে। আমরা এর উপর সন্তুষ্ট রয়েছি। বস্তুতঃ ওহোদের যুদ্ধের দিন পূর্ব ঘোষিত এ সত্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, এতে বিস্ময় প্রকাশ করার বা ব্যথিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৬-০৭

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন যদি তোমরা সুদৃঢ় এবং অবিচল থাক এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও, আর যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানী কর তবে আল্লাহ পাক সাহায্য নাও করতে পারেন।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর তবে তোমরা তাঁর সাহায্য লাভে হবে ধন্য। আর যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও তবে তোমাদের অপমান সুনিশ্চিত। ওহোদের ঘটনা তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হলো মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেয় এ মর্মে যে, ওহোদের ঘটনায় তোমরা নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যে কোন সময় তোমাদেরকে বিজয়ী করতে পারেন।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সাহায্য করতেও পারেন আর ইচ্ছে হলে সাহায্য নাও করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[৪]

আর এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন যে, এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি হলে তিনি তোমাদেরকে বিজয় দান করতে পারেন অথবা বিজয় থেকে বঞ্চিত করতেও পারেন।[৫]

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ

আর ওহোদের যুদ্ধের দিন তোমরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছ তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছ, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, জয় পরাজয় সবই তাঁর হাতে, তিনি যখন ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন অথবা পরাজিত করেন। তোমাদের মধ্যে কে খাঁটি এবং প্রকৃত মোমেন আর কে মুনাফেক তার সঠিক পরিচয় জন সমক্ষে প্রকাশ করা এ বিপর্যয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৭
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৭
৪। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০
৫। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

মুসলমানদের সঙ্গে মুনাফেকরাও মিলে মিশে থাকতো, তারা ঈমানের দাবীদার ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ছিল না। তাদের সম্বন্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা ছিল এ বিপর্যয়ের কারণ। আল্লাহ্ পাক জানতেন যে, তারা মোমেন নয় মুনাফেক কিন্তু মুসলমানগণ এ সম্পর্কে অবগত ছিল না। ওহোদের যুদ্ধের এ বিপর্যয়ের মাধ্যমে মুনাফেকদের মুখোশ খুলে গেল, তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাদের সম্পর্কে সর্তকতা অবলম্বন করা সম্ভব হলো।

وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ওহোদ রণাঙ্গণে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মুনাফেকদের দলপতি আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল তার দলবল নিয়ে পিছটান দিয়েছিল, তাকে পলায়নপর দেখে বলা হলো তুমি কোথায় যাও? যদি প্রকৃত মোমেন হও তবে আল্লাহর রাহে জেহাদ কর, ঈমানের প্রমাণ উপস্থিত কর, আর যদি তা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় অন্তত আমাদের সাথে থেকে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য কর এবং দুশমনকে প্রতিরোধ করার কাজে এগিয়ে এস। যদি দ্বীন ইসলামের খাতিরে লড়াই করতে ইচ্ছুক না হও তবে অন্ততঃ জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের পরিচয় দাও বা নিজেদের হেফাজতের প্রয়োজনেও শত্রুদের প্রতিরোধ কর, দুশমনের মোকাবেলা কর, কিন্তু মুনাফেক দলপতি আবদুল্লাহ এবনে উবাই বললোঃ

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ

যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ হলেতো অংশ গ্রহণ করবো। যদি আমরা বুঝতাম সত্যিই লড়াই হবে তবে আমরা তোমাদের সঙ্গী হতাম। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো এ কোন্ ধরণের যুদ্ধ? শত্রুদের তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যের মোকাবেলায় এক হাজার নিরস্ত্র-প্রায় মানুষ। একে যুদ্ধ বলা যায় না, প্রকৃত অবস্থা হলো এই, এ হলো আত্ম হত্যা, জেনে শুনে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া, এ আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব, আমরা এমন নির্বোধ হতে রাজী নই।[১]

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, যদি আমরা বুঝতাম লড়াইটি আমাদের সঙ্গে তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। কিন্তু এ লড়াই হলো তোমাদের এবং পৌত্তলিকদের। তাই এ লড়াইতে আমরা নেই।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, যদি আমরা রণকৌশল সম্পর্কে কিছু জানতাম তবে এ যুদ্ধে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াতাম।[২] মূলতঃ কোন কাজে যদি মানুষের

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৮

মন প্রস্তুত না হয় তবে সে নানা বাহানা খুঁজে বেড়ায়। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলও ওহোদের যুদ্ধের সময় এমনিভাবে বাহানার আশ্রয় নিয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করেছিল।

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ

অর্থাৎ এ মুনাফেকরা ঈমান অপেক্ষা বেঈমানীর অধিকতর নিকটতম। কেননা তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে মুসলমানের ক্ষতি সাধনে তৎপর রয়েছে। ওহোদের যুদ্ধের এ কঠিন মুহূর্তে মুনাফেকদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়। তারা যে শুধু মৌখিক ইসলামের দাবীদার কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ– তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই, মুখে তারা ইসলামের কথা প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে থাকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা, এটি হলো মুনাফেকদের সাধারণ অবস্থা। অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস কামনা করে, আর মুখে মুসলমানদের দরদী সাজে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ তারা অন্তরে যেসব কথা গোপন রাখে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত যা দুনিয়ার কোন মানুষ জানে না, আল্লাহ পাক তার সবকিছুই জানেন। মুনাফেকরা গোপনে ইসলামের শত্রু, আর প্রকাশ্যে ইসলাম দরদী- এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, তাদের শাস্তি অবধারিত।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا
لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ
اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ
يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾

তরজমা

(১৬৮) মুনাফেকরা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলতো, যদি তারা আমাদের কথা মেনে চলতো তবে তারা নিহত হতো না। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের এ দাবীতে সত্যবাদী হও তবে নিজেদের মৃত্যুকে দূরীভূত কর।

(১৬৯) যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাদের সম্পর্কে কোন দিনও এ ধারণা করোনা যে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে।

(১৭০) তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে যা দান করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং সে সব লোকদেরকে সংবাদ দিচ্ছে যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, এই সুসংবাদ যে তারা যেন ভীত ও চিন্তিত না হয় তথা নির্ভিক চিত্তে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণে প্রস্তুত হয়।

তফসীরুল কোরআন

যারা ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিমুখ হয়েছে এবং কাপুরুষের ন্যায় ঘরে বসে রয়েছে তথা মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের নেতৃত্বে ওহোদের রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে সরে এসেছে তারা মুসলমানদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যেহেতু ৭০ জন মুসলমান এ জেহাদে শাহাদাত বরণ করেছেন তাই মুনাফেকরা তাঁদের সম্পর্কে নসিহত খয়রাত করে আনসারী মুসলমানদেরকে বলেছেঃ যদি তারা আমাদের কথা শুনতো তবে অন্ততঃ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেত। যেভাবে আমরা রণাঙ্গন থেকে দূরে বাড়িতে বসে রয়েছি তেমনি তারাও আমাদের ন্যায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেত। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দি,ন ঘরে বসে থাকলেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমাদের মৃত্যুকে তোমরা প্রতিরোধ কর অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান অবশ্যই কার্যকর হবে, মৃত্যুকে কেউ ঠেকাতে পারে না, আর জীবনকেও কেউ ধরে রাখতে পারে না। জীবন যেমন সত্য তেমনি মৃত্যুও সত্য। মৃত্যুর আক্রমণ থেকে যখন কোন অবস্থাতেই রেহাই পাওয়া যায় না, তখন কাপুরুষের মত ঘরে বসে মৃত্যু বরণের চেয়ে বীরের ন্যায় রণাঙ্গনে মৃত্যু বরণই গৌরবের বিষয়। আমাদের এ জীবন আল্লাহ পাকেরই দান। অতএব, মহান দাতা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবন সাধনার সাফল্য। তাই শহীদানের ফজিলত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা।

শানে নুযুল

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম তিরমিজী (রঃ) একখানি হাদীসে সংকলন করেছেন। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত অবস্থায় ছিলাম। আমাকে এ অবস্থায় দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে যাবের! তোমাকে আমি চিন্তিত কেন দেখছি? আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন, আর তাঁর সন্তানও রয়ে গেছে। তাঁর কিছু ঋণও রয়েছে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দেব না? যে আল্লাহ পাক তোমার পিতাকে কিভাবে সাক্ষাত দান করেছেন? আমি আরজ করলামঃ অবশ্যই এরশাদ করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক যার সঙ্গেই কথা বলেন তা পর্দার আড়াল থেকেই বলেন। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে তাঁর মুখোমুখি কথা বলেন এবং এরশাদ করেনঃ হে আমার বন্দা! তোমার আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট পেশ কর, আমি তোমাকে দান করবো। তখন তোমার পিতা আরজ করলোঃ হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে পুনঃজীবন দান করুন, যেন আমি আপনার পথে পুনরায় প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ পূর্বেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে মৃত্যুর পর কেউ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর শহীদদের ফজিলত সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, হাকেম এবং বগবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, ওহোদের দিন যখন আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ শাহাদাত বরণ করে তখন আল্লাহ পাক তাদের রূহ সমূহকে সবুজ বর্ণের পাখীদর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। এ পাখিগুলো জান্নাতের নহর সমূহে অবতরণ করে তথা ঐ নহর সমূহ থেকে পানি পান করে। জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করে থাকে। অতঃপর আরশের ছায়া তলে প্রত্যাবর্তন করে স্বর্ণ নির্মিত কেন্দিল সমূহে প্রবেশ করে যা আল্লাহর আরশের নিম্নদেশে ঝুলন্ত রয়েছে।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪৬

শহীদগণ যখন তাদের জন্যে রক্ষিত অগণিত নেয়ামত সমূহ দেখে তখন তারা আক্ষেপ করে বলে, যদি আমাদের সম্প্রদায় এ নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে অবগত হতো যা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন তবে তারাও জেহাদের জন্যে অনুপ্রাণিত হতো। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেঃ আমি তোমাদের একথা তোমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছে দেব। একথা শ্রবণ করে শহীদগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

এবনুল মুনজের (রাঃ) হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যে, হযরত হামজা (রাঃ) এবং তাঁর সাথী যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত যা শহীদদেরকে প্রদান করা হয়েছে দেখে বলেছিলেন যে, আল্লাহ পাক যে সম্মান, মর্যাদা এবং নেয়ামত সমূহ আমাদেরকে দান করেছেন তার খবর যদি আমাদের ভাইদেরকে দেয়া যেতো তবে কত ভাল হতো! তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, আমি তোমাদের ভাইদের নিকট তোমাদের কথা পৌঁছে দেব তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে যে, শহীদানের আত্মীয়-স্বজনরা যখন দুনিয়াতে কোন নেয়ামত লাভ করতো তখন নিজ নিজ আত্মীয়দের জন্যে আক্ষেপ করে বলতো, আফসোস! যদি আজ অমুক থাকতো তবে আমাদের সঙ্গে আজ এ নেয়ামত সেও ভোগ করতে পারতো। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এর অর্থ হলো কেউ যেন একথা মনে না করে যে, শহীদগণ মৃত্যু বরণ করেছে বরং তারা চিরঞ্জীব হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের নিকট তারা অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে, এ আয়াতে সেই মুনাফেকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা বলেছিল যে, মুসলমানগণ যদি আমাদের কথা মেনে চলত এবং আমাদের ন্যায় ঘরে বসে থাকত তবে অন্তত মৃত্যু মুখে পতিত হতো না। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তারা আদৌ মৃত নয়, বরং তারা জীবিত। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে রিযক প্রদান করা হয়।[১]

আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ)-এর ভাষ্য

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বদর এবং ওহোদের শহীদানের সম্পর্কে কেননা, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন তারাই ছিলেন শহীদ। যেহেতু মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে জেহাদ থেকে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৯-১০

বিরত রাখার চেষ্টা করতো এবং মৃত্যুর ভয়ে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতো তাই আলোচ্য আয়াতে শহীদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা জেহাদ থেকে বিরত থাকে তারা দুনিয়ার নেয়ামত লাভ করতেও পারে, নাও করতে পারে। যদি নেয়ামত লাভ করেও তবে তা আখেরাতের নেয়ামতের মোকাবেলায় অতি সামান্য এবং তুচ্ছ, আর যারা জেহাদে অংশ গ্রহণ করে তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য হয়, আর এ নেয়ামত এ জীবন ও জগতে কল্পনাতীত।[১]

শহীদ অমর

بَلْ اَحْيَآءٌ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে তারা মৃত নয়, বরং জীবিত। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ আলমে বরযখে শহীদদেরকে এক বিশেষ প্রকার জিন্দেগী প্রদান করা হয়, যা আলমে বরযখের অবস্থা মোতাবেক হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ শহীদগণ জীবিত, এর অর্থ হলো তারা সবুজ বর্ণের পাখী হয়ে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আর আল্লামা বগবী লিখেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে শহীদানের রুহ আরশের ছায়া তলে আল্লাহ পাকের দরবারে রুকু ও সেজদা করতে থাকবে।

হযরত তালহা এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি জঙ্গলে আমার উষ্ট্রের সন্ধানে গিয়েছিলাম, রাত হয়ে যাওয়ার কারণে আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে হারামের কবরের নিকট অবস্থান করলাম, রাত্রে আমি কবর থেকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করলাম, এত মধুর কণ্ঠের আওয়াজ আমি আর কোন দিন শ্রবণ করিনি, ঐ জঙ্গল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে আবদুল্লাহ ছিল তুমি জাননা, আল্লাহ পাক শহীদদেরকে ইয়াকুত পাথরের কেন্দিলে রেখে দিয়েছেন, যখন রাত হয় তখন তাদের রূহ ফেরত দিয়ে দেয়া হয়, দিনের বেলায় পুনরায় সেই কেন্দিলে প্রত্যাবর্তন করানো হয়। আর এজন্যেই শহীদের দেহ কবরের মধ্যে বিনষ্ট হয় না। আর জমিন তাকে হজম করতে পারে না, শহীদদের জীবিত থাকার এটিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৩]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৯
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-১৬৫
৩। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১১

শহীদের দেহ যে অবিকৃত থাকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর আমলে যখন ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে নহর তৈরী করেন, আমরা আমাদের শহীদ আত্মীয়-স্বজনের মাজারের নিকট হাযির হই এবং তাঁদের দেহ কবর থেকে বের করি। দেহের অবস্থা এত তাজা ছিল যেন জীবিত মানুষের দেহ। হযরত যাবের (রাঃ)-এর পিতার লাশ এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে তাঁর হাতটি দেহের জখমের উপরে রাখা ছিল, জখম থেকে হাত সারানো হলে রক্ত ঝরতে শুরু করে। এমনি অবস্থায় হাতটি পুনরায় জখমের উপর রাখা হলে রক্ত বন্ধ হয়। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি আমার পিতাকে কবরের মধ্যে এমন অবস্থায় দেখেছি যেন তিনি নিদ্রিত আছেন। আর যে কম্বল দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল তাও পূর্বের ন্যায়ই ছিল। অথচ এ ঘটনা তাঁদের শাহাদাতের ৪৬ বছর পর হয়েছে। নহর তৈরী করার সময় একজন শহীদের পায়ে কোদালের আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ থেকে তাজা রক্ত ঝরতে থাকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ এরপর শহীদদের জীবিত থাকার ব্যাপারে কারো সন্দেহ করার কারণ থাকতে পারেনা। বর্ণিত আছে যে, শহীদানের মাজারের পার্শ্বে মাটি কাটার সময় মাজার থেকে কস্তরীর সুগন্ধ আসতো।

আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত ওবায়েদ এবনে ওমায়রের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ওহোদের রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত মাসআব এবনে ওমায়রের (রাঃ) পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি ওহোদের রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর জন্যে তিনি দোয়া করেন এবং এরশাদ করেন যে, আমি সাক্ষ্য দেই, কেয়ামতের দিন এরা সকলে আল্লাহ্ পাকের নিকট শহীদের মর্তবা লাভ করবে। তোমরা তাঁদের নিকট হাযির হয়ে তাদের জেয়ারত করো এবং তাদেরকে সালাম দিও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, কেয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাঁদেরকে সালাম করবে তারা অবশ্যই তার সালামের জবাব দেবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মাসআব এরনে ওমায়রের (রাঃ) নিকট গমন করেন, তিনি শহীদ অবস্থায় পড়েছিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

এরপর এরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি, তোমার চেয়ে সুন্দর পোষাক পরিধানকারী এবং সুন্দর চুল বিশিষ্ট কোন লোক মক্কায় ছিল না, আর আজ তোমার এ অবস্থা যে তোমার দেহকে বিভিন্ন খণ্ডে কর্তন করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে শহীদের এ উচ্চ মর্তবা আর কেউ কি পেতে পারে? তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এর জবাব দিয়েছেন যে হ্যাঁ পেতে পারে। আবু দাউদ শরীফ এবং নেসায়ী শরীফে হযরত ওবায়েদ এবনে খালিদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' জন মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তন্মধ্যে একজন আল্লাহ্র রাহে শহীদ হলেন। এক সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ব্যক্তিরও এন্তেকাল হলো, তাঁর নামাযের জানাযা আদায় করা হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি দোয়া করেছ? তাঁরা বললেন আমরা দোয়া করেছি যেন আল্লাহ্ পাক তাকে মাগফেরাত দান করেন, তাঁর প্রতি দয়া করেন এবং তাঁর শহীদ সাথীর মর্তবায় তাঁকে পৌঁছে দেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ শহীদদের বিদায় গ্রহণের পর এ ব্যক্তি যে নামাজ রোজা করেছে তার সওয়াব কোথায় যাবে? তাদের দু' জনের মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যে পরে এন্তেকাল করেছে তার অধিক আমলের কারণে সে উচ্চতর মর্তবার অধিকারী হবে।[১]

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

এবনে শাইবা (রঃ), আহমদ (রঃ) এবং মুসলিম (রঃ) এবং এবনুল মুনজের (রঃ) মসরুকের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদের (রাঃ) নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি বলেনঃ আমরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি এরশাদ করেছেন ঃ শহীদানের রুহ্ সবুজ পাখীর মধ্যে থাকে, এ পাখীগুলোর জন্যে স্বর্ণ নির্মিত কেন্দিল রয়েছে যা আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত রয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে পারে। অতঃপর তারা নিজেদের কেন্দিলে ফিরে আসে। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কোন কিছুর প্রার্থনা কর? এভাবে প্রতিদিন তিন বার এ প্রশ্ন করা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ যদি তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকে তবে আমার কাছে চাও, তখন তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আর কি চাইব– আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারি। যখন তারা উপলব্ধি করে, আল্লাহর মর্জি হলো কিছু চাওয়া তখন তারা আরজ করে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের আরযী হলো এই যে আমাদের রুহকে আমাদের দেহে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হোক, যাতে করে আমরা আরেকবার

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড–২, পৃষ্ঠা–৪১১-১২

তোমার পথে জেহাদ করি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ ইতিপূর্বে এই ঘোষণ হয়েছে যে, দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করানো হবে না। যখন আল্লাহ পাক লক্ষ্য করেন যে, এছাড়া তাদের আর কোন আরযী নাই, তখন তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দেন।[১]

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ

অর্থাৎ শহীদগণ তাদের পরিবারবর্গের লোকদের সম্পর্কে সুসংবাদ পাবে যে তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন ঃ এ আয়াতের অর্থ হলো শহীদদের আত্মীয়-স্বজন যারা শাহাদাতের মর্তবা পায়নি তাদের ব্যাপারে শহীদগণ সুসংবাদ পাবে এবং আনন্দিত হবে। কেননা, আল্লাহ পাক শহীদদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ শহীদ তার পরিবারের ১০ জনের জন্যে সুপারিশ করবে। এই হাদীস হযরত ওবায়দা এবনে সায়েদ থেকে বর্ণিত এবং আহমদ এবং তেবরানীতে সংকলিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন প্রথম আম্বিয়ায়ে কেরাম শাফাআত করবেন। অতঃপর ওলামায়ে কেরাম। এরগর শহীদগণ সুপারিশ করবেন।[২] বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দরদা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন আবু দাউদ (রঃ) এবং এবনে হাব্বান (রঃ)।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেনঃ আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক শহীদ তার ৭০ জন আপন লোকদের সম্পর্কে সুপারিশ করবেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিজী (রঃ) এবং এবনে মাজাহ (রঃ) যা বর্ণনা করেছেন মেকদাদ এবনে মাদী কারব (রাঃ)।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৪৫
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১৪

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾
فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

তরজমা

(১৭১) আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দান ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে, আর তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ পাক মোমেনদের প্রাপ্য ও প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

(১৭২) আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদের জন্যে রয়েছে মহান পুরস্কার।

(১৭৩) তাদেরকে লোকেরা যখন বললো (তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে) বহু লোক সমবেত হয়েছে। অতএব, তাদেরকে তোমাদের ভয় করা উচিত। অতঃপর (মুনাফেকদের এসব কথা মুসলমানদের) ঈমানই বৃদ্ধি করেছে এবং তারা বলেছে আমাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট এবং কর্ম সম্পাদনায় তিনি অতি উত্তম।

(১৭৪) অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে ফিরে এসেছে। তাদেরকে কোন কষ্টই স্পর্শ করেনি। যে পথে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তারা সে পথেরই অনুসারী হয়েছে, আর আল্লাহ্ পাক মহান দানের অধিকারী।

তফসীরুল কোরআন

যাঁরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেন তাদের ভাগ্য কত সুপ্রসন্ন হয় তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়, বরং কল্পনাতীতও, তাই তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আল্লাহ

পাক তাঁর রাহে শহীদানকে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেন। শাহাদাতের প্রতিদান স্বরূপ যে সমস্ত নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশী এবং অনেক বেশী নেয়ামত লাভের কারণে তাদের আনন্দের অন্ত থাকে না। তারা সচক্ষে এ সত্য প্রত্যক্ষ করে যে, আল্লাহ পাক প্রকৃত ঈমানদারদের সাধনাকে কোন অবস্থাতেই ব্যর্থ করেন না। শহীদগণ তাঁদের নিজেদের সুখ-শান্তি, সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কথা চিন্তা করে– যদি তারাও এভাবে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে এমন অনন্ত অসীম নেয়ামতের অধিকারী হতো, তবে কত ভাল হতো! শহীদগণ নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের এমন উজ্জল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবে, যদি তাদের আত্মীয়-স্বজন শাহাদাতের দুর্লভ সুযোগ নাও লাভ করে, অন্ততঃ প্রকৃত ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে চির শান্তি ও চির সুখ লাভ করবে। তাই পরবর্তী আয়াতে একথার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের সওয়াব বা শুভ পরিণতি বিনষ্ট করেন না। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

"আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের সওয়াব বা প্রতিদান বিনষ্ট করেন না"।

মোমেনদের সওয়াব বিনষ্ট হয় না

মোমেনদের সওয়াব বিনষ্ট করার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম করুণার কারণে মোমেনদের সওয়াব শত শত গুণ বৃদ্ধি করে দেন।

এ পর্যায়ে হযরত আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জেহাদ করে আর আল্লাহর রাহে জেহাদের উদ্দেশ্যে ও আল্লাহর কলেমার সত্যতা প্রকাশের কারণেই সে ঘর থেকে বের হয় তবে আল্লাহ পাক তাকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন। যদি সে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করে তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করেন, আর যদি সে শাহাদাতের সুযোগ লাভ না করে তবে যে বাড়ী থেকে সে বের হয় সে বাড়ীকে সওয়াব এবং যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে আহত হবে, আর আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন কে আল্লাহর রাহে আহত হয় (আর কে নিজের নাম, যশ, খ্যাতির জন্যে আহত হয়)। যখন সে কেয়ামতের দিন হাযির হবে তখন তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে, বর্ণ হবে রক্তের, আর সুগন্ধ হবে কস্তুরীর। (বগবী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ শহীদ তার হত্যাকাণ্ডের কষ্ট এতখানি পায় যতখানি তোমরা পিপীলিকার দংশনে পাও। (দারমী, তিরিমিযী)

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মোমেনদের সওয়াব বিনষ্ট হবে না, সে শহীদ হোক বা না হোক এবং শহীদগণ মোমেনদের সৌভাগ্য দেখে আনন্দিত হবেন।[১]

কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ আয়াত "বীরে মাওনার" শহীদানের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এভাবে পেশ করেছেন, আমের এবনে মালেক এবনে জাফর আমেরী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং দু'টি অশ্ব ও দু'টি উষ্ট্রী হাদিয়া পেশ করলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার হাদীয়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এরশাদ করলেন ঃ আমি মুশরেকের হাদীয়া গ্রহণ করি না। যদি তুমি চাও যে, আমি তোমার হাদীয়া গ্রহণ করি তবে তুমি মুসলমান হও। কিন্তু সে মুসলমান হলোনা, আর ইসলামের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাবও প্রকাশ করলো না। সে বললো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন তা তো অত্যন্ত ভাল তবে যদি আপনার কিছু লোক নজ্‌দবাসীর নিকট ইসলামের এ দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তবে আমি আশা করি নজদবাসী এ দাওয়াত কবুল করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি নজ্‌দবাসী লোকদের তরফ থেকে আমার লোকদের ব্যাপারে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করি। সে বললো, আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুনজের এবনে ওমর সাঈদীর নেতৃত্বে ৭০ জন আনসার সাহাবীকে নজ্‌দবাসীর নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদানের লক্ষ্যে প্রেরণ করলেন। তাদেরকে "ক্বারী" বলা হতো। কেননা তাঁরা সকলেই কোরআনে করীম তেলাওয়াত করতেন এবং কোরআনে করীমের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম হযরত আমের এবনে ফোহায়রা ছিলেন। পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের এ পবিত্র দলটি হিজরী চার সনের সফর মাসে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁরা "বীরে মাওনা" নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান করেন এবং হযরত হারাম এবনে মালহান (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক চিঠি নিয়ে বনী আমেরের কিছু লোক

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১৫

সঙ্গে করে আমর এবনে তোফায়লের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত হারাম (রাঃ) সেখানে পৌছে তাঁর পরিচয় এভাবে পেশ করলেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পত্র বাহক হিসেবে তোমাদের নিকট এসেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল। অতএব, তোমরা এক আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন।

হযরত হারাম এবনে মালহান (রাঃ) তৌহিদের এই তবলীগ করার পর এক ব্যক্তি একটি বর্শা দ্বারা তাঁকে আঘাত করে এবং বর্শাটি তাঁর পেটে প্রবেশ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বের হলো। ঐ অবস্থায় হযরত হারাম এবনে মালহান (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ আল্লাহু আকবর! কা'বার প্রতিপালকের শপথ, আমি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি। অতঃপর আমর এবনে তোফায়েল চিৎকার করে বনী আমেরকে ডাকলো এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করলো, কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দিতে একথা বলে অস্বীকৃতি জানাল যে, আবু বরাহ তাদের নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার করেছেন তা বিনষ্ট করোনা। আমর এবনে তোফায়েল তখন বনী মলীন গোত্র, আসীয়া, রলি এবং জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রকে ডাকলো এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা সাহাবায়ে কেরামকে ঘেরাও করে এবং সাহাবায়ে কেরাম শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে দুশমনদের মোকাবেলা করে শাহাদাত বরণ করলেন। এভাবে হযরত কা'ব এবনে যায়েদ ব্যতীত আর সকলেই একে একে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আর তিনি এভাবে বেঁচে গেলেন যে, কাফেররা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে দিয়েছিল। তখনও তাঁর নিঃশ্বাস বাকী ছিল। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তারা আমর এবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে বন্দী করেছিল কিন্তু তিনি যখন বললেন যে, আমি মোজের গোত্রের লোক তখন আমর এবনে তোফায়েল তাঁকে ছেড়ে দিল। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলেন। তিনি বললেন যে, এ ঘটনাটি আবু বরাহর কারণেই হয়েছে, আবু বরাহ এ ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করে মনক্ষুন্ন হয়েছে। মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, আমের এবনে তোফায়েল বলেছিল এদের মধ্যে সে ব্যক্তি কে? যার মৃত্যুর পর তাকে আসমান ও জমিনের মধ্যখানে উঠিয়ে নেয়া হলো। আমার মনে হলো সে আসমানের উপরে, আর আসমান তার নিচে। লোকেরা বললোঃ তিনি ছিলেন আমের এবনে ফোহায়রা।

এ ঘটনার পর আবু বরাহর পুত্র রাবিয়া আমর এবনে তোফায়েলের উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। তবে আয়াতে শহীদানের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তা সকল শহীদের জন্যেই

প্রযোজ্য এ মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)।[১]

নেসায়ী এবং তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পৌত্তলিকরা যখন ওহোদ রণাঙ্গন থেকে ফিরে গেল তখন পরস্পর বলতে লাগলো যে তোমরা মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হত্যা করতে সক্ষম হওনি এবং মুসলমানদের মহিলাদেরকেও বন্দী করতে পারনি। অতএব ফেরত চল, পুনরায় হামলা করি। কাফেরদের এ পরামর্শের কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন এবং মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন, সকলে একত্রিত হলেন।

মোহাম্মদ এবনে আমরের বর্ণনা এই, যেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন সেদিন ছিল শনিবার। দুশমন মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এ আশংকায় খাযরাজ এবং আওস গোত্রের সর্দারগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহের প্রহরায় রাত অতিবাহিত করলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) ফজরের আজান দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি খবর দিল যে আবু সুফিয়ান রওহা নামক স্থানে পৌঁছে মদীনা শরীফ ফিরে আসার কথা বলে, কিন্তু তার সঙ্গী সাফওয়ান এবনে উমাইয়া এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। সে বলে যদি তোমরা ফেরত যাও তবে হয়ত তোমাদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হবে। কেননা খাযরাজ গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ সাফওয়ান যদিও সঠিক পথে নেই কিন্তু একথাটি সে অত্যন্ত সঠিক বলেছে। সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তারা ফিরে আসত তবে তাদের প্রতি গায়বী প্রস্তর বর্ষিত হতো এবং তারা হারানো দিনের মত হারিয়ে যেত। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন এবং বেলালকে হুকুম দিলেন যে, তুমি একথা ঘোষণা কর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দিয়েছেন, তবে আজ তারাই বের হবে যারা গতকাল ওহোদের রণাঙ্গনে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল।

হযরত ওসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) যাঁর দেহে ৯টি জখম ছিল তিনি চিকিৎসার কথা চিন্তা করছিলেন কিন্তু এ ঘোষণা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ আমি আল্লাহর রসূলের হুকুমে হাযির, চিকিৎসার জন্যে বিলম্ব না করে তিনি দরবারে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড–২, পৃষ্ঠা-৪১৫-১৭

নববীতে হাযির হয়ে গেলেন। হযরত তোফায়েল এবনে নোমানের দেহে ১৩টি জখম ছিল। খারাশ এবনে সম্মাহ (রাঃ)-এর দেহে ১০টি জখম ছিল। কা'ব এবনে মালেক (রাঃ)-এর ১০টির বেশী জখম ছিল এবং হযরত আতীয়া এবনে আমের (রাঃ)-এর দেহে ৯টি জখম ছিল। যাহোক, মুসলমানগণ আহত এবং রক্তাপ্লুত অবস্থায়ই পুনরায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমিও সঙ্গে চলি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, না। হযরত যাবের (রাঃ) হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আমাকে মহিলাদের হেফাজতের খেয়ালে রেখে গেছেন, সেজন্যে আমি গতকাল যেতে পারিনি। আমার পিতা বাড়ীর নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এজন্যে আমি বাধ্য হয়ে ওহোদ রণাঙ্গনে হাজির হতে পারিনি। অতএব, আজকের অভিযানে আমাকে শরীক হওয়ার অনুমতি দান করুন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। এতদ্ব্যতীত আর এমন কাউকে তিনি অনুমতি দেননি যে ওহোদ রণাঙ্গনে হাযির ছিল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৭০ জন লোক নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে বের হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ)। মদীনা শরীফ থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরা উল আসাদ নামক স্থানে তাঁরা অবস্থান করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছিলেন যে, দিনে তোমরা জ্বালানী সংগ্রহ কর এবং রাতে আগুন জ্বালিয়ে রেখ, তাঁর এ নির্দেশ মোতাবেক ৫০০ জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো। কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, ওহোদের যুদ্ধে যদিও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কিন্তু মুসলমানদের এখনও এমন শক্তি আছে যদ্বারা কাফেরদেরকে সঙ্গে লড়াই করা তাদের পক্ষে অতি সহজ। মাবাদ খাজাই নামক এক ব্যক্তি তখনও কাফের ছিল কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো। সে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা করে বললো ঃ গতকাল ওহোদের রণাঙ্গনে যা হয়েছে তজ্জন্যে আমরা দুঃখিত। এরপর সে রওহা নামক স্থানে গেল এবং আবু সুফিয়ানকে বললো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বের হয়েছেন, এত সৈন্য আমি কখনও দেখিনি। যারা সেদিন ওহোদের রণাঙ্গনে শরীক হয়নি তারাও আজ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা হয়ত এসে পড়লো, তোমরা এখান থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বেই তাদের অশ্বগুলো দেখতে পাবে। এ খবর শ্রবণ করে দুশমন সাহস হীন হয়ে গেল এবং অনতিবিলম্বে তারা মক্কার দিকে রওয়ানা হলো। কিছুক্ষণ পরই হামরাউল

আসাদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের বিদায় হয়ে যাওয়ার খবর দেয়া হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ পাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট আর কত উত্তম অভিভাবক তিনি"!

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হামরা-উল আসাদে সোম, মঙ্গল, বুধ তিন দিন অবস্থান করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

যারা ওহোদের যুদ্ধে দুশমনের আঘাতে ঘায়েল হওয়ার পরও আল্লাহ পাক ও তঁর রসূলের তরফ থেকে জেহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেক আমল ও পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, আয়াতে নেক কাজ করা এবং পরহেযগারী অবলম্বনের কথাটা হলো তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা মাত্র। কেননা যাঁরা আহত অবস্থায় জেহাদে শরীক হয়েছেন তারা অবশ্যই নেককার এবং পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বদরে সোগরা সম্পর্কে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওহোদ থেকে বিদায়ের সময় আবু সুফিয়ান বলেছিল ঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা আগামী বছর পুনরায় যুদ্ধ করবো (যদি আপনি এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর আবার তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। ঠিক এক বছর পর আবু সুফিয়ান দু' হাজার লোক নিয়ে মক্কা থেকে বের হয় এবং "মাররাজ জাহরা" নামক স্থানে এসে অবস্থান করে। কিন্তু আল্লাহ পাক তার অন্তরে মুসলমানদের ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে মুসলমানদের মুখোমুখি না হয়েই মক্কা প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে করে। নাঈম এবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হয়, সে বলে বর্তমানে আমাদের দেশে খরা চলছে। ফলে এ সময় যুদ্ধ করা বড় কঠিন কিন্তু যেহেতু আমি এ যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, তাই আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধ বাতিল করা ঠিক হবে না। তুমি আমার একটি কাজ কর। আমি তোমাকে দশটি উট পুরস্কার দেব, আর সেই দশটি উটের পুরস্কার আমি সোহায়েল এবনে আমরের নিকট জমা করে দেব। সোহায়েল তখন

বললো, আমি তোমাকে উট দানের দায়িত্ব নিলাম। নাঈম এবনে মাসউদ জিজ্ঞাসা করলো, কি কাজ করতে হবে বলো। তখন আবু সুফিয়ান বললো, তুমি মদীনায় গমন কর এবং মুসলমানদেরকে বল তোমরা মক্কার সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারবেনা, তারা অনেক বিরাট সৈন্য দল তৈরী করেছে। অতএব, তোমরা যুদ্ধে গমন করা থেকে বিরত হও। নাঈম মদীনা শরীফে এসে দেখলো যে মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই সে বললো ঃ তোমরা যদি এ যুদ্ধে যাও তবে কেউ ফিরে আসবে না। কোন কোন সাহাবীর মনে একথা শুনে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, আর মুনাফেক এবং ইহুদীরা এ খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও একথা শুনেছিলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! একথা চির নিশ্চিত যে আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁর নবীকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন, অতএব আমরা বদরে সোগরা সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছি তা রক্ষা করবো এবং আমরা সেখানে যাব। একথা শ্রবণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং এরশাদ করলেন শপথ! সেই আল্লাহর, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই যাব যদি কেউ সঙ্গে না যায় তবুও। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন কিন্তু দুশমন মোকাবেলায় হাযির হতে সাহস করলোনা। এ স্থানে জিলক্বদ মাসের এক তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত মেলা বসতো, কাফেররা মোকাবেলা করতে না আসায় মুসলমানগণ ব্যবসা করে লাভবান হলেন। তারা সাহসহারা হয়েছে তা প্রমাণিত হলো এবং মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সফল হলেন।[১] একথাটিকে আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا - الايه

অথাৎ মুসলমানদেরকে যখন লোকেরা বললো ঃ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যেই বহু লোক সমবেত হয়েছে অতএব তাদেরকে তোমাদের ভয় করা উচিত। কিন্তু মুনাফেকদের এসব কথা মুসলমানদের ঈমানই বৃদ্ধি করেছে এবং তারা বলেছে আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। মুসলমানগণ মুনাফেকদের কথায় কর্ণপাত করেননি, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। ফলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ পাক মহান দাতা,

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯৯
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৬-২৮

তিনি অনন্ত অসীম করুণাময়, তাঁর দানে ধন্য হওয়াই জীবন সাধনায় সাফল্য অর্জন করা; আর তা সম্ভব হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুসরণের মাধ্যমে।

আ'মালুল কোরআন

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمْ থেকে ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ পর্যন্ত আয়াত সমূহ কাগজে লিপিবদ্ধ করে আংটির নিচে রেখে দিলে এবং সে আংটি পরিধান করে কোন জালেম ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিকট গমন করলে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ পাক রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন বালা মসিবতে গ্রেফতার হয় সে যদি-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

"হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল নে'মাল মাওলা ও নে'মান্নাসীর"-এ দোয়াটি সর্বদা পড়তে থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তার বালা মসিবত দূর করে দেন।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ
لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

তরফমা

(১৭৫) তা শুধু এজন্যে যে, শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়, অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা-এবং শুধু আমাকেই ভয় কর। যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

(১৭৬) (হে রসূল!) যারা দ্রুতবেগে কুফর ও নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় সে সব লোকের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়, তারা কখনও আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এই যে তারা যেন আখেরাতে কোন অংশই না পায় এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

(১৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমানের পরিবর্তে আল্লাহ্র নাফরমানীকে ক্রয় করে নিয়েছে তারা আল্লাহ্ পাকের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(১৭৮) এবং কাফেররা যেন এই ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দেই তা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে (কেননা) আমি তো শুধু এজন্যে অবকাশ দেই যেন তাদের গুনাহ্ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে শয়তান অথবা তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তোমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে গুজব রটায় এবং শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে মোমেনদেরকে ভয় দেখায় যাতে করে মোমেনগণ কাফেরদের শক্তির কথা শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকে, তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

فَلَا تَخَافُوْهُمْ

হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে ভয় করোনা।

وَخَافُوْنِ

আর শুধু আমাকে ভয় করো। আমার বিধি-নিষেধ অমান্য করোনা। শক্তির মূল উৎস স্বয়ং আল্লাহ্ পাক অতএব, আল্লাহ্কেই ভয় করা উচিত যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও আর নিশ্চয় তোমরা মোমেন, অতএব তোমরা কাফেরদেরকে ভয় করোনা। ভয় করো শুধু আল্লাহ্ পাককে, আর যে আল্লাহকে ভয় করে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাকে ভয় করে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক শয়তান আখ্যা দিয়েছেন তাদেরকে, যারা মুসলমানদেরকে কাফেরদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতে শয়তান বলা হয়েছে নাঈম এবনে মাসউদকে। কেননা এ ব্যক্তি ছিল শয়তানের খাঁটি অনুসারী। যেভাবে শয়তান মানুষকে প্রতারণা করে ঠিক তেমনি সে মুসলমানদেরকে প্রতারণা করার অপচেষ্টা করছিল।[১]

১। তানবীরুল মেকবাস মীন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৯১

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, শয়তান তার নিজের আকৃতি নিয়ে হামলা করেনা, বরং সে কোন মানব রূপ ধারণ করেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে। তাদেরকেই বলা হয় "আওলিয়ায়ে শয়তান" বা শয়তানের বন্ধু। আর এদের নেতা ছিল নাঈম এবনে মাসউদ। ইমাম কুরতবী (রঃ)- ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

কেননা, নাঈম এবনে মাসউদই মদীনার মুনাফেকদের মাধ্যমে এ গুজব ছড়াবার চেষ্টা করে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব, তোমরা তাদের মোকাবেলায় যাবার চেষ্টা করোনা। কাফেরদের ব্যাপারে এ ভয় প্রদর্শন নিঃসন্দেহে শয়তানী কাজ। অতএব, যারা প্রকৃত মোমেন তারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবে না। জয় পরাজয় শুধু আল্লাহর হাতে, মুসলিম জাতি আল্লাহর বলে বলিয়ান।

শুধু আল্লাহকে ভয় করো

অতএব, আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করা মুসলমানের শানে খেলাফ। এ আয়াতে আল্লাহ পাক শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাগিদ করেছেন, যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব, তাকে শত্রুই মনে কর"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ঈমানের দাবী হলো শুধু আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় না করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যদি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ পাকের নিকট চাও, সাহায্য প্রার্থী হতে হয় তবে আল্লাহ পাকের দরবারে হও। মনে রেখো, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে যদি তোমাদের উপকার করতে ইচ্ছা করে তবে শুধু এতটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, সারা বিশ্বের মানুষ যদি তোমাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে তবে ততখানিই ক্ষতি করতে পারবে, যতখানি আল্লাহ পাক তোমাদের তকদীরে লিখে দিয়েছেন। তকদীর লেখা শেষ হয়ে গেছে, কলম তুলে ফেলা হয়েছে, কাগজ শুকিয়ে গেছে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), সংকলিত হয়েছে মসনদে আহমদ এবং তিরমিযী শরীফে।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ

১। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে রহমত স্বরূপ আমগন করেছেন, তাই তাঁর অন্তরে মানুষের জন্যে মায়া-মমতা ছিল অত্যন্ত বেশী। মানুষের গোমরাহী ছিল তাঁর নিকট অসহনীয়, মানুষকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় দেখলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত, মর্মাহত এবং দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হতেন। এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ (হে রসূল!) যারা দ্রুত বেগে কুফর ও নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় তাদের এ গোমরাহী এবং নাফরমানী আপনাকে যেন ব্যথিত, চিন্তিত এবং মর্মাহত না করে। কেননা, এরা দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। এরা নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনছে। মুনাফেকরা ইসলামের ক্ষতি সাধনের যত চক্রান্তই করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। তফসীরকারগণ লিখেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা দ্রুত বেগে কুফর ও নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় তারা হলো, মক্কার কোরায়শ অথবা মদীনার মুনাফেক। এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যেন তিনি মক্কার কাফের এবং মদীনার মুনাফেকদের অন্যায় আচরণে ব্যথিত ও মর্মাহত না হন। আল্লাহ পাকের তওফিক ব্যতীত কেউই ইসলাম কবুল করতে পারেনা, আর আল্লাহ পাকের মর্জি হলো এই যে, কাফের ও মুনাফেকরা যেন আখেরাতের নেয়ামতের কোন অংশ লাভ না করে। তাদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি। তারা হলো বদ নসীব বা ভাগ্যাহত সম্প্রদায়।[১] তাদের পরিণাম ভয়াবহ, তারা চির বঞ্চিত, তাদের শাস্তি অবধারিত।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

যারা ঈমানের বদলে কুফরকে ক্রয় করেছে (এতদ্বারা আহলে কেতাবের কথা বলা হয়েছে), যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো যে, তিনি আল্লাহ পাকের তরফ আগমন করবেন, কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন এবং তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করলেন তখন তারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ধন-সম্পদের লোভে এবং শুধু জেদ এবং হিংসার কারণে তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর এবং নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে। ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরেক, মুনাফেক– এক কথায় সকল বেঈমান একত্রিত হয়েও আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি, যা তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ ভোগ করবে।[২]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৫
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫০

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ

কাফেররা যদি মনে করে তাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে, অগণিত সুখ-সামগ্রী তারা ভোগ করে চলেছে। অতএব, তারা আল্লাহর প্রিয় তবে তা হবে তাদের ভুল ধারণা কেননা, এই সুখ-সম্পদ তাদের জন্যে অবকাশ মাত্র এবং তাদের চরম অকল্যাণ এবং শোচনীয় পরিণামের আয়োজন মাত্র।

اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا

অর্থাৎ আমরা তাদেরকে এজন্যে অবকাশ দেই যেন তারা নিশ্চিন্ত মনে পাপের ঘট্ পূর্ণ করে। তারা ধারণা করছে যে তারা অত্যন্ত সুখে এবং শান্তিতে আছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি এবং দুর্গতি।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের সম্পর্কে। আর আতা (রঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনা শরীফের বনী কোরায়জা এবং বনী নযিরের সম্পর্কে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হয় যে, সবচেয়ে ভাল মানুষ কে? তিনি এরশাদ করেন, যার বয়স অধিক হয় এবং আমল ভাল হয়। অতঃপর আরজ করা হয় সবচেয়ে মন্দ লোক কে? তিনি এরশাদ করেন ঃ যার বয়স বেশী অথচ আমল মন্দ। (আহমদ, তিরমিযী, দারমী)

হযরত আকাবা এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন তুমি দেখ যে, কোন পাপী ব্যক্তিকে তার পাপ কার্যে রত অবস্থাতেও আল্লাহ পাক তার দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন তবে তুমি উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন যার অর্থ হলো– "অতঃপর লোকেরা সে সব বিষয়ে ভুলে গেল যার নসিহত তাদেরকে করা হয়েছে। তখন আমি তাদের জন্যে আনন্দ উল্লাসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম এমনকি, যখন তারা প্রাপ্ত নেয়ামতের কারণে গর্ব করতে লাগল তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তারা বিস্মিত হলো"। এ আয়াতখানি সূরা আনআমের পঞ্চম রুকুতে রয়েছে। এর পূর্বের আয়াত সমূহে অতীতের কোপগ্রস্ত উম্মত সমূহের অবস্থা ও তাদের পাপাচারের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে রয়েছে তাদের শোচনীয় পরিণামের ঘোষণা।

তাদের শাস্তি এত হঠাৎ হয়েছে যে তারা এ বিষয়ে একটু চিন্তাও করার অবকাশ পায়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এ বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন কোথাও নাফরমানী সত্ত্বেও নেয়ামত প্রকাশ করা হয় তখন উপলব্ধি করতে হবে যে, এ ব্যক্তিকে কিছু দিনের জন্যে শুধু অবকাশ দেয়া হচ্ছে। এরপর যে কোন সময় হঠাৎ তার প্রতি আযাব আসতে পারে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ
الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ
وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ
يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ
هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ
مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

তরজমা

(১৭৯) আল্লাহ পাক অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক না করে তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না এবং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে গায়বী বিষয়ে অবহিত করবেন না। তবে তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা তিনি তাঁকে মনোনীত করেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

(১৮০) আল্লাহ পাক যাদেরকে স্বীয় দয়া ও মেহেরবানী স্বরূপ অর্থ-সম্পদ দান করেছেন তারা যেন কার্পণ্যকে তাদের জন্যে ভাল কাজ মনে না করে বরং তা তাদের জন্যে অত্যন্ত মন্দ কাজ। কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের এ কৃপণতার ধন-সম্পদ তাদের গলার হার হবে; আর আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক, আর আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে খবর রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে ওহোদের ঘটনার অবশিষ্ট বিবরণ রয়েছে অর্থাৎ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ৭০ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন, অতঃপর আহত অবস্থায় দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে যেতে হয়েছে। এরপর আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বদরে সোগরায় যাওয়ার জন্যে ডাক পড়েছে। এদিকে ওহোদের রণাঙ্গন থেকে মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা করেছে। এই সমস্ত কিছু হওয়ার পেছনে একটিই কারণ, তাহলো পবিত্র এবং অপবিত্রের মধ্যে তথা মোমেন এবং মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য করা। এ পার্থক্য হয়েছে যখন ঈমানদার হওয়ার কারণে মুসলমানগণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখন মুনাফেকরা সরে পড়েছে। মুসলমানগণ ঈমানের উপর সুদৃঢ় রয়েছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রাণ দিয়েছেন। আর এ বিপর্যয়ের মাধ্যমেই মুনাফেকদের মুনাফেকী এবং নাফরমানী প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের বিজয়ে মুসলমানগণ আনন্দিত হয়েছেন এবং মুনাফেকরা চিন্তিত হয়েছে। আর এভাবে কে মুনাফেক আর কে প্রকৃত মোমেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যারা এতদিন ইসলামের নাম বলে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করেছে এবং মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ওহোদের যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে তার পেছনে ছিল বিরাট হেকমত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ[১]

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ

(আল্লাহ পাক অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক না করে তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় রাখবেন না; বরং কে কাফের এবং কে মুনাফেক তা প্রকাশ করে দেবেন।)

কাফেররা যদি ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে তবে তা আদৌ আল্লাহর দরবারে তাদের প্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। ঠিক তেমনি যদি কোন প্রকৃত মুসলমান দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করে, বিপদাপদের সম্মুখীন হয় তবে তাও আল্লাহ পাকের অপ্রিয় হওয়ার দলিল নয়। মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফেক ইসলামের মুখোশ পরে মিলে মিশে ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১০

সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। অথচ তারা মুসলমান নয় কিন্তু অমুসলমান বলে তাদেরকে ঘোষণাও করা যায় না। আল্লাহ্ পাক এমন একটি অনিশ্চিত অবস্থায় মুসলমানদেরকে রাখতে চান না। তাই খাঁটি এবং ভেজাল, পবিত্র এবং অপবিত্র বা পবিত্র কোরআনের ভাষায় খবীস এবং তাইয়্যেবের মধ্যে পার্থক্য হওয়া দরকার, এ পার্থক্যের জন্যে হয় অগ্নি পরীক্ষা। অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমেই খাঁটি স্বর্ণ এবং খাদের পার্থক্য প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মুসলমানগণ বিভিন্ন সময় বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, মুনাফেকদের খাদ কলংক দূরীভূত হলে মোমেনদের সমুজ্জল চেহারা প্রতিভাত হয় এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন প্রকার বিপর্যয় বা অগ্নি পরীক্ষা ব্যতীতই আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারেন, তাদের নাম-ধাম এবং কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। কিন্তু এমনিভাবে গায়বী খবর সম্পর্কে অবহিত করা আল্লাহ্ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

এটি আল্লাহ্ পাকের নীতি নয় যে, তিনি গায়ব বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। মূলতঃ এজন্যেই মুসলমানদেরকে ওহোদের যুদ্ধে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারা প্রকৃত মুসলমান আর কারা মুনাফেক।

এলমে গায়ব

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

যদিও সাধারণতঃ মানুষকে গায়বী খবর সম্পর্কে অবহিত করা হয় না, কিন্তু তবু আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলগণের মধ্যে তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক তাঁর প্রিয় রসূলকে বিভিন্ন গায়বী খবর জানিয়ে দেন। যেমন মুনাফেকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছিলেন।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার সম্মুখে আমার উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। যেমন আদম (আঃ)-এর সম্মুখে তাঁর বংশধরদেরকে উপস্থিত করা হয়েছে। যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে এবং যারা ঈমান আনবে না তাদের সকলের কথা আমাকে জানানো হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা শ্রবণের পর মুনাফেকরা বিদ্রুপ করে বলেছে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দাবী করেছেন যে, এখনও জন্ম গ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে কে মোমেন হবে, আর কে কাফের হবে সে কথাও তিনি জানেন অথচ আমরাতো তাঁর সঙ্গেই রয়েছি আমাদের আসল পরিচয়ইতো তিনি জানেন না।

মুনাফেকদের এসব আস্ফালনের কথা অবগত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন এবং আল্লাহ পাকের হাম্‌দ ও সানা পেশ করে এরশাদ করলেন ঃ কিছু লোক আমার জ্ঞান সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে। তোমাদের এ যুগ থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যদি কোন কিছু জানতে চাও জিজ্ঞাসা করতে পার, আমি জবাব দিতে প্রস্তুত। ঠিক এমন সময় আবদুল্লাহ এবনে হোজায়ফা দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে ছিলেন?

তিনি এরশাদ করলেন ঃ হোজায়ফা। এরপর সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামের প্রতি সত্য ধর্ম হিসবে, পবিত্র কোরআনের প্রতি আল্লাহ পাকের কালাম হিসেবে এবং আপনার প্রতি আল্লাহর প্রিয়নবী ও রসূল হিসেবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আমাদেরকে মাফ করে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তোমরা কি বিরত হয়েছে? অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহর নবী কাফেরদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন কিন্তু তাঁর এল্‌ম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করানোর অনুমতি ছিলনা। তাঁর এল্‌ম ব্যক্তিগত ছিল, যা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত মানুষকে জানাবার অধিকার ছিল না।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন ঃ মক্কার কোরায়েশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল ঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি মনে করেন, যে আপনার বিরোধিতা করবে সে-ই দোযখে যাবে? আর আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন? পক্ষান্তরে যে আপনার অনুসরণ করবে সে জান্নাতাবাসী হবে এবং আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তাই হয় তবে আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন কে আপনার প্রতি ঈমান আনবে, আর কে ঈমান আনবে না। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। বস্তুতঃ অদৃশ্য জগতের খবর আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা। তবে যদি আল্লাহ পাক তাঁর নবী রসূলগণের মধ্যে বিশেষ কোন কথা জানিয়ে দেন তা তিনি জানাতে পারেন। আর যে কথা যতটুকু তাঁকে জানানো হয় ততটুকুই তিনি জানতে পারেন। আর একথা সত্য যে, সব নবীই গায়বী এল্‌ম রাখতেন না। এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত এরশাদ করেছেনঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৪-৩৫
খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৩-২৪

কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে মনোনীত করেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সকল নবীকে আল্লাহ পাক গায়বী এল্‌ম দান করেননি; বরং নবীদের মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে এজন্যে মনোনীত করেছেন; আর এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার। গায়বী রহস্য তিনি কাকে জানাবেন তা তিনিই জানেন। আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন ঃ এল্‌মে গায়ব বিশেষ কয়েকজন রসূলের বৈশিষ্ট্য।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে মনোনীত করেন এবং গায়বী খবর বিশেষভাবে তাঁকে দান করেন এভাবে যে, অমুক মোমেন অমুক মুনাফেক আর এ গায়বী খবর সাধারণ মানুষকে দেয়া হয়না। এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু এল্‌মে গায়ব আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার সাথে সংযুক্ত সেজন্যে কোন মানুষকে একথা বলা যায় না যে তিনি গায়বী এল্‌ম রাখেন; কিন্তু আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে কোন গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন যেগুলো কোরআন করীমে انباء الغيب বা গায়বী সংবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে, এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য; আর একথা সুস্পষ্ট যে, কোন গায়বী বিষয় সম্পর্কে যখন কোন মানুষ অবহিত হয় তখন আর তা গায়বী ব্যাপার থাকে না।

মোদ্দা কথা এই যে, আল্লাহ পাক সরাসরি সাধারণ মানুষকে গায়বী বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করেন না। তবে শুধু তাঁর মনোনীত রসূলগণের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা আল্লাহ পাক তাঁকে গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন, এটি নবীগণের সঙ্গে আল্লাহ পাকের বিশেষ ব্যবহার।

অতএব, এমন বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ এবং খাঁটি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর রসূলগণের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা। এ বিশ্বাস হতে হবে সম্পূর্ণ আন্তরিকতাপূর্ণ, নিখুঁত, নিখাদ। যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও তখন আরেকটি কর্তব্য হলো জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা তথা তাকওয়া পরহেযগারীর নীতি অবলম্বন করা। যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে যে সব শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে শুধু যে সেসব শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে তাই নয়; বরং তোমাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের মহান দান, বিরাট প্রতিদান বা শুভ পরিণতি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ- الايه

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৮

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জেহাদের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা ছিল, আর এ আয়াতে জেহাদের জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার মহান আদর্শ পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাহে দান করতে কার্পণ্য করে তাদের জন্যে এ আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে কঠিন কঠোর সতর্কবাণী। মুনাফেকরা মৌখিক ইসলামের দাবীদার হলেও জেহাদের সময় যেমন পলায়নপর থাকতো ঠিক তেমনি জেহাদের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারেও কার্পণ্য করতো। তাদের এ কার্পণ্য তাদের জন্যে হবে মহা বিপদের কারণ।

যাকাত আদায় না করার শাস্তি

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা যাকাত আদায় করতো না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যাকে আল্লাহ পাক ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর সে তার যাকাত আদায় করেনি তবে তার ধন-সম্পদ একটি বিষাক্ত সর্পে রূপান্তরিত হবে, যার চোখে দু'টি কালো দাগ থাকবে। কেয়ামতের দিন সে সাপটি ঐ ব্যক্তির গলায় লটকে যাবে এবং তার বাহু দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির নিকট উষ্ট্র, গাভী, মহিষ, বকরী থাকবে এবং সেগুলোর ফরজ যাকাত সে আদায় না করে তবে এ জন্তুগুলো কেয়ামতের দিন তাকে আঘাত করবে, পদদলিত করবে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে মানুষের মধ্যে ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত। অতএব এ আয়াতে যাকাত আদায়ে অবহেলা না করা বিশেষ তাগিদ রয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে খৃষ্টান ও ইহুদী জ্ঞানীদের সম্পর্কে, যারা ইঞ্জিল ও তৌরাতের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করতো না, তাঁর সম্পর্কে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছিল তা প্রকাশ করার ব্যাপারে কার্পণ্য করতো এবং ইঞ্জিল ও তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে বিবরণ এসেছে তা গোপন করতো, কেয়ামতের দিন তারা এজন্যে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

অতএব, যে কার্পণ্যের কথা এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে তা হলো জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী প্রকাশে কার্পণ্য, এ কার্পণ্যের শাস্তি তারা ভোগ করবে কেয়ামতের কঠিন দিনে।[১]

অবশ্য ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই উত্তম। কেননা, যারা যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় তাদের শাস্তি সম্পর্কে যে ঘোষণা রয়েছে তার অর্থ সুস্পষ্ট।

سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ

অর্থাৎ যে ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ে তারা কার্পণ্য করেছে তা সর্পের আকৃতিতে কেয়ামতের দিন তাদের কণ্ঠহার হবে এবং তাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি এতদ্বারা অর্থ-সম্পদের কার্পণ্যের স্থলে জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় তবে এ বাক্যটির অর্থ হবে, তারা কেয়ামতের দিন তাদের পাপাচারের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত যদি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় তবে আল্লাহ্ রাহে জেহাদে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিনি মসনদে আহমদে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন। ঐ হাদীসের বিবরণ হলো, যাকাত দানে কার্পণ্যকারী ব্যক্তি পলায়ন করতে থাকবে। আর তার পেছনে ঐ বিষাক্ত সর্পটি দৌড়াতে থাকবে। অবশেষে তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাতে দংশন শুরু করে সারা দেহে দংশন করবে।

আল্লামা এবনে কাসীরও এ আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম।[৩]

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আল্লাহর রাহে দান করায় বা অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায়ে কার্পণ্য কেন কর? কেননা, অবশেষে তোমাদেরকে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে, ছেড়ে যেতে হবে এখানকার যথা সর্বস্ব, পাড়ি জমাতে হবে পরপারে, থাকবেন শুধু এক আল্লাহ্ পাক আর কেউ থাকবে না, থাকতে পারবে না, এ বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় সম্পদ সামগ্রীর যিনি পূর্বে মালিক ছিলেন, পরেও তিনিই থাকবেন মালিক। অতএব তাঁর রাহে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৬
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৩
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫১

ব্যয় করো। কার্পণ্য করোনা। এটিই পবিত্র কোরআনের আহ্বান, আর এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা, এটিই প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ
اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ
وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا
اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا
بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

তরজমা

(১৮১) যারা একথা বলে যে, আল্লাহ্ অভাব গ্রস্ত (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালেক) ও আমরা ধনী, তাদের একথা আল্লাহ্ শ্রবণ করেছেন। তাদের একথাও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আমি লিখে রাখবো এবং অচিরেই আমি বলবো তোমরা অগ্নি-কুণ্ডের শাস্তি ভোগ কর।

(১৮২) তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের জন্যে অত্যাচারী নন।

(১৮৩) যারা একথা বলেছে যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা যেন কোন রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যে পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকট এমন কোরবানী উপস্থিত না করবেন, যা অগ্নি গ্রাস করে নেবে। (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, নিশ্চয় আমার পূর্বে অনেক রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা কিছু বল তা সহ তোমাদের নিকট এসেছিলেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এবনে এসহাক, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে একটি চিঠি দিয়ে বনী কিনকা গোত্রের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ চিঠিতে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার, নামায আদায় করার, যাকাত প্রদান করার এবং আল্লাহ পাকের জন্যে করজে হাসানা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করলেন। তিনি সেখানে দেখলেন বহু লোক এক ব্যক্তির চারিপার্শ্বে সমবেত, এ ব্যক্তি ছিল ফোখাজ এবনে আজুরা। সে-ই ইহুদী আলেমদের অন্যতম ছিল। তার সঙ্গে আরো একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল। তার নাম ছিল আসীয়া। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফোখাজকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম কবুল কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব ভাল করেই জান যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, যিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগমন করেছেন। তাঁর আলোচনা তোমাদের নিকট তৌরাতে রয়েছে। অতএব, তাঁর সত্যতা মেনে নাও এবং আল্লাহ পাককে করজে হাসানা দাও। আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাত নসীব করবেন এবং দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। ফোখাজ বললো ঃ আবু বকর! তুমি কি বলছ? আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট করজ চান? করজ তো যারা দরিদ্র তারা ধনীদের নিকট চায়।

একটি বেআদবী

যদি তোমার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ ফকীর, আমরা ধনী (নাউযুবিল্লাহ মিন জালেক)। আল্লাহ তোমাদেরকে সুদ প্রদানে নিষেধ করে, অথচ আমাদেরকে সুদ দেয়ার কথা বলে। এসব বেআদবীপূর্ণ কথা শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং ফোখাজের মুখমণ্ডলে সজোরে এক চড় মেরে বললেন ঃ আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের সঙ্গে আমাদের শান্তি চুক্তি না থাকতো তবে আমি এখনই তোমাকে শেষ করে দিতাম। এরপর ফোখাজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললো ঃ দেখুন, আপনার সাথী আমার সাথে কি ব্যবহার করেছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আবু বকর! আপনি তার সাথে কেন এই ব্যবহার করেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর এই দুশমন অত্যন্ত বড় কথা বলে ফেলেছিল। সে বলেছিল,

"আল্লাহ অভাবগ্রস্ত, আমরা ধনী"। তখন আমি ক্রোধান্বিত হলাম এবং তাকে মেরে দিলাম। ফোখাজ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একথার সত্যতা স্বীকার করলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا

আল্লাহ্ পাক তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলেছে, "আল্লাহ্ পাক অভাবগ্রস্ত ও আমরা ধনী"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "যে আল্লাহ্ পাককে করজে হাসানা দেবে তাকে আল্লাহ্ পাক অনেক গুণ সওয়াব দান করবেন"। একথা শ্রবণ করে ইহুদীরা বলতে লাগলো ঃ হে নবী! আপনার পরওয়ারদেগার ফকীর হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) যে, তার বন্দাদের নিকট করজ চেয়েছেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজীর (রঃ) বক্তব্য

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর রাহে ব্যয় করার আদেশ দিলেন তখন কাফেররা বিদ্রুপ করে বললো, যদি আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্যে ব্যয় করতে বলে থাকেন তাহলে তিনি তো নিঃস্ব, ফকীর (নাউযুবিল্লাহ্ মিন জালিক) আর আমরা সম্পদশালী। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম রাজী (রাঃ) আরো বলেছেন, এ পর্যায়ে আরেকটি কথা হলো, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি বিধান ছিল এমন যে, কোন ব্যক্তির তরফ থেকে কোন প্রকার হাদীয়া বা নজরানা পেশ করা হতো তখন আসমান থেকে অগ্নি এসে জ্বালিয়ে ফেলতো। তখন মনে করা হতো যে, আল্লাহ পাক এ নজরানা কবুল করেছেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাহে কোন সম্পদ ব্যয় করার কথা বললেন, তখন দূরাত্মা ইহুদীরা বললো, আপনি যদি সত্য নবী হতেন তবে এভাবে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কথা বলতেন না, বরং মূসা (আঃ)-এর যুগের ন্যায় আল্লাহর নামে নজরানা পেশ করতে বলতেন, যা আসমানী অগ্নি এসে ভক্ষণ করে ফেলতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

মূলতঃ ইহুদীরা আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয়ে সর্বদা কার্পণ্য করতো। যখন তাদেরকে আল্লাহর রাহে দান করার জন্যে আহ্বান জানানো হলো তখন তারা এমন অকথ্য উক্তি করলো। আল্লাহ রাহে দান করার যে মহিমা তা উপলব্ধি করতে তারা ব্যর্থ হলো। যা কিছু মানুষের কাছে আছে সব কিছুর মালিকই আল্লাহ পাক। মানুষ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৯-১৭

যা কিছু পেয়েছে তা আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই পেয়েছে। অতএব মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে ব্যয় করে তখন তা নিজের উপকারার্থেই করে। কেননা সে এর শুভ পরিণতি অবশ্যই ভোগ করবে। পূণ্য পথে ব্যয় করাকে আল্লাহ পাক "করজে হাসানা" বলে অভিহিত করেছেন। এটি তাঁর দয়া, নিতান্ত করুণা। এজন্যে আল্লাহ্ পাক সূরা কাসাসে এরশাদ করেছেন ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ পাক যে সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা তোমরা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য কামনা কর। আর এ পৃথিবীতে তোমাদের যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেওনা। আর মানুষের প্রতি এহসান কর যেমন আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি এহসান করেছেন এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ পাক তাদের এ অকথ্য উক্তির জবাবে সর্ব প্রথম এরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের এসব অন্যায় উক্তি শ্রবণ করেছেন। হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদের কথায় মন খারাপ করোনা। তাদের এ অন্যায়ের জন্যে যা কিছু করণীয় আল্লাহ পাক তা অবশ্যই করবেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়ের জঘন্য আচরণ যেমন নিঃষ্পাপ নবীগণের হত্যা সহ এ আপত্তিকর কথাবার্তাও তাদের গুনাহর দফতরে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তারা যেভাবে এসব আপত্তিকর কথার মাধ্যমে আল্লাহ্র নাফরমানীর প্রমাণ দিয়েছে তেমনি নিঃষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করে নবী বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে অতএব, শাস্তি অবধারিত।

وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

"এবং তাদেরকে বলবো, তোমরা আল্লাহর আযাবের অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে থাক"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, তাদেরকে একথা তখন বলা হবে যখন তাদেরকে

দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।

ذُوْقُوْا শব্দটি "জাওকুন" থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা, যেহেতু ইহুদীরা তাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করতো, তাদের সেই অপকর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর বিধান পরিবর্তনের জন্যে ঘুষের স্বাদ গ্রহণ করতে, এখন তার পরিণাম স্বরূপ অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করো।[১]

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ

আর এ শাস্তি তোমাদের সে অন্যায়ের কারণে, যা তোমরা করেছিলে। যেমন নিঃষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করা এবং মহান আল্লাহ পাকের শানে বেআদবী পূর্ণ মন্তব্য করা প্রভৃতি।

আল্লামা আলুসীর (রঃ) বক্তব্য

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন এ আয়াতের মর্মার্থের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে হে ইহুদীরা! তোমরা যেভাবে তোমাদের অকথ্য উক্তিতে, অন্যায় আচরণে আল্লাহর প্রিয় বন্দাদের অন্তর পুড়িয়ে ফেলেছিলে ঠিক তেমনি তোমরা তার শাস্তি স্বরূপ পুড়তে থাক এবং অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে থাক। যে যা করবে তার পরিণাম অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ পাক জালেম নন, কারো প্রতি তিনি জুলুম করেন না।[২] এরশাদ হয়েছে–

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

(আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।) এমনিভাবে সূরা নেসায় এরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কারো প্রতি কণা মাত্রও জুলুম করেন না। আর সুবিচারের দাবী হলো যে অন্যায় করে তার শাস্তি বিধান করা।

জুলুমের তাৎপর্য

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া উচিত যে, জুলুমের অর্থ হলো কোন জিনিসকে তার নিদৃষ্ট স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে রাখা। আল্লাহ পাকের শানে এমন কাজ সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। তাই আল্লাহ পাকের ব্যাপারে জুলুমের কথা চিন্তাও করা যায় না। যে অনুগত বন্দা তাকে সওয়াব দেয়া আর যে অবাধ্য তাকে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪২

আযাব দেয়াই সুবিচার অথচ প্রকৃত অবস্থা এই, যদি আল্লাহ পাক সারা বিশ্ববাসীকে শাস্তি দেন তবু তাকে জুলুম বলা যাবে না কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান। এ পৃথিবীতে যার কাছে যা আছে তার প্রকৃত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের। অতএব, তিনি তার মধ্যে যে কোনভাবে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন, তাকে জুলুম বলা যাবে না। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং সুবিচার কায়েম করার তাগিদেই যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাদেরকে শাস্তি দিতে হয়। কেননা যে অনুগত বাধ্য তাকে যদি পুরস্কার না দেয়া হয় তবে তা হবে জুলুম আর যে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাকে যদি শাস্তি না দেয়া হয় তবে তাও হবে এক প্রকারের জুলুম। আর যেহেতু আল্লাহ পাক জুলুম করেন না, তাই কাফেরদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا

কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনা শরীফের ইহুদী কা'ব এবনে আশরাফ, মালেক এবনে হানিফ, ওহাব এবনে ইয়াহুদ, যায়েদ এবনে তাবুদ, ফোখাজ এবনে আজুরা এবং হাই এবনে আখতাব গয়রহ হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো ঃ আপনিতো বলেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং আপনার প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তৌরাতে আল্লাহ পাক এ আদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের নিকট কেউ আল্লাহর রসূল বলে দাবী করে তবে তাঁকে বলো অগ্নির মোজেযা দেখাতে (বনী ইসরাঈলে একটি প্রথা ছিল এমন যে, কেউ-যদি আল্লাহর দরবারে কোন নজরানা পেশ করতো তবে আসমান থেকে অগ্নি এসে তা ভক্ষণ করতো। এতে প্রমাণিত হতো যে, নজরানা কবুল হয়েছে। ইতিপূর্বেও একথা বর্ণিত হয়েছে)। যে পর্যন্ত তিনি অগ্নির মোজেযা না দেখাবেন সে পর্যন্ত তার প্রতি ঈমান আনবে না।[১] অথচ তাদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা কোন আসমানী কিতাবে এমন কথা নেই। কোন নবী যে এমন মোজেযা দেখাতে বাধ্য তার কোন প্রমাণ কোথাও নেই এমনকি প্রত্যেক নবীর মোজেযা যে একই প্রকার হবে এমন কথাও নেই, বরং প্রত্যেক পয়গম্বরের পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন মোতাবেকই মোজেযা প্রদান করা হয়।

قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে ইহুদীরা! আমরা পূর্বে অনেক নবী রসূল আগমন করেছেন, নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ কিন্তু এতদসত্ত্বেও

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৯
তফসরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২১

তোমরা তাদেরকে কেন হত্যা করেছ? অথচ তারা তো অগ্নির মোজেযাও দেখিয়েছিলেন কিন্তু তবু তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করেছ। যদি তোমাদের এ দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হও যে সর্বশেষ নবীর প্রতি তোমাদের ঈমান না আনার কারণ হলো অগ্নির মোজেযা না দেখানো তাহলে তোমরা বলো, হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রতি কেন ঈমান আনলে না? এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের ঈমান না আনা শুধু তোমাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে, আল্লাহর হুকুমে নয়।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইহুদীরা যে মোজেযা দাবী করেছে তা হেদায়েত কবুল করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং হিংসা-বিদ্বেষের কারণে কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষরাও পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম যথা ঈসা (আঃ), ইয়াহয়া (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট এ মোজেযা দাবী করেছিল। এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা ইহুদীরা তাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

অতএব, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটও এমনি মোজেযার দাবী তারা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই করেছে, হেদায়েত লাভের জন্যে নয়। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনেক মোজেযা তারা দেখেছে কিন্তু ঈমান আনেনি।[১]

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ
جَاءُو بِالْبَيِّنَٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَٰبِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ
وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي
أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

তরজমা

(১৮৪) (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে (তবে আপনি চিন্তিত ও মনঃক্ষুণ্ন হবেন না কেননা) আপনার পূর্বেও বহু রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহ এবং দীপ্তি মান কিতাবসহ এসেছিল।

১। তফসরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২২

(১৮৫) প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ফল দেয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অগ্নি থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করার তৌফিক দেয়া হবে সে-ই সফলকাম হবে (আর তোমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(১৮৬) নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের ধনে প্রাণে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরেকদের তরফ থেকে বহু কষ্টদায়ক কথা শ্রবণ করবে আর যদি তোমরা সবর অবলম্বন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে নিশ্চয় তা হবে অত্যন্ত সৎ সাহসের কাজ।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, (হে রসূল!) এ অভিশপ্ত ইহুদীদের অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের চিরাচরিত নীতিই হলো আম্বিয়ায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়া। ইতিপূর্বে এ দূরাত্মা ইহুদীরা অনেক নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে অথচ তাঁরা তাঁদের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশ্য মোজেযা, আসমানী পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল কিতাব সমূহ যথা তৌরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে তারা অন্যায় আচরণ করেছে। অতএব, (হে রসূল!) আজ আপনার সাথেও যদি তারা এভাবে কষ্টদায়ক আচরণ করে তবে তা নতুন কিছু নয়, বরং তাদের চিরাচরিত নিয়ম। অতএব আপনি ব্যথিত হবেন না। পূর্বের নবীগণ যেভাবে এমন অবস্থায় সবর করেছেন আপনিও সবর করুন।

তফসীরকারণ লিখেছেন আলোচ্য আয়াতের "বাইয়্যেনাত" শব্দটি মোযেজা সমূহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর যবুর এর বহু বচন হলো যুবর, এর অর্থ হলো পুস্তিকা সমূহ। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট সহীফা নাযিল হয়েছিল। আর কিতাব বলতে তৌরাত এবং ইঞ্জিল কে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এমন গ্রন্থ যাতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।[১]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না এবং কোন দিনই হবে না।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৪
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪১
তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭০

আল্লামা বগবী লিখেছেন ঃ হাদীস শরীফে আছে, যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন জমীন আল্লাহ পাকের নিকট এ অভিযোগ করল যে আমার একটি অংশ নিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তা দ্বারা আদমকে তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তখন জমীনের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যা কিছু তোমার কাছে থেকে নেয়া হয়েছে, তা তোমার নিকট ফেরত দেয়া হবে। তাই যাকে যে মাটি থেকে তৈরী করা হয় তাকে সে মাটিতেই পুনরায় দাফন করা হয়।

এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার যে আরাম-আয়েশ বা আনন্দ উল্লাস তা আল্লাহ্র হুকুম পালনের পরিণতি নয়; বরং এসব হলো আল্লাহ পাকের দান। নেক-আমল বা আল্লাহর আনুগত্যের শুভ পরিণতি তথা সওয়াব পাওয়া যাবে আখেরাতে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কেয়ামতের দিনই তোমাদের আমলের বদলা দেয়া হবে পরিপূর্ণ ভাবে। যদি নেক আমল হয় তবে তার উত্তম বদলা দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি বদ আমল থাকে তবে তার পরিণাম হবে শোচনীয়। অতএব, তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এবং সবরের সওয়াব দেয়া হবে, আর কাফেরদের সত্যকে অস্বীকার করার শাস্তি প্রদান করা হবে।

আলোচ্য আয়াতে تُوَفَّوْنَ শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আমলের কিছু বদলা দুনিয়াতেও দেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا

এবং আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতে তাঁর সওয়াব দান করেছি এবং আখেরাতে সে হবে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কবর জান্নাত সমূহের একটি বাগান অথবা দোযখের গর্ত সমূহের একটি গর্ত। (তিরমিযী শরীফ)

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

প্রকৃত সাফল্য কার?

অএব, যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে এ ক্ষণস্থায়ী জগতে, এ ক্ষণ ভঙ্গুর জীবনে যদি কোন সাফল্য অর্জিত হয় তবে তাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সাফল্য বলা যাবে না, বরং প্রকৃত সাফল্য হলো তখন যখন মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবার পর মাগফেরাত লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন ঃ যেভাবে এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, প্রাণী মাত্রেরই জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে, ঠিক তেমনি সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ এ বিশ্ব জগতে যত কিছু আছে সবই শেষ হয়ে যাবে, থাকবেন শুধু তোমাদের প্রতিপালক, যিনি মহিমময়, মহানুভব। অতএব, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর সবই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল, আল্লাহ্ পাকই চিরন্তন। তিনি ব্যতীত আর কেউ ছিল না, পরেও কেউ থাকবে না।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

তিনিই আওয়াল, তিনিই আখের, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত, পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হয়েছে এবং হবে সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে, সৃষ্টি মাত্রকেই বিদায় নিতে হবে, যখন সকলেরই মৃত্যু হবে তখন আল্লাহ্ পাক কেয়ামত কায়েম করবেন। মানুষের পুনরুত্থান হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তার ভাল মন্দ কর্মের হিসাব দিতে হবে; ভাল কাজ করলে পুরষ্কার লাভ করবে আর মন্দ কাজ হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

প্রকৃত বিপদগ্রস্ত কে?

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয় তখন আমরা উপলব্ধি করতাম যেন কোন লোক আসছে এবং কারো চলার শব্দ আমরা শ্রবণ করতাম কিন্তু কাউকে দেখা যেত না। সে আমাদেরকে সম্বোধন করে বলতো, "হে ঘরের অধিবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তোমাদের সকলকে তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর বদলা কেয়ামতের দিন পুরোপুরিই দেয়া হবে। প্রত্যেক মসিবতেরই বিনিময় আল্লাহর দরবারে রয়েছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির বিনিময় সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব তোমরা এক আল্লাহর উপর ভরসা রাখ এবং তাঁর নিকটই আশা পোষণ কর, দুনিয়ার কোন মসিবত বা বিপদ সত্যিকার অর্থে বিপদ নয় কেননা, এখানকার বিপদ বা নেয়ামত সবই ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে শান্তি, রহমত এবং বরকত নাযিল হোক"(এবনে আবি হাতেম)।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ধারণা ছিল যিনি আসতেন, যাঁকে দেখা যেত না তিনি ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)।

বস্তুতঃ প্রকৃত সাফল্য সে ব্যক্তিই অর্জন করে যে দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত পায় এবং বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতে একটি ছড়ির সমান স্থান সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকেও উত্তম। যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে এ আয়াত খানি তেলাওয়াত কর–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ যাকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হয় এবং বেহেশতে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় তার জীবন হয় সার্থক এবং সাফল্যমণ্ডিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার এবং বেহেশতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখে তার কর্তব্য হলো মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান রাখা এবং মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করা যা সে তার নিজের জন্যে পছন্দ করে।[১]

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

বস্তুতঃ দুনিয়ার এ জীবন ধোকার সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ-সম্পদ, এখানকার যাবতীয় চাকচিক্য একান্ত ক্ষণস্থায়ী। ধোকা এবং ধাঁধাঁ ব্যতীত আর কিছুই নয় কেননা, এখানকার সব কিছুই দু' দিনের জিন্দেগীর মধ্যেই সীমিত। যখন এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অমোঘ বিধানের মাধ্যমে তখন এখানকার কিছুই সঙ্গে যাবে না। আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, ধন-সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ হয়ে যাবে। যা কিছু সারা জীবনের চরম সাধনার বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয় সব কিছুই পরের হয়ে যাবে, নিজের কৃতকর্ম ব্যতীত এ পৃথিবী থেকে মানুষ কিছুই নিতে পারে না, পারবে না। অতএব, বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা। পরকালীন জিন্দেগীর পুঁজি হলো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল। এ পুঁজি যে যত বৃদ্ধি করতে পারবে সে আখেরাতে তত বেশী লাভবান হবে। অতএব, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা এবং অপরিণামদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। পবিত্র কোরআনে এজন্যেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫২-৫৩
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৬

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রী অতি সামান্য"। এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۞ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(বরং তোমরা দুনিয়ার এ জিন্দেগীকে প্রাধান্য দাও অথচ আখেরাত হলো উত্তম এবং চিরস্থায়ী।)

আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে যে, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা এই, যেমন কোন ব্যক্তি নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, সে আঙ্গুলে সমুদ্রের অথৈ পানির যতটুকু আসে আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া ততটুকু মাত্র।

হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়া হলো একটি ধোকার স্থান যা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং পাড়ি জমাতে হবে পর পারে। সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এ দুনিয়া অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের থেকে বিদায় নেবে এবং ধ্বংস হবে। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে ও তাঁর বন্দেগী করে যথাসাধ্য নেক আমল সংগ্রহ করা।[১]

বস্তুতঃ দুনিয়ার এ জিন্দেগী সীমিত, বিদায়রত, আর আখেরাতের জিন্দেগী চিরস্থায়ী, যারা ঈমান ও নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করে তারা আখেরাতে অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ "আমি আমার নেক বন্দাদের জন্যে এমন বস্তু সমূহ তৈরী করে রেখেছি যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি এবং কোন অন্তর কল্পনাও করেনি"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যদি তোমরা এর প্রমাণ দেখতে চাও তবে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করো–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ কেউ জানেনা যে তাদের নয়ন মনের শান্তির জন্যে কি কি বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে, আর তা হয়েছে তাদের কার্যাবলীর পুরস্কার স্বরূপ। বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তার ছায়ায় যদি শত বছরও কোন আরোহী ব্যক্তি

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৩

চলতে থাকে তবু সে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। একথার সত্যতার প্রমাণ দেখতে চাও তবে পাঠ করো وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (সূরা ওয়াকেয়া)

لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

মোমেনদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে

এ আয়াতে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, ওহোদ রণাঙ্গনে যে বিপদ হয়েছিল অথবা এতদ্ব্যতীত আর যে সব বিপদ হয়েছে তাতে তোমরা এ ধারণা করোনা যে তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, বরং পরীক্ষা আরো রয়ে গেছে, পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও তোমাদের ধনে প্রাণে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। শত্রুর হাতে আহত নিহত হওয়া, বন্দী জীবনের কষ্ট, জান মালের ক্ষয়ক্ষতি, অসুস্থ হওয়া বা শোকাহত হওয়া, আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ প্রভৃতি দুঃখ কষ্টের পাশাপাশি ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরেক, মুনাফেকরদের অকথ্য অসহনীয় উক্তিও তোমাদের শ্রবণ করতে হবে। তাদের অন্যায় আচরণের মোকাবেলাও করতে হবে। এমনি অবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা হবে একান্ত জরুরী কর্মসূচী, সৎ সাহস এবং সংকল্পের দৃঢ়তা, তাকওয়া পরহেযগারী এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই এমন বিপদের মোকাবেলা করা যায়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে কাফের মুনাফেকদের অন্যায় আচরণের মোকাবেলায় অত্যধিক উত্তেজিত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাফের ও মুনাফেকরা তোমাদেরকে অনেক কষ্টদায়ক কথা বলবে, তোমরা সেসব কথা শ্রবণ করেও ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করবে। তোমাদের প্রতি নির্যাতন করতে এবং তোমাদের অনিষ্ট সাধনে তারা মোটেই গাফলত করবে না। অতএব, তোমরাও সবর এবং পরহেযগারীর নীতি পরিত্যাগ করোনা। কাফেরদের অপ্রিয় আচরণের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে পূর্বেই সতর্ক করা এবং দুশমনের আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

কাফেরদের কষ্ট দেয়ার একটি দৃষ্টান্ত

কাফের এবং মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে কষ্ট দিত তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি গাধার উপর আরোহণ করে হযরত উসামা এবনে যায়েদ (রাঃ)-কে তাঁর পেছনে বসিয়ে অসুস্থ হযরত সা'দ এবনে ওবায়দাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। বনু হারেস এবং খাযরাজ গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

বাহনের কারণে ধূলা উড়ছিল। আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল নাকে কাপড় রেখে বললো ঃ ধূলা ওড়াবেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করে মজলিসে তশরীফ আনলেন, সালাম দিলেন এবং সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং পবিত্র কোরআনের কয়েকখানি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই বলে উঠলো ঃ দেখুন, আপনার এ পন্থা আমাদের পছন্দনীয় নয়। আপনার কথা হয়তো হক্ব, কিন্তু এর কি কারণ? যে আপনি আমাদের মজলিসে এসে আমাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকেন, আপনি আপনার ঘরে চলে যান, যে আপনার নিকট আসবে তাকে আপনি আপনার কথা শোনাবেন। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) বলেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আমাদের মজলিসে আগমন করবেন। তাঁর আগমন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিতর্ক হলো। একে অন্যকে গালি দিতে লাগলো এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়লো। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের কারণে মজলিসে শান্তি ফিরে আসলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনে আরোহন করে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলেন। সেখানে তিনি হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করলেন। তখন হযরত সাদ (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি ক্ষমা করুন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, আবদুল্লাহ এবনে উবাই আপনার প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করে, আর এ অবস্থাটা অস্বাভাবিকও নয়। কেননা আপনার আগমনের পূর্বে লোকেরা তাকে নেতা নির্বাচন করেছিল আর তাকে নেতৃত্বের মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আপনার আগমনের কারণে তার নেতৃত্বের আশা চিরতরে দূরাশায় পরিণত হয়েছে। তাই তার মনে এত কষ্ট। আর তার এসব আচরণ দ্বারা সে কষ্টেরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। অতএব, দয়া করে তার কথার প্রতি কোন গুরুত্বারোপ করবেন না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামও এভাবে তাদেরকে মাফ করতেন। এ ঘটনার পর জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আবদুর রাজ্জাক জুহরীর সূত্রে আবদুল্লাহ এবনে কা'ব এবনে মালেকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইসলামের চরম শত্রু কা'ব

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

এবনে আশরাফ সম্পর্কে কেননা, সে তার কবিতায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলতো, মুসলমানদেরকে গালি দিত এবং মুশরেকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করতো। কা'ব যখন দেখলো যে, ইসলাম দিন দিন শক্তি অর্জন করছে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে চলেছে তখন সে মক্কা সফর করলো এবং কোরায়শ সরদারদেরকে একত্রিত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করলো। কোরায়শরা জিজ্ঞাসা করলো আমাদের ধর্ম উত্তম না মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)? সে বললোঃ তোমাদের ধর্ম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কা'ব এবনে আশরাফ তার কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের শক্তি পৌঁছিয়েছে। অতএব আমার পক্ষ থেকে কে তার কাজ শেষ করবে? তখন মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ খেদমত আমি করবো। সে আমার মামা, আমি তাকে হত্যা করবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তোমার দ্বারা তা সম্ভব হয় তবে কর। মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ) বাড়ী ফিরে আসলেন, তিন দিন পর্যন্ত পানাহার পরিত্যাগ করলেন এবং যতটুকু গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা হয় শুধু ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন পাহানার পরিত্যাগ করেছ? তিনি বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কথাতো একটা বলে ফেলেছি কিন্তু জানি না তা পূর্ণ করতে পারবো কিনা, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমার দায়িত্ব হলো চেষ্টা করা। তুমি সা'দ এবনে মাআজের সঙ্গে পরামর্শ কর। মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, তুমি কা'বের নিকট যাও এবং নিজের অভাবের কথা বলে কিছু খাদ্যদ্রব্য ঋণ দেয়ার জন্যে অনুরোধ কর। অতঃপর মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ) ওব্বাদ এবনে বশর এবং আবু নায়লা, সালকানা এবনে সালামাহ- যিনি কা'ব এবনে আশরাফের দুগ্ধ ভাই ছিলেন, হারেস এবনে আবাস (রাঃ) এবং হারেস এবনে আওস (রাঃ) যিনি হযরত সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) ভ্রাতঃষ্পুত্র ছিলেন, তারা সকলেই একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তাকে হত্যা করবো। কিন্তু আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন যে আমরা পরস্পর কথাবার্তায় আপনার সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলবো, পরবর্তীতে আযাব যেন না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা যা ভালো মনে কর তাই কর। এরপর সকলে আবু নায়লাকে প্রেরণ করলেন। আবু নায়লা কা'বের নিকট গমন করে কথাবার্তা বললেন, আর কা'ব কবি ছিল। তার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তিও করলেন। এরপর আবু নায়লা বললেন, এবনে

আশরাফ আমি তোমার নিকট একটা কাজে এসেছিলাম। কাজটির কথা তোমাকে বলি তবে শর্ত হলো তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না। কা'ব বললো, তুমি বর্ণনা কর। তখন আবু নায়লা বললেন, আমাদের দেশে এ ব্যক্তির আগমন একটা বিপদই হয়ে গেছে। সারা আরববাসী আমাদের দুশমন হয়ে গেছে। আমাদের ভ্রমণের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি এখন অভাব অনটনের কারণে আমাদের সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আমরা অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কাব বললো ঃ আমিতো পূর্বেই তোমাদেরকে এসব কথা বলেছি যে, অবশেষে এই হবে। আবু নায়লা বললেন ঃ আমার কিছু সাথী এবং আমি চাই যেন তুমি আমাদের নিকট কিছু খাদ্য দ্রব্য বাকীতে বিক্রি কর এবং তোমার বিশ্বাসের জন্যে আমরা কিছু বস্তু তোমার নিকট বন্ধক রেখে দেব। সে বললোঃ তোমাদের শিশুদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। আবু নায়লা বললেন ঃ এটা কি করে সম্ভব হয়? কা'ব বললো ঃ তাহলে তোমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের নিকট বন্ধক রাখ। আবু নায়লা বললেন ঃ এটা কি করে রাখতে পারি। তবে হ্যাঁ আমাদের অস্ত্রসম্ভার তোমার নিকট বন্ধক রাখতে পারি। আর তুমি জান আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন কত বেশী। কা'ব বললো ঃ ঠিক আছে। অস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য-দ্রব্য বাকীতে দেয়া যেতে পারে। আবু নায়লা চিন্তা করলেন যে কা'ব অস্ত্র দেখে হয়তো অস্বীকার করে বসবে। এজন্যে তিনি তার নিকট দ্বিতীয়বার আসার অঙ্গীকার করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নিজের সঙ্গীদেরকে এ বিষয়ে অবগত করলেন এবং সন্ধ্যাকালে কা'বের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আর এ বিষয় সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করানো হলো।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিদায় করার জন্যে বাকী পর্যন্ত আগমন করেছেন এবং এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নামে যাও। হে আল্লাহ! তাদেরকে সাহায্য করো। আবু নায়লা সঙ্গীদেরকে বলেছেন ঃ আমি যখন তার চুল গুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেব তখন তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করে ফেলবে। বাড়ীর সম্মুখে এসে আবু নায়লা তাকে ডাক দিলেন। কা'ব এবনে আশরাফের বিয়ে হয়েছিল কয়েক দিন পূর্বেই। সে চাদর গায়ে দিয়ে দণ্ডায়মান হলো। তার স্ত্রী চাদরের কোন্ ধরে জিজ্ঞাসা করলো আপনি একজন যোদ্ধা ব্যক্তি, আপনার ন্যায় ব্যক্তির এ সময় বের হওয়া বিপজ্জনক। আমি এমন শব্দ শ্রবণ করছি যা থেকে রক্ত ঝরছে। আপনি দেয়ালের ভেতর থেকেই কথা বলুন। কা'ব বললোঃ আমি অঙ্গীকার করেছি আর এতে রয়েছে আমার ভাগিনা এবং দুগ্ধ ভাই আবু নায়লা, এরাতো রাতে আমি নিদ্রিত থাকলেও জাগাতে পারে। আর ভদ্রলোককে যদি রাতেও ডাকা হয় সে কবুল করে। যাহোক, যখন সে আসলো

তখন তাকে হত্যা করা হলো। হযরত আবু আব্বাস (রাঃ) কা'বের পাঁজরে বর্ষার দ্বারা আঘাত করে মাথাটা কেটে নিয়েছিলেন। রাতের শেষ প্রহরে তারা এ অভিযানে সফলকাম হয়ে বাকী পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উচ্চস্বরে তকবীর বললেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন নামায রত ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। তকবীরের শব্দ শ্রবণ করে তিনিও তকবীর দিলেন। তিনি আল্লাহর এ দুশমনের শাস্তি বিধানের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর আদায় করলেন। এ অভিযানে একমাত্র আহত সাহাবী ছিলেন হযরত হারেস (রাঃ)। তিনি ক্ষত-স্থানের ব্যথায় কাতর ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ক্ষত-স্থান স্পর্শ করলে তাঁর কষ্ট দূর হয়ে যায়।[১]

وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ

আর হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি সবর কর তথা বিপদে ধৈর্য ধারণ কর; আর আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে থাক তবে তা হবে অত্যন্ত সৎ সাহসের কাজ। মূলতঃ সবর এবং তাকওয়া হলো জীবন সংগ্রামে সাফল্যের চাবিকাঠি।

মাসায়েলুল কোরআন

এ ঘটনা থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ মাসআলা প্রমাণ করেছেন যে, যদি কোন কাফের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, অথবা তাঁর শানে বেআদবী করে অথবা তাঁকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়। তাঁর সঙ্গে কোন অঙ্গীকার থাকুক বা না থাকুক।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, যদি এমন ব্যক্তি যাদের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি রয়েছে, সে যদি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় তবে এজন্যে তাকে হত্যা করা জায়েয হবেনা। কেননা, তাঁকে গালি দেয়া হলো কুফর। আর কারো কাফের হওয়ার কারণে তার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার বিনষ্ট হয় না। কেননা, যার সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেতো পূর্বেই কাফের থাকে।

তবে এবনে আশরাফকে যে হত্যা করা হয়েছে তার কারণ হলো এই যে, সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। মক্কায় গমন করে সে মুশরেকদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অথচ তার সঙ্গে এ চুক্তি ছিলো যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেনা, অথচ সে এ চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৪-৪৬

এবনে সা'দের বিবরণ হলো, এবনে আশরাফের হত্যার ঘটনার পর মদীনা শরীফের ইহুদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলে, আমাদের সর্দারকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ কা'ব এবনে আশরাফ কিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে পৌত্তলিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করত তা তোমাদের জানা রয়েছে। বস্তুতঃ সে তার কর্মকান্ডের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই ভোগ করেছে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে একটা শান্তি চুক্তি করার আহ্বান জানান, তারা এ আহ্বানে সাড়া দেয় এবং একটি শান্তি চুক্তি সম্পদিত হয়।[১]

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ
اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

তরজমা

(১৮৭) এবং যখন আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা এ কিতাব খানি মানব জাতির নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন রাখবে না। এরপরও তারা তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখলো এবং হীনমূল্যে বিক্রি করলো অথচ তারা যা ক্রয় করলো তা কত নিকৃষ্ট!

(১৮৮) (হে মোমেনগণ!) তোমরা কখনও মনে করোনা যে, নাফরমানরা যা করেছে তাতে তারা আনন্দিত এবং যা তারা করে নাই তাতে প্রশংসার জন্যে আশান্বিত। আর কখনো তোমরা একথা মনে করোনা যে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে; আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি।

(১৮৯) আর আসমান জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক আহলে কিতাবদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। আহলে কিতাবদের নিকট থেকে আল্লাহ্ পাক নবী রসূলগণের মাধ্যমে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যখন আবির্ভাব হবে তখন তাঁর প্রতি তারা ঈমান আনবে, তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রচার করবে এবং মানুষকে তাঁর অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু আহলে কিতাবরা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তৌরাত ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, তা তারা গোপন করে। আর সত্যকে গোপন করার বিনিময়ে তারা হীন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করে। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় হলো অত্যন্ত মন্দ এবং নিকৃষ্ট।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে এ উম্মতের ওলামাদের প্রতি তাগিদ রয়েছে যে তাঁরা যেন ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ন্যায় এল্মকে গোপন না করে, বরং যা মানুষের জন্যে উপকারী হয় এবং যে কথার প্রচারের মাধ্যমে মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার প্রচার করা ওলামাদের কর্তব্য। যদি তারা সত্যকে গোপন করে তবে এ অন্যায়ের জন্যে ইহুদী আলেমদের যে শাস্তি হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার আলেমদেরও সে শাস্তিই হবে। এজন্যে আলেম সমাজের কর্তব্য হলো হক্ব কথা প্রকাশ করা। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তির নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয় সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে অগ্নির লেগাম পড়ানো হবে।[১]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন ঃ আহলে কিতাবদের আলেমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলবে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ এবং তাঁর গুণাবলীর বিবরণ গোপন করবে না, বরং এ বিষয়ে মানুষকে ওয়াকেফহাল করবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন করবে না।

আহলে কিতাব অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো

কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। তারা পার্থিব স্বার্থের ঘৃণ্য বিনিময়ে সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। শরীয়তের যে বিধান তাদেরকে প্রদান করা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৪

হয়েছিল তা তারা পরিবর্তন করলো। আল্লাহর কিতাবের শাব্দিক এবং অর্থগত পরিবর্তনও করলো, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও তাঁর শুভাগমনের ঘোষণা গোপন করলো এবং এর বিনিময়ে তারা তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করলো।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক আহলে কিতাব থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বর্ণনা করি তা তোমরা গোপন করোনা। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, হাসান এবনে আম্মারাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি ইমাম জুহরীর নিকট তখন হাযির হই যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আমি তাঁর বাসস্থানের দ্বারপ্রান্তেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম যদি আপনি উচিত মনে করেন, তবে আমার নিকট দু' একখানি হাদীস বর্ণনা করুন, তিনি বললেন ঃ তুমি কি জাননা? আমি হাদীস বর্ণনা করা বন্ধ করে দিয়েছি। তখন আমি বললাম, হয় আপনি হাদীস বর্ণনা করুন নতুবা আমি আপনার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করি। তিনি বললেন ঃ তুমি বর্ণনা কর। আমি বললাম, আমার নিকট হাকাম এবনে উয়াইনাহ ইয়াহ্য়া যাজ্জারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ যাজ্জার বলেছেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক মূর্খ লোকদের নিকট থেকে এলম হাসিলের অঙ্গীকার তখন পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামাদের নিকট থেকে এলম শিক্ষা দানের অঙ্গীকার গ্রহণ না করেছেন, অতঃপর ইমাম জুহরী (রঃ) আমার নিকট ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, সা'লাবী তাঁর তফসীরে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আলেমদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে ব্যক্তি কোন কথা জানে সে যেন অন্যকে তা জানিয়ে দেয় এবং এলমকে গোপন না করে। কেননা এলমকে গোপন করা ধ্বংসের কারণ হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, এ আয়াতে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের কার্যাবলীর উপর বিস্ময় প্রকাশ করে এরশাদ হয়েছে যে, কি করে তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় সর্বশেষে নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের ব্যাপারে আপত্তিকর কথাবার্তা বলা? অথচ তোমাদের নিকট যে আসমানী গ্রন্থ রয়েছে তা তাঁর সত্যতা ঘোষণা করে এবং তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৮-৪৯

এতদ্ব্যতীত পূর্বের আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের তরফ থেকে তোমাদেরকে কষ্টদায়ক কথা বলা হবে, আর সে কষ্টের মধ্যে অন্যতম কষ্ট হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে যে বিবরণ তৌরাত ও ইঞ্জিলে স্থান পেয়েছে তা গোপন করা এবং তাতে পরিবর্তন করা। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের নিকট থেকে সর্বশেষ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম সম্পর্কে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তারা যে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا - الاية

ইহুদীরা মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দিত না; বরং ভুল জবাব দেয়ার জন্যে ঘুষ গ্রহণ করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় এবং গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তা গোপন করতো; আর তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের এ প্রতারণা সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়। এজন্যে তারা মনে মনে খুব খুশি ছিল; আর তারা বড় আলেম একথা ভেবে মানুষ তাদের প্রশংসা করুক তা কামনা করতো। এর পাশাপাশি মুনাফেকদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপই ছিল। জেহাদের সময় হলে তারা আত্মগোপন করে থাকতো শুধু তাই নয়; বরং নিজেদের এ অন্যায় আচরণে আত্মতৃপ্তি লাভ করে বলতো ঃ দেখলেতো, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করলাম? এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদ থেকে ফিরে আসতেন তখন তারা তাদের অগণিত কাল্পনিক ওজর-আপত্তি পেশ করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মুবারকে তাদের প্রশংসা শ্রবণ করার আকাঙ্ক্ষা করতো। এ আয়াতে তাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের এ ধোকাবাজি প্রতারণা তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না, বরং তারা দুনিয়াতে অপমানিত হবে এবং আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা হোমায়েদ এবনে আবদুর রহমান এবনে আওফের সূত্রে হযরত আলকামা এবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে মারোয়ান স্বীয় দারোয়ানকে বলে তুমি আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর যখন আমাদের মধ্যে কেউ নিজের কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত হয় এবং না করা নেক কাজের প্রশংসাকে পছন্দ করে তবে এমন ব্যক্তির আযাব হওয়া

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৯

অবধারিত। এমন অবস্থায় কি কেয়ামতের দিন আমাদের সকলকেই আযাব দেয়া হবে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? বরং এ আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে তলব করলেন এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ইহুদীরা আসল কথা গোপন করলো এবং অন্য কথা বললো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ করলো যে, আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তার জবাবই আমরা দিয়েছি। আর তাদের এ কাজের জন্যে তারা প্রশংসা আশা করলো এবং মনে মনে আনন্দিত হলো যে আমরা আসল কথা গোপন করে দিয়েছি।

এ বর্ণনার পর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদে গমন করতেন তখন কিছু মুনাফেক জেহাদে অংশ গ্রহণ করতো না। তারা কোন বাহানা ধরে জেহাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকত আর মনে মনে আনন্দিত হতো যে, জেহাদ থেকে আত্মরক্ষা করলাম। অতঃপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন মিথ্যা শপথ করে জেহাদে না যাওয়ার কারণ বর্ণনা করতো এবং আশা করতো যে তাদের না করা সৎ কাজের প্রশংসা করা হবে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ তারা বলতো আমাদের এ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে জেহাদে শরীক হই কিন্তু কি করবো? নানা কারণে বিশেষ ঠেকাবশতঃ শরীক হতে পারি নাই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগবী (রঃ) একরামার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ফোখাজ, আশরীয়া সহ অন্যান্য ইহুদী আলেমদের সম্পর্কে যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো এবং নিজেরা আলেম বলে প্রচারিত হওয়ায় আনন্দিত হতো, অথচ প্রকৃত অর্থে তারা আলেম ছিল না।

হযরত কাতাদা (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেন যে, খায়বরের ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললো, আমরা আপনার পরিচয় পেয়েছি এবং আপনার সত্যতা স্বীকার করছি যে, আপনি সত্য নবী। আর আমরা মুসলমানদের সঙ্গে একমত, আমরা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত কিন্তু তারা এসব কথা বলতো মৌখিক, তাদের অন্তরে এসব কথা ছিল না। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তারা বের হয়ে আসত তখন মুসলমানগণ তাদেরকে বলতো তোমরা খুব ভাল কথা বলেছ। যেভাবে বলেছ,

তেমনি কাজ করবে। যাহোক মুসলমানগণ তাদের প্রশংসা করলো, এটিই ছিল তাদের না করা কাজের প্রশংসা। আর একথা সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন ঃ

اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

অর্থাৎ তারা এমন সৎ কাজের প্রশংসা কামনা করতো যা তারা কখনো করেনি। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করে এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে মোমনগণ! তোমরা একথা মনে করোনা যে, এসব লোক আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে, বরং যারা নিজেদের কীর্তিকলাপে আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তাতেও প্রশংসা চায়, তাদের শাস্তি অবধারিত।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন ঃ এ আয়াতে মুসলমানদের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী যে তারাও যেন মন্দ কাজ করে আনন্দিত না হয়, আর কোন মহৎ কাজ না করেও মানুষের নিকট প্রশংসা কামনা না করে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুরই মালিক আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব, কোন অপরাধীর পলায়নের কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি যখন যা ইচ্ছা তা করেন।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান অতএব, তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনদের শাস্তি বিধানে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেই ইহুদীদের সম্পর্কে যারা আল্লাহ পাকের শানে বেআদবী পূর্ণ উক্তি করেছে।

আল্লাহ পাক যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় তাদের শাস্তি বিধানে সক্ষম। অতএব তাদের ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৯-৫০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾
رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

তরজমা

(১৯০) নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃজণের মধ্যে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

(১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃজণের মধ্যে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ ত্রিভূবন বৃথা সৃষ্টি করো নাই। পবিত্রতম তুমি, আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করতে আদেশ কর তাকে নিশ্চয় অপমান করেছ এবং জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নাই।

(১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শ্রবণ করেছি। (তিনি বলছিলেন) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ফলে আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ সমূহ মাফ কর এবং আমাদের পাপ পংকিলতা দূরীভূত কর, আর নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান কর।

(১৯৪) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে যা ওয়াদা করেছ তা আমাদেরকে দান কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমান করোনা, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তেবরানী এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ কোরায়শ গোত্রের লোকেরা ইহুদীদের নিকট গিয়ে বললো ঃ হযরত মূসা (আঃ) কি কি মোযেজা এনেছেন? তথা কি কি অলৌকিক ঘটনা স্বীয় সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ পেশ করেছেন? ইহুদীরা বললো ঃ মূসা (আঃ)-এর লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হতো এবং তাঁর হাত অত্যন্ত উজ্জল ও চমৎকার হতো। অতঃপর কোরায়শের লোকেরা খৃষ্টানদের নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ হযরত ঈসা (আঃ) কি কি মোযেজা এনেছেন? তারা বললো ঃ জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করা, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করা।

এরপর তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো ঃ আপনার নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মোজেযা প্রকাশ করুন এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন, যেন সাফা নামক পাহাড়টি স্বর্ণের পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত সমুহ নাযিল করেন।[১] এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ স্বরূপ অলৌকিক কিছু দেখতে চাও? এ সুন্দর বসুন্ধরা, এ সমগ্র বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের অপূর্ব নিদর্শন। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যেই তো রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের অসংখ্য জ্বলন্ত দলিল প্রমাণ।

আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন

বস্তুত ঃ আসমান-যমিনের সৃজণে, দিবা-নিশির অহরহ পরিবর্তনে, সৌরজগতে গ্রহ- উপগ্রহের অপূর্ব সৃষ্টিতে, মেঘমালার পরিভ্রমণে, অগণিত খাদ্য-দ্রব্য, শাক-সব্জী ফল-ফলারী উৎপাদনে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামত ও বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাক্ষী, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার উজ্জল প্রমাণ, তাঁর সৃষ্টি নৈপূণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। আর আল্লাহ্র প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর মহান দানের মহাসমুদ্রে চির নিমজ্জমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, মানব-দানব এক কথায় সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নিদর্শন। সর্বত্র তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিমান মাত্রকে এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত দেখে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৬

বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। তাঁর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। শুধু তাই নয়, বরং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মহান দরবারে বিনয় প্রকাশ করতে হয়। বিবেকবান মাত্রকেই এ সত্য উপলব্ধি করতে হয় যে, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্তৃত্বাধীন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য যে, যখন পৃথিবীর একটি প্রাণীও উর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে অবগত ছিলনা, ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডলের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তথা নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে সকলেই ছিল অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, তখন অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৪শ' বছর পূর্বে সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনই ঘোষণা করেছে যে, শুধু ভূমণ্ডলই নয়, বরং নভোমণ্ডল তথা সমগ্র আকাশ লোককেও আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। সেদিন পবিত্র কোরআনই ঘোষণা করেছে সাতটি সুদৃঢ় আকাশের অস্থিত্বের কথা যা একের পর এক সাজানো রয়েছে। যাতায়াতের জন্যে প্রতিটি আকাশে দ্বার এবং নেগেহবানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি গ্রহে আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ যুগে বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত সাধনার ফলে পবিত্র কোরআনের এসব কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আক্ষেপ সে ব্যক্তির প্রতি যে এ আয়াত পাঠ করে অথচ চিন্তা করেনা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি এক রাত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহে ঘুমিয়ে পড়ি। আমি দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করলেন, এরপর অজু করলেন। এরপর আলোচ্য আয়াতটি সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। এরপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এ নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থা, রুকু এবং সেজদা সুদীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি বিছানায় এসে নিদ্রিত হলেন এবং তাঁর নিঃশ্বাস গ্রহণের শব্দ শ্রুত হতে লাগলো। এভাবে তিনি তিনবার নামায আদায় করলেন। এভাবে তিনি ছয় রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং প্রত্যেকবার মেসওয়াক করলেন এবং অজু করলেন। আর এ আয়াত সমূহ পাঠ করলেন। অতঃপর বেতরের তিন রাকাআত নামায পড়লেন।[১] (মুসলিম শরীফ)

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ এ পর্যায়ে আমাদের একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআন নাযিল করার

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪

উদ্দেশ্য হলো মানব মনকে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার মা'রেফাত হাসিলের দিকে আকৃষ্ট করা এবং সৃষ্টির সম্পর্ককে কমিয়ে স্রষ্টার সম্পর্ককে বৃদ্ধি করা। পূর্বের আয়াত সমূহে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ এবং বাতিল পন্থীদের সন্দেহের জবাব দানের পর পুনরায় আল্লাহ্ পাকের স্মরণের কথা, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের কথা এবং তাঁর শান-শওকতের কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে এ আরযী পেশ করেছি যে, আপনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে যা কিছু আশ্চর্যজনক দেখেছেন তা আমাকে বলুন। আমার এ প্রশ্ন শ্রবণ করে হযরত আয়েশা (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং অনেকক্ষণ ক্রন্দন করলেন। এরপর বললেন ঃ তাঁর প্রত্যেকটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক ছিল। তিনি এক রাত্রে আমার ঘরে তশরীফ আনলেন এবং আমার পাশে শয়ন করলেন। একটু পর তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি যদি অনুমতি দান কর তবে এ রাতটি আমি আমার প্রতিপালকের এবাদতে অতিবাহিত করি। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নৈকট্য ভালবাসি এবং আমি আপনার মর্জি যা তাও ভালবাসি। অতএব, আপনার মর্জি হলে আপনি এ রাত আল্লাহ্র এবাদতে অতিবাহিত করুন। এরপর তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং অজু করলেন। এরপর তিনি নামাযে দাড়ালেন এবং নামাযে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর দু' হাত উত্তোলন করে কাঁদতে থাকলেন। এমনকি আমি দেখলাম তাঁর অশ্রু ঝরে মাটিতে পড়ছে (এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হলো)। তখন হযরত বেলাল (রাঃ) হাযির হলেন ফজরের নামাযের সংবাদ দিতে। হযরত বেলাল (রাঃ) এসে দেখলেন তিনি ক্রন্দন রত রয়েছেন। হযরত বেলাল (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ পাক আপনার পূর্বাপর সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ হে বেলাল! আমি কি আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার বন্দা হবো না? এরপর এরশাদ করলেনঃ আমার কি হয়েছে যে কাঁদবোনা? অথচ এ রাত্রেই আল্লাহ্ পাক নাযিল করেছেন এ আয়াত সমূহ। অতঃপর আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করলেন। এরপর এরশাদ করেন, ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্যে যে এ আয়াত পাঠ করে অথচ চিন্তা করে না।[১]

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫২

এ নিদর্শন হলো আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের, তাঁর একত্ববাদের তথা তিনিই যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ভাগ্যনিয়ন্তা একথার অনেক প্রমাণ রয়েছে উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহে। তবে এ প্রমাণ উপলব্ধি করতে পারে শুধু তারা, যারা প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান। এখন প্রশ্ন হলো, প্রকৃত বুদ্ধিমান কারা?

এ প্রশ্নের জবাবে কেউ বলবেন ঃ যারা অতি অল্প সময়ে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে অনেক বেশী ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে তারাই বুদ্ধিমান। আর কেউ বলবেনঃ শুধ অর্থ-সম্পদই নয়, বরং যারা তাদের বুদ্ধির গুণে দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তারাই বুদ্ধিমান। আর কেউ বলবেন সে সব বিজ্ঞানীরা যারা নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করছেন তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। কিন্তু পবিত্র কোরআন তাদেরকে বুদ্ধিমান বলে না। কেননা, যাদের আলোচনা এতক্ষণ হলো তাদের বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ হয় এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনে। তাদের বুদ্ধির কোন ফলশ্রুতি মানুষের পরকালের চিরকালীন জিন্দেগীতে প্রকাশিত হয় না। অতএব সাময়িকভাবে তারা বুদ্ধিমান প্রমাণিত হলেও প্রকৃত অর্থে তারা বুদ্ধিমান বলে প্রমাণিত হয় না। এমনকি তাদের বুদ্ধির দীপ্তিতে তারা যে সম্পদ, শক্তি, আধিপত্য এবং নব নব আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেসব থেকেও তারা চির বঞ্চিত হয়, যখন মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হয়। অতএব তাদেরকে কোন অবস্থাতেই বুদ্ধিমান বলা যায় না।

তবে প্রকৃত বুদ্ধিমান কারা? আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে তার পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰۤئِكَ هَدٰهُمُ
اللّٰهُ وَاُولٰۤئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

(হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ দিন সে সব বন্দাদেরকে যারা মনযোগ সহকারে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে এবং আল্লাহর বাণী সমূহের অনুসরণ করে। যারা আল্লাহর বাণী মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং মেনে চলে তারাই হলো সে সব ভাগ্যবান লোক, যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন এবং প্রকৃত অর্থে তারাই বুদ্ধিমান লোক।

অতএব, বুদ্ধিমান লোকের দু'টি বৈশিষ্ট্য এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ (১) মনযোগ সহকারে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করা। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মনযোগ সহকারে যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে তারা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসও স্থাপন করে। অতএব, বুদ্ধিমান তারাই যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

স্থাপন করে এবং তাঁর বাণী সমূহ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে। (২) শুধু তাই নয়; বরং তারা আল্লাহর বাণী বা বিধি নিষেধ সমূহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলে কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে, সে জীবনে মানুষ ভোগ করবে তার এ জীবনের কর্মফল। এ জীবনে কর্ম আর পর জীবনে লাভ হবে সারা জীবনের কর্মের ফল। পর জীবনে কর্মের কোন সুযোগ আসবে না, বরং শুধু এ জীবনের কর্মফলই ভোগ করতে হবে। অতএব, যারা বুদ্ধিমান তারা শুধু এ জীবনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, বরং পর জীবনের জন্যে কর্ম তৎপর হয়। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে ব্যক্তিকে বলেছেন যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে অধিকতর নেক আমল সঞ্চয় করে। আর মৃত্যুকে স্মরণ করে অধিক পরিমাণে। কেননা মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমেই পরকালীন জিন্দেগীর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ আসে। যারা পরকালীন জিন্দেগীর প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই সত্যিকার বুদ্ধিমান। কিভাবে তারা এ প্রস্তুতি গ্রহণ করে তথা বুদ্ধিমান হওয়ার পরিচয় দেয় তার ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। এরশাদ হয়েছে–

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ প্রকৃত বুদ্ধিমান তারা যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় এক কথায় জীবনের সকল অবস্থায় যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, যারা দাতার অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে তাঁর দানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দাতাকে ভুলে যায় না; বরং সর্বক্ষণ তারা থাকে মহান দাতা আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় এবং বিভোর যেমন হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل احيانه

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকতেন। বিশেষত যে রাত্রিতে এ আয়াত নাযিল হয় সে রাত্রিটি তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটায় অতিবাহিত করেন। এতদ্ব্যতীত, জীবনের রাতগুলোর অধিকাংশ সময় তিনি আল্লাহর জিকরেই অতিবাহিত করেছেন। এমনকি এ কারণে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁকে আল্লাহর বন্দেগীতে এত কষ্ট করা থেকে বারণ করে এরশাদ করলেন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى

"(অর্থাৎ) পবিত্র কোরআনের যতখানি পাঠ করা তোমাদের জন্যে সহজ হয় ততখানি পাঠ কর, আল্লাহ পাক জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে"।

যাহোক, বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, সে কোন সময়ই আল্লাহকে ভুলে থাকেনা, বরং সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে থাকে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে থাকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। এজন্যেই হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

انا جليس من ذكرنى

অর্থাৎ ঃ আমি সে ব্যক্তির সঙ্গে উপবিষ্ট হই, যে আমাকে স্মরণ করে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে সে যেন জীবিত, আর যে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে না সে যেন মৃত"।

আর এভাবে আল্লাহর জিকরের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

"এবং তোমরা আমাকে স্মরণ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো. আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা"।

আল্লাহর জিকরের প্রতি গুরুত্ব

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের জিকরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের জিকরই যে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পন্থা তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর জিকরের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ পাক তাঁর সেই প্রিয় বন্দাকে স্মরণ করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে স্মরণীয় হওয়া, তাঁর নৈকট্য লাভেরই বাস্তব প্রমাণ। "আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাকে স্মরণ করবেন"– এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার বন্দার জন্যে আর কিছুই হতে পারে না।

জিকরের একাধিক প্রক্রিয়া

এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার যে, আল্লাহর জিকর করার প্রক্রিয়া একাধিক।

(১) জিকরে লেসানী অর্থাৎ রসনা দ্বারা আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলা।

(২) জিকরে ফে'লী অর্থাৎ এমন কাজ করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখে এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়া থেকে বিরত রাখে যেমন নামায।

(৩) জিকরে কালবী অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহর জিকর থাকা যেমন সুফিয়ায়ে কেরাম পাছ আন ফাছ এর তা'লীম দিয়ে থাকেন।

(৪) এমন জিকর যা সর্বদা স্বাভাবিকভাবে জারী থাকে।

আলোচ্য আয়াতে যে জিকরের কথা রয়েছে তার দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

(১) জিকরে দায়েমী অর্থাৎ সর্বাস্থায় আল্লাহর জিকর জারী থাকা, কোন অবস্থায়ই আল্লাহর জিকর থেকে মাহরুম না হওয়া।

(২) জিকরের প্রকৃতি অর্থাৎ ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা এক কথায় সর্বাবস্থায় জিকর অব্যাহত থাকা এবং দেহের কোন অঙ্গ জিকর থেকে মাহরুম না থাকা। যেমন রসনা দ্বারা জিকর করা এবং কানকে আল্লাহর কথার প্রতি আকৃষ্ট রাখা, আর চক্ষুদ্বয়কে সব কিছু থেকে দূরে রেখে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট রাখা এবং অন্তরকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন, মুগ্ধ মত্ত রাখা।

অতএব, এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় সর্বদা সর্বাবস্থায়, সর্বাঙ্গে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকাই বুদ্ধিমান বন্দার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহর জিকর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত।

এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

আর আল্লাহর জিকর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা যারা আসমান জমিন তথা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে।

সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা

বিশ্ব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করলে মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পায়। এ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিন, ভূবন উজ্জলকারী চন্দ্র, সূর্য, অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ এমনিভাবে আকাশচুম্বী পাহাড় পর্বত, অতল গর্ভ সমুদ্র, অগণিত জানা অজানা বৃক্ষ-তরুলতা, রকমারী ফল ফলারী এর কোন্‌টিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ নেই?

তাই যারা কল্যাণকামী, যারা সত্য সন্ধানী তাদের জন্যে রয়েছে সৃষ্টির এ লীলাভূমিতে তার স্রষ্টার অস্তিত্বের একত্ববাদের অগণিত উজ্জ্বল নিদর্শন, তবে সে নিদর্শন তারাই দেখতে পায় যারা বুদ্ধিমান। যারা নির্বোধ তারা আল্লাহর এ সমস্ত নিদর্শন দেখেও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা।

তাঁর অনন্ত অসীম দান গ্রহণ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। কিন্তু এ পৃথিবীতে সব যুগেই এমন এক দল লোক ছিল, আছে এবং থাকবে যারা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেও আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণায় আত্ম নিয়োগ করে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে, এক মুহূর্তের জন্যেও তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা

আল্লাহ পাকের কথা, তাঁর নির্দেশ ও নিদর্শনকে বিস্মৃত করেনা। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ হযরত শায়খ সুলায়মান দারানী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে এলে যে বস্তুটির প্রতিই দৃষ্টিপাত করি তাতে আমি দেখতে পাই যে আমার জন্যে আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত রয়েছে; আর তা দ্বারা আমি উপদেশ গ্রহণ করি। হযরত ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ঘন্টা কাল স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করা সারা রাত্রি আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা উত্তম কাজ।

হযরত ফোজাইল এবনে ইয়াজ বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন ঃ চিন্তা ও গবেষণা এবং মোরাকেবা এমনি একটি আয়না যা তোমার সম্মুখে তোমার ভাল মন্দ প্রকাশ করে দেবে।

হযরত সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বলেন ঃ চিন্তা ও গবেষণা হলো একটি নূর বা জ্যোতি যা তোমার অন্তরে ছায়া ফেলবে ঃ

اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهٗ فِكْرَةٌ فَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهٗ عِبْرَةٌ

"যে ব্যক্তির চিন্তা ও গবেষণার অভ্যাস থাকে তার জন্যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই উপদেশ থাকে"।

আর হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি ভাগ্যবান যার কথার মাধ্যমে আল্লাহর জিকর হয়, আর নীরব থাকায় চিন্তা ও গবেষণা হয় এবং দেখায় নসীহত ও উপদেশ হয়।

এ পর্যায়ে লোকমান হাকীমের কথাও উল্লেখযোগ্য ঃ একাকী ঘরের নিভৃত কোণে বসে চিন্তা ও গবেষণা করা যত বৃদ্ধি পাবে তা দ্বারা মানুষের জন্যে বেহেশতের পথ ততই নিকটতর হবে।

হযরত ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ ঘোরাফেরা যত বেশী হবে উপলব্ধি শক্তি তত বৃদ্ধি পাবে, আর উপলব্ধি যত বেশী হবে জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাবে। আর এলম বা জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে নেক আমলও ততই বৃদ্ধি পাবে।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ পাকের স্মরণে স্বীয় রসনার ব্যবহার উত্তম কাজ। আর আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা অত্যন্ত উত্তম এবাদত।

হযরত মুগীস আসওয়াদ মজলিসে উপবিষ্ট অবস্থায় অপেক্ষমান লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক দিন কবরস্থানে গমন কর, যাতে করে স্বীয় পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হয়। এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হবার সে দৃশ্যকে উপস্থাপন কর যে, তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে

উপস্থিত, তখন একদলকে জাহান্নামে পাঠাবার আর এক দলকে জান্নাতে পৌছাবার আদেশ হচ্ছে। নিজেকে এ অবস্থার সাথে একাত্ম কর। স্বীয় দেহকে সেখানে হাযির মনে কর। জাহান্নামকে নিজের সম্মুখে মনে কর, তার সর্ব প্রকার আযাবের প্রতি লক্ষ্য কর। এতটুকু বলার পর চিৎকার করে কাঁদতেন এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মুবারক (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি একজন ধর্ম যাজকের সাথে একটি কবরস্থান এবং ময়লা ফেলার স্থানে সাক্ষাত করে বললেন ঃ হে ধর্মযাজক! তোমার নিকট এখন দুটি সঞ্চয়ের স্থান রয়েছে। একটি মানুষ সঞ্চয়ের স্থান অর্থাৎ কবরস্থান, অপরটি হলো অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের স্থান অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানা ও যাবতীয় ময়লা ফেলার স্থান।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) কোন এলাকায় ধ্বংসাবশেষের নিকট গমন করে কোন ভাঙ্গা দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলতেন ঃ হে বিরাণ বাড়ী! তোমার অধিবাসী কোথায়? এরপর নিজেই জবাব দিতেন সবাই মাটির নীচে চলে গেছে, সকলেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে (কেননা এ পৃথিবীর সবই ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী শুধু এক আল্লাহ রব্বুল আলামীন)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ গভীর মনোযোগের সাথে দু' রাকাআত নামায সারা রাতের মনোযোগ বিহীন নামাযের চেয়ে উত্তম।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য গ্রহণ কর, এক তৃতীয়াংশ পানি পান কর, আর এক তৃতীয়াংশ সেই নিঃশ্বাসগুলোর জন্যে ছেড়ে দাও, যা দ্বারা তুমি পরকালীন জিন্দেগী সম্পর্কে, তোমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে এবং তোমার কার্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করবে।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ নশ্বর জগতের বস্তু সমূহের উপর উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত করেনা এবং নিজেকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত করে তার অন্তর-দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

হযরত বেশের হাফী (রঃ) বলেছেন ঃ যদি মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করতো তবে তাঁর নাফরমানী করা সম্ভব হতোনা।

হযরত আমের এবনে কাইস বর্ণনা করেন ঃ আমি অনেক সাহাবীর নিকট শ্রবণ করেছি যে, মানব অন্তরে ঈমানের আলোড়ন সৃষ্টি হয় চিন্তা, গবেষণা এবং মোরাকেবার মাধ্যমে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হে বনী আদম! তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, বিনয়ী হও, মসজিদকে বাড়ী মনে কর (বেশী সময় মসজিদে অতিবাহিত কর), দেহকে সহ্য ধৈর্যের শিক্ষা দাও, অন্তরকে চিন্তা ও

গবেষণায় অভ্যস্ত কর। আগামী কালের রুযির চিন্তা আজ করোনা (কেননা মানুষ আগামী দিনের চিন্তা করেই মজুদদারী করে, আর যখন সকলেই মজুদদারীতে অভ্যস্ত হয় তখন দেশে অভাব অনটন দেখা দেয়। পক্ষান্তরে যদি সকলেই আগামী দিনের চিন্তা ও মজুদদারী পরিত্যাগ করে তথা স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা বর্জন করে তবে অভাব অনটনের সম্ভাবনা কম থাকে, এজন্যেই ইসলাম মজুদদারীকে অবৈধ ঘোষণা করেছে)।

আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) একবার তাঁর মজলিসে বসে কাঁদছিলেন। উপস্থিত লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি দুনিয়ার এ জিন্দেগীর আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করছিলাম এবং তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে নসিহত হাসিল করলাম। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাতে বিশেষ এবং বিরাট উপদেশ রয়েছে।[১]

যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ

এ আয়াতে বিশেষভাবে দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রথমত, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের স্মরণ করার ওপর কেননা, মানুষ অহরহ সর্বত্র আল্লাহ পাকের অসীম নেয়ামত ভোগ করতে থাকে, তাই মানুষ মাত্রকেই সেই মহান দাতাকে স্মরণ করতে হবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ স্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা সৃষ্টি রহস্যের উপর সঠিকভাবে চিন্তা গবেষণা করে তারাই আল্লাহর বন্ধু বা ওয়ালীউল্লাহ খেতাবে ভূষিত হয়। আর তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"হুশিয়ার, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই, তারা এতটুকু চিন্তিতও হবে না"।

বস্তুত যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে তাদের ভয় ভীতি ও চিন্তা না থাকাই স্বাভাবিক, আর এ মহান সাফল্য লাভ হয় সৃষ্টির রহস্য মাঝে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি চিন্তা ও গবেষণা ফলশ্রুতি ঃ

শুধু তাই নয়, এমনকি আজকের এ আধুনিক বিশ্বে যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটছে, যান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক সাধনা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

যে পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে তাও এ চিন্তা ও গবেষণার ফলশ্রুতি বৈ আর কিছুই নয়।

বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টির মাঝে চিন্তা ও গবেষণা করেই নতুন নতুন বস্তুর সন্ধান করেন। সবই আল্লাহর সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকগণ শুধু তাদের কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে কোন বস্তুর মাঝে নিহিত লুপ্ত ও গুপ্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটান অথবা দু'টি বস্তুর মধ্যে সংমিশ্রণের মাধ্যমে তৃতীয় একটি বস্তুর উদ্ভাবন করেন।

৪০ জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক তাদের গবেষণার মাধ্যমে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ পেয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার উল্লেখ এ পর্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রন্থটির নাম হলো "The evidence of God in an expanding universe." এ গ্রন্থখানি পবিত্র কোরআনের এ দাবীর প্রকৃত প্রমাণ যে, যারা সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করবে তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাবে।

আজকের পৃথিবী বৈজ্ঞানিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, মানুষ ধরার ধূলা নিয়ে আর তৃপ্ত নয়। সে পাড়ি জমিয়েছে মহাশূণ্যের দিকে, আস্তানা গেড়েছে চন্দ্রলোকে, বৈজ্ঞানিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে অহরহ সর্বত্র, মানুষের এ সাধনা, বিজ্ঞানের এ জয় যাত্রা চিন্তা ও গবেষণার ফলশ্রুতি।

পবিত্র কোরআন সেকেলে নয়, অত্যাধুনিক

আজকের মানুষ বিজ্ঞানের ভক্ত, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের মাধ্যমে উপকৃত এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কিন্তু যে আল্লাহ পাক বৈজ্ঞানিকদেরকে এ শক্তি দান করলেন, যিনি সৃষ্টির মাঝে অফুরন্ত নেয়ামত রাখলেন, যাঁর দান স্বরূপ মানুষ লাভ করলো পানি থেকে বিদ্যুত, আর বিদ্যুত থেকে সে তার অগণিত প্রয়োজনের আয়োজন করলো। এমনিভাবে যে করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম করুণা সে অহরহ ভোগ করছে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর প্রতি মাথা নত করা যে মানুষের প্রধানতম কর্তব্য সে কথাও কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে স্মরণ রাখতে হবে। অতএব, আজকের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মাধ্যমেও যে আমরা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদের প্রমাণ দেখতে পাই একথা যেমন সত্য ঠিক তেমনি বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান যে উন্নতি অগ্রগতি সাধন করেছে তার আহ্বানও জানিয়েছে পবিত্র কোরআন আজ থেকে ১৪শ' বছর পূর্বে একথাও সত্য।

অতএব, পবিত্র কোরআন সেকেলে নয়, বরং অত্যাধুনিক। যারা কোরআনে করীমকে সেকেলে বলার ধৃষ্টতা দেখায় তারা শুধু নিজেদেরকে প্রকৃত সেকেলে বলেই প্রমাণিত করে। এভাবে শুধু তাদের জ্ঞানের দৈন্যেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। অন্ধ ব্যক্তি

যদি সূর্য উদিত হবার কথা অস্বীকার করে তবে তাতে বলার কিছুই থাকেনা। কোরআনে করীমে তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

"অন্ধ ব্যক্তি কি চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমান হতে পারে"?

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

জ্ঞানী আর মূর্খ কি এক সমান হতে পারে? জাগ্রত আর ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থা কি এক হতে পারে? জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত কি এক হতে পারে? যদি এসব প্রশ্নের জবাব না হয়, আর অবশ্যই না তবে যারা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে কোন দিন সচেষ্ট হয়নি, যারা কোন দিন পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধের উপর আমল করার সাধনা করেনি, যারা এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে সময় অতিবাহিত করেনি, যারা বিশ্ব সৃষ্টির উপর গবেষণা করে সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেনি, তারা পবিত্র কোরআনের এ মহাসমুদ্র থেকে মনি-মানিক্য আহরণে সক্ষম হবে না, এতো নিতান্ত স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে তারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত প্রত্যক্ষ করে স্বতঃস্ফুর্তভাবে একথা বলে ঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি এ বিশাল বিশ্বকে, পবিত্র তুমি, আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাও তাকে অপমানিত কর, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা একজন আহ্বায়কের আহ্বান শ্রবণ করেছি অর্থাৎ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ঈমানের আহ্বান শ্রবণ করেছি, যিনি এই বলে আহ্বান করেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, যিনি তোমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং রিয্‌কদাতা, তাঁর প্রতি তোমরা ঈমান আন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমার প্রতি ঈমান এনেছি।

হে প্রতিপালক! আমাদের জীবনের সব গুনাহ্ তুমি মাফ কর। আমাদের পাপ-পংকিলতা দূরীভূত কর এবং নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু মুখে পতিত করাও।

হে পরওয়ারদেগার! তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের ব্যাপারে যেসব ওয়াদা করেছ (তথা আখেরাতে জান্নাত লাভ এবং তোমার দীদার নসীব হওয়া এবং তোমার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া) তা আমাদেরকে দান কর। আর কেয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করোনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বন্দাকে তাঁর নিকট ডেকে তাঁর কুদরতী হাত তার প্রতি রাখবেন এবং অন্য মানুষের নিকট থেকে গোপন করে তার আমলনামা তাকে দিয়ে বলবেন, তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। হুকুম মোতাবেক সে আমলনামা পাঠ করবে এবং নেক আমলের বিবরণ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন ঃ হে বন্দা! এ আমলটির পরিচয় তুমি পেয়েছ? সে আরজ করবে ঃ হে পরওয়ারদেগার! হ্যাঁ পেয়েছি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ আমি তোমার নেক আমল কবুল করেছি। তখন ঐ বন্দা সঙ্গে সঙ্গে সেজদা রত হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ তোমার মাথা ওঠাও এবং আমলনামা আরো পড়। আদেশ মোতাবেক বন্দা আমলনামা পাঠ করবে; যখন মন্দ কাজের বিবরণ দেখবে তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যাবে এবং সে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ হে আমার বন্দা! তুমি কি এ মন্দ কাজটির পরিচয় পেয়েছ? বন্দা আরজ করবে ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! পেয়েছি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ আমি এ বিষয়ে তোমার চেয়ে চেশী ওয়াকেফহাল তবে তোমার এ গুনাহ্ আমি মাফ করে দিয়েছি। এভাবে বন্দা আমলনামা পাঠ করতে থাকবে, নেক আমলের বিবরণ পাঠ করলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কবুলিয়তের ফরমান শ্রবণ করে সেজদা করবে এবং বদ আমলের বিবরণ পাঠ করবে এবং ক্ষমা লাভের সুসংবাদ শ্রবণ করে সেজদা করবে। অন্যরা এ বিষয়ে কিছুই জানবে না। শুধু সেজদা রত হওয়া দেখবে। এজন্যে পরস্পর চুপিসারে বলবে ঃ সুসংবাদ সে বন্দার জন্যে যে কখনও আল্লাহর নাফরমানী করেনি।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর সঙ্গে কি ব্যাপার হয়েছে তা কেউ জানতেই পারবে না।[১] (বায়হাকী)

মূলতঃ এটিই হলো কেয়ামতের দিন অপমানিত না করার তাৎপর্য।

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

(হে পরওয়ারদেগার!) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি তোমার ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

তুমি অবশ্যই মোমেনকে তার নেক আমলের সওয়াব দান করবে এবং যে তোমার নিকট দোয়া করে, তুমি অবশ্যই তার দোয়া কবুল করবে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬১-৬২

আমালুল কোরআন

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ পর্যন্ত আয়াত সমূহ যে ব্যক্তি সর্বদা পাঠ করবে তার ঈমান মজবুত থকবে আর দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের অপমান থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করবেন।

এতদ্ব্যতীত এ আয়াত সমূহ যদি কাষ্ঠ নির্মিত প্লেটে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করে পান করা যায় তবে রাতের যে কোন সময় জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা করে তবে জাগ্রত হতে পারবে।

ফাজায়েলুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ থেকে تُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন তখন ঘরের বাইরে এসে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন এবং এ আয়াত সমূহ পাঠ করতেন। (বোখারী শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা আলোচ্য আয়াত সমূহের ফজিলত প্রমাণিত হয়। যে ব্যক্তি ঐ সময় এ আয়াত পাঠ করে কোন দোয়া করবে ইন্‌শাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

তরজমা

(১৯৫) অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কি পুরুষ কি নারী কারোই নেক আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অন্যের অংশ অতএব, যারা হিজরত করেছে এবং তাদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আর আমারই পথে অত্যাচারিত হয়েছে ও জেহাদ করেছে এবং নিহত হয়েছে। নিশ্চয় আমি তাদের অন্যায় সমূহ দূরীভূত করবো। অবশ্যই আমি তাদেরকে

সেই বেহেশতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ থেকে বহু নহর প্রবাহিত হয়। এটি হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কর্মফল স্বরূপ; আর আল্লাহ পাকের নৈকট্যই শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বোত্তম কর্মফল।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

বর্ণিত আছে উম্মুল মোমেনীন হযরত সালমা (রাঃ) একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ প্রশ্ন করেন যে, পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও হিজরত করতে হয়েছে, সইতে হয়েছে অনেক নির্যাতন কিন্তু পবিত্র কোরআনে মেয়েদের পূণ্য সাধনার কোন উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না, তার জবাবেই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

কোন নেক আমল বিনষ্ট হয়না

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের নেক আমলের প্রতি আল্লাহ পাক গুরুত্বারোপ করেন। কারো নেক আমলই আল্লাহ পাক বিনষ্ট করেন না। কোন সত্য-সাধনাই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ব্যর্থ হয় না। পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক উভয়ের আমলই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়। কোন নেক আমলের জন্যে একজন পুরুষ যে সওয়াব লাভ করে একজন স্ত্রীলোকও তেমন নেক আমলের জন্যে অনুরূপ সওয়াব লাভ করে। সওয়াবের ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয়না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম আমলও যখন আল্লাহ পাকের দরবারে ব্যর্থ হয় না তখন হিজরতের ন্যায় মহান আমল ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

যারা আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে স্বদেশ তথা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে যায়। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী সম্ভব নয় সেখান থেকে হিজরত করে এমন স্থানে চলে যায় যেখানে আল্লাহর বন্দেগী সম্ভব হয়, ইসলামের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তারা অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করে কিন্তু কোন অবস্থাতেই সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করেনা, ঈমানের প্রশ্নে কোন মীমাংসা করেনা। চরম উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেও ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখে, এমন সত্য-সাধকদের আমল কি বিনষ্ট হতে পারে? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন যে, মোমেনদেরকে শুধু এজন্যে কষ্ট দেয়া হয়েছে যে, তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থাৎ মোমেনদের কোন দোষ ছিল না, দোষ বলতে শুধু এতটুকু যে তারা

বিশ্বাস স্থাপন করেছে এক আল্লাহর প্রতি– যিনি পরাক্রমশালী, স্বয়ং প্রশংসিত। এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

(কাফেররা আল্লাহর রসূলকে এবং তোমাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে কেননা, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামের দরবারে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেই, আল্লাহর রাহে বীরত্বের সঙ্গে জেহাদ করি এবং শাহাদাত বরণ করি তবে আল্লাহ্ পাক কি আমার গুনাহ্ মাফ করবেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে বলেন, তুমি কি বলেছিলে আবার বলতো?

উক্ত সাহাবী পুনরায় তাঁর প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ (মাফ করবেন)। তবে কারো ঋণ যদি থাকে তবে তা মাফ হবে না, একথাটি এই মাত্র জীব্রাঈল (আঃ) আমাকে বলে গেলেন।[১]

مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

আলোচ্য আয়াতে নারী এবং পুরুষ উভয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে বর্বরতার যুগে নারী জাতির অবমাননা ছিল সর্বত্র। নারী জাতি ছিল হীন এবং ঘৃণ্য। কারো বাড়ীতে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে অবমাননার কারণ মনে করা হতো। এমনকি পিতা স্বয়ং তার কন্যাকে জীবন্ত কবরস্ত করতো। এজন্যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ۞ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

(যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?) এমনিভাবে খৃষ্টানদের নিকট নারী জাতির অস্তিত্বই একটি অপরাধ। এমনি অবস্থায় পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এ আয়াতে ঘোষণা করেছে যে, নেক আমলের শুভ পরিণতি লাভে নারী পুরুষ উভয়ে সমান। পুরুষ তার সত্য-সাধনার মূল্য পাবে আর নারী হবে বঞ্চিত– এমন অন্যায় কথা ইসলাম বলে না। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক ইসলাম নারী ও পুরুষের প্রতি সমান দৃষ্টিতে দেখে। নারী ও পুরুষ একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখে। নারী ব্যতীত পুরুষের অস্তিত্ব কোথায়? আর পুরুষ ব্যতীত নারীর মূল্য কোথায়? মূলতঃ নারী পুরুষ একে অন্যের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৫৯

পরিপূরক। পবিত্র কোরআনের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা অন্ধকার যুগের অমানিশা কেটে দেয় এবং যারা অন্যায় মতবাদে বিশ্বাস করতো তাদের মনের অন্ধকার দূর করে।[১]

মানবতার এ মহান শিক্ষা ইসলামই দিয়েছে।

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

"তোমরা পরস্পর একে অন্যের"।

কালবী (রঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো দ্বীনের ব্যাপারে নারী পুরুষ একে অন্যের সাহায্যকারী এবং একে অন্যের সঙ্গে একাত্ম। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বংশ এবং মানবতার দিক থেকে নারী পুরুষ এক, অভিন্ন কেননা, সকলেই আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। পুরুষ মাত্রই নারীর তথা তার মায়ের উদর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়; আর নারী মাত্রই পুরুষদের তথা তার পিতার পৃষ্ঠ দেশ থেকে বেরিয়ে আসে। অতএব, নারীকে হীন বা ঘৃণ্য বলার অধিকার কারোই নাই। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ পুরুষরা যেমন তাদের সৎ কাজের সওয়াব পাবে, অনুরূপভাবে নারী জাতিও তাদের সত্য-সাধনার শুভ পরিণতি লাভ করবে।[২]

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হিজরত করেছে, যাদেরকে তাঁদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার পথে চরম কষ্ট দেয়া হয়েছে তথা আমার প্রতি আনুগত্যের কারণে এবং আমার দ্বীন কবুল করার কারণে অথবা আমার প্রতি ঈমান আনার কারণে তাদের প্রতি নির্যাতন করা হয়েছে, তারা সত্যের জন্যে জেহাদ করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবো এবং তাদেরকে মাগফেরাত দান করবো। তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

হাদীস শরীফে এ নহর সমূহের বর্ণনা রয়েছে এভাবে– এ নহর সমূহের মধ্যে কোনটি দুধের নহর হবে, কোনটি মধুর নহর হবে, আর কোনটিতে স্বচ্ছ পানি থাকবে; আর তাতে এমন নেয়ামত সমূহ থাকবে যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি, যার কথা কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি এবং যার অবস্থা কোন মানব অন্তর চিন্তাও করেনি এটি হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোমেনদের জন্যে শুভ পরিণতি।

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

আর আল্লাহ নিকট রয়েছে সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিদান। কেননা এমন প্রতিদান আর কেউ দিতে পারে না। অথবা এর অর্থ হলো তারা আল্লাহর নৈকট্যে ধন্য হবে, তাঁর দিদার লাভ করবে আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আর এ নেয়ামত আল্লাহ পাক দান

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৩
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬২

করবেন তাদেরকে, যাদের সাধনা এবং আরাধনার কথা উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ মোমেনগণ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ ঈমানের পর তারা আল্লাহর জিকরে মশগুল হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর জিকরে নিমগ্ন ও তন্ময় রয়েছে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এমনকি শায়িত অবস্থায়ও আল্লাহর জিকর থেকে তারা ক্ষণিকের জন্যেও বিরত হয়নি, এমনকি তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তার অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং সৃষ্টি নৈপূণ্যের উপর চিন্তা ও গবেষণা করেছে–

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ তারা আসমান ও জমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করে। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে তারা আল্লাহ্ পাকের হামদ বর্ণনা করে বলে–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! তুমি এ বিশ্ব জগৎ অহেতুক সৃষ্টি করোনি। পবিত্র তুমি। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছেঃ

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ থেকে শুরু হয়ে لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ পর্যন্ত শেষ হয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দোয়া কবুল হবার জন্যে উপরোল্লিখিত শর্ত বা আদব সমূহ রয়েছে। যারা এসব শর্ত পূরণ করবে তথা দোয়ার আদব রক্ষা করবে তাদের দোয়া কবুর হয়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দোয়া পুরুষ বা নারী যার তরফ থেকেই হোক তা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়। নারী পুরুষের মধ্যে দোয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয় না।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো মানুষ আল্লাহ পাকের আনুগত্যে যে আমল করবে তিনি তার সওয়াব বা শুভ পরিণতি অবশ্যই দান করবেন। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

أَنِّىْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কোন আমলকারীর আমলকে বিনষ্ট করিনা এবং তোমাদের দোয়াকে বৃথা যেতে দেইনা। তথা–

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

অর্থাৎ যারা তাদের প্রিয় মাতৃ-ভূমি পরিত্যাগ করে হিজরত করেছে মদীনা তৈয়্যেবায় এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে তথা– যাদেরকে এজন্যে তাদের মাতৃ-ভূমি থেকে বহিঃস্কার করা হয়েছে এবং যাদেরকে আল্লাহর রাহে চরম কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের জন্যে খোশখবরী হলো এই যে, তাদের জীবনের এ অক্লান্ত সাধনার জন্যে দান করা হবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মহান দান। এর দৃষ্টান্ত হলো যখন কোন বাদশাহ তার গোলামকে বলে, আমি তোমাকে আমার তরফ থেকে বিশেষ দানে ধন্য করব, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যখন আল্লাহর রাহে জীবনের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষণ করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ সওয়াব বা শুভ পরিণতি দান করবেন।[১]

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ
بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

তরজমা

(১৯৬) (হে রসূল!) কাফেরদের শহরে বন্দরে গমনাগমন যেন আপনাকে প্রতারিত না করে।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪৯-৫১

(১৯৭) এতো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, অতঃপর দোযখই হবে তাদের আবাস-স্থল এবং কত নিকৃষ্ট সেই আবাস-স্থল!

(১৯৮) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করবে তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রয়েছে এমন স্বর্গোদ্যান সমূহ যার তলদেশে বহু নহর সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর তরফ থেকে তা হলো আতিথ্য। আর নেককারদের জন্যে আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা অতি উত্তম।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন যে, পৌত্তলিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে আনন্দ উল্লাসে থাকতো, তাদের এ অবস্থা দেখে কোন কোন মুসলমানের মনে এ ভাবনা আসে যে, এ পৌত্তলিকরা আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও এত স্বচ্ছল অবস্থায় এত আনন্দ উল্লাসে জীবন যাপন করে, অথচ আমরা মোমেন হওয়া সত্ত্বেও এত অভাব-অনটনের কষ্টে কাল যাপন করি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) শানে নুযুল সম্পর্কে এ বিবরণ দেয়ার পর আরেকটি বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তদানীন্তন কালের ইহুদীরা দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং বেশ অর্থ-সম্পদ রোজগার করতো। কোন কোন মুসলমানের অন্তরে এ ভাবনা দেখা দেয় যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ, দেশ-বিদেশে ভ্রমণরত আর আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও দারিদ্র-পীড়িত এ অবস্থা কেন হবে? তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।[২]

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের আনন্দ-উল্লাস বা ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। সুতরাং পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি, আরাম আয়েশ যেন মোমেনকে প্রতারিত না করে অর্থাৎ এ রং তামাসার প্রতি যেন মর্দে মোমেন লোলুপ দৃষ্টিতে না দেখে কেননা, এসব মর্দে মোমেনের জন্যে হীন, ঘৃণ্য এবং তুচ্ছ ব্যাপার।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যদি দুনিয়া এবং তার যাবতীয় সম্পদের গুরুত্ব আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে থাকতো তবে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে এ নেয়ামত পানির এক ঢোক পরিমাণও দিতেন না।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৩
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫২

অতি সামান্য সম্পদ

মূলতঃ দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য। এর ভোগের সময়ও অত্যন্ত সীমিত, আর আখেরাতের জিন্দেগী অনন্ত অসীম। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য,

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

আর আখেরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ কোন পাপী ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ দেখে সেদিকে আকৃষ্ট হয়োনা; বরং চিন্তা কর যে, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা হবে। আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্যে তাকে শেষ করার জন্যে এমন এক বস্তু রয়েছে যা কোন দিন শেষ হবে না অর্থাৎ দোযখ। (বগবী)

হযরত মোসাওয়ার এবনে সাদ্দাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ যদি সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করে আনে এবং লক্ষ্য করে সমুদ্রের অথৈ পানির মধ্য থেকে কতখানি তার আঙ্গুলে এসেছে। (মুসলিম শরীফ)

এতদ্ব্যতীত হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ দুনিয়ার নেয়ামত আল্লাহ পাক তাদেরকেও দান করেন যাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং যাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু তাদেরকেই দান করেন যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। এজন্যেই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যখন আল্লাহ পাক তাঁর আর্থিক দুর্গতি দেখে এ প্রস্তাব প্রেরণ করলেন যে, হে আমার প্রিয়নবী! আপনার জন্যে ওহোদের পাহাড়কে স্বর্ণের পাহাড়ে রূপান্তরিত করে দেই? তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যদি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হই তবে আমার উম্মত দুনিয়াদার হয়ে যাবে। আমি তো একদিন আহার করে তোমার দরবারে শোকর গুজার হতে চাই, আর একদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করে সবর অবলম্বন করতে চাই।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি খালি চাটাইয়ে বিশ্রামরত রয়েছেন। তাঁর শুভ্র সুন্দর দেহ মুবারকে চাটাইয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! রোম এবং পারস্য সম্রাটরা কত আরাম আয়েশে জীবন যাপন করেছে আর আপনি দোজাহানের বাদশাহ হয়েও এত কষ্ট কেন করছেন?

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে ওমর! তুমি এখনও এ ভুলে রয়েছ? আমার অবস্থাতো সেই ভ্রমণকারীর ন্যায় যে বৃক্ষের ছায়াতলে ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম করে। এরপর মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যায়"।

অর্থাৎ আমাদের এ জিন্দেগী নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, এখানকার সুখ-দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী। অতএব, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ দুঃখের কথা ভুলে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন ঃ হে আমার রসূল! আপনাকে তথা আপনার উম্মতকে কাফেরদের ধন-সম্পদ যেন প্রতারিত না করে। কেননা তাদের এ অবস্থা তো দুদিনের বসন্ত মাত্র। এরপর তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে দোযখ, যা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

বস্তুতঃ এজন্যেই পরিণামদর্শী লোকেরা দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এর সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তারা দুনিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন–

১. দুনিয়া এমন একটি তূর পর্বত, যা অনেক মূসাকে (আঃ) দেখেছে।

২. দুনিয়া এমন একটি সেতু, যার ওপর দিয়ে আখেরাতের যাত্রীরা পার হয়। যারা পরিণামদর্শী, তারা সেতুর উপর গৃহ নির্মাণ করেনা।

৩. দুনিয়া এমন একটি বাগান, যার প্রতিটি ফুলের সঙ্গে রয়েছে কাঁটা, এ ফুল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

৪. দুনিয়া এমন একটি মূসাফিরখানা, যাকে শুধু হতভাগা লোকেরাই নিজের স্থায়ী বাসস্থান মনে করে।

৫।. দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো আত্মসংশোধন, আর সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যের সমালোচনা।

৬. দুনিয়াতে যদি তোমার কোন গুনাহ না-ও হয়, তবে দুনিয়ার মহব্বতই তো সবচেয়ে বড় গুনাহ।

৭. দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়োনা কেননা, ইতিপূর্বে যারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাদের সকলকে সে বিদায় করে দিয়েছে।

৮. এ দুনিয়াতে কোন পাপকে ক্ষুদ্র মনে করোনা কেননা, গন্দমের একটি মাত্র দানা হযরত আদম (আঃ) -কে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে।

৯. দুনিয়া গাফলতের স্থান নয়, বরং অত্যন্ত সতর্কাবস্থায় জীবন যাপন করার এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের স্থান।

১০. দুনিয়া একটি স্বপ্ন, এর অধিবাসীরা ঘুমন্ত, যখন মৃত্যু আসবে তখনই তারা জাগ্রত হবে।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ- الاية

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে জীবন যাপন করে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে তাদের জন্যে রয়েছে এমন স্বর্গোদ্যান সমূহ যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। এ স্বর্গোদ্যান সমূহে তারা চিরদিন থাকবে। আর আল্লাহর তরফ থেকেই হবে তাদের এ মেহমানদারী। এ স্বর্গোদ্যান সমূহে আল্লাহর অনন্ত নেয়ামত রয়েছে।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

"(অর্থাৎ) নেককারদের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে যা কিছু রয়েছে তা অতি উত্তম"।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করে এবং নিজেদের পিতা-মাতার হক্ব আদায় করে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে তারাই হলেন সত্যিকার অর্থে আবরার। আর তাদের শুভ পরিণতির কথা তথা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভের ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ তোমরা কি জান জান্নাতে সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ দারিদ্র-পীড়িত মোহাজেরগণই সর্বপ্রথম বেহেশতের প্রবেশ করবে। যারা মুসলমানদের সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত থাকত এবং মুসলমানদের উপর কোন বিপদাপদ আসতে দিতনা, আর এভাবে মৃত্যু বরণ করে যে, মনের কোন আকাঙ্ক্ষা তারা প্রকাশ করতো না। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেবেন, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে সালাম কর। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন ঃ তারা ছিল আমার বন্দা, আমার বন্দেগীই ছিল তাদের কাজ। তারা আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তাদের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র সংরক্ষিত ছিল। কাফেরদের জুলুম অত্যাচার থেকে নিরাপদে ছিল। তখন ফেরেশতারা প্রত্যেক দুয়ার দিয়ে তাদের নিকট আসবে এবং বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা দুনিয়াতে সবর অবলম্বন করেছিলে। তাই আখেরাত তোমাদের জন্যে অতি উত্তম।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীকে মেহমান ঘোষণা করেছেন। কেননা نزلا শব্দটির তাৎপর্য হলো সেই বিশেষ খাদ্য যা মেহমানের জন্যে প্রস্তুত

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৬
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪

করা হয়। এতদ্বারা জান্নাতবাসীগণকে এত উচ্চ মর্তবা প্রদান করা হয়েছে যার বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ
لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

তরজমা

(১৯৯) এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তোমাদের নিকট ও তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবেও তারা বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে এবং আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে হীন মূল্যে বিক্রি করেনা। এ সমস্ত লোকের জন্যেই তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পুরস্কার রয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(২০০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ও সহনশীলতায় প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন মোত্তাকীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে আহলে কিতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে হীন মূল্যে বিক্রি করেনি, যারা তাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর যে বিবরণ রয়েছে, তা গোপন করেনি তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে।

ইমাম নেসায়ী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা এবং এবনে জরীর (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর আসে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তার উপর তোমরা জানাযার নামায পড়। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি

একজন হাবশী গোলামের উপর নামায পড়বো? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাজ্জাশী সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যেদিন নাজ্জাশীর মৃত্যু হয় সেদিনই হযরত জিব্রাইল (আঃ) প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর নামাযে জানাযা আদায় কর, তাঁর মৃত্যু হয়েছে অন্য দেশে। অতঃপর তাঁরা বাকী নামক স্থানে গমন করলেন। আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে মদীনা শরীফ থেকে হাবশা (আবিসিনিয়া) পর্যন্ত পথের আড়াল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তিনি সচক্ষে দেখে নাজ্জাশীর নামাযের জানাযা আদায় করেন। এ নামাযে চারটি তকবীর ও মাগফেরাতের দোয়া ছিল। মুনাফেকরা বলতে লাগলো দেখ, একজন হাবশী খৃষ্টানের নামায পড়ছেন যে তাঁর দ্বীনে বিশ্বাসী ছিল না। আর তিনি তাকে কখনও দেখেননি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুনাফেকদের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কেননা, নাজ্জাশী আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নাজ্জাশীকে দেখারও তৌফিক দান করেছেন।

আতা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ৪০ জন নাযরানবাসী সম্পর্কে যাদের ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার অধিবাসী আর ৮ জন ছিল রোমের অধিবাসী। এরা ইতিপূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

এবনে জরীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সে সব আহলে কিতাব সম্পর্কে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র গ্রন্থ আসমানী কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ইতিপূর্বে তাঁদের প্রতি যে আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার প্রতিও তারা ছিল বিশ্বাসী এবং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ করেছে, তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৬
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫৪

থাকতো ভীত এবং তৌরাতের যে সব আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বিবরণ ছিল সে আয়াত সমূহকে গোপন করে তার বিনিময়ে কোন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করেনি। অতএব তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ পুরস্কার। যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ

(সূরার কাসাস)

(এরা সে সব লোক যাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে দু' বার।)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের সওয়াব দ্বিগুণ। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হলো সেই আহলে কিতাব যে পূর্বে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান এনেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

আহলে কিতাব সম্পর্কে সূরা কাসাসে আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ

(এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এই কিতাব বিশ্বাস করে।)

এর পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ- الاية

অর্থাৎ যখন তাদের নিকট এই কিতাব (পবিত্র কোরআন) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে আমরা এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস করি, এটিই আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সত্য গ্রন্থ। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।

আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

"হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একদল হেদায়েত প্রাপ্ত লোকও রয়েছে যারা হক্ব বা সত্যকে গ্রহণ করেছে এবং যারা হক্ব বা সত্যের সঙ্গে বিচার করে"।

আর হাদীস শরীফে একথাও বর্ণিত আছে যে হযরত জাফর এবনে আবি তালেব (রাঃ) যখন নাজ্জাশীর দরবারে সূরা মরয়মের তেলাওয়াত করেছিলেন তখন বাদশাহ স্বয়ং এবং তার দরবারের লোকেরা পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করে ক্রন্দন করেছিল। এমনকি তাদের অশ্রুর কারণে দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল।

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক অতি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।) অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষকে তার আমলের পুরষ্কার বা শাস্তি অতি সত্ত্বর দেবেন। একথাটির একটি তাৎপর্য হলো এই, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের ভাল-মন্দ আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অতএব পুরষ্কার বা শাস্তি প্রদানে আদৌ বিলম্ব করা হবে না। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক দিনের অর্ধেক সময়ে সমগ্র মানব জাতির হিসাব নিকাশ সুসম্পন্ন করবেন। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, তোমাদের সঙ্গে নেক আমলের বিনিময়ের ব্যাপারে যে অঙ্গীকার করা হলো তা অতি সত্ত্বর পূর্ণ করা হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا

এ আয়াতে এ সূরাটির মর্মকথা পেশ করা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এতে রয়েছে মুসলমানদের জন্যে বিশেষ উপদেশ। এজন্যে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ হে মোমেনগণ! তোমরা যদি দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানেই সাফল্যমণ্ডিত হও তবে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যে তোমরা সুদৃঢ় ও অবিচল থাক। ইসলামী বিধি-নিষেধের উপর সুদৃঢ়ভাবে আমল করতে থাক।

এ পর্যায়ে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে থাক। আপন প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, তাঁর প্রতি মহব্বত এবং তাঁর আনুগত্য যে কোন মূল্যে প্রকাশ করতে থাক।

হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেছেন, সবরের অর্থ হলো বিপদাপদের মোকাবেলায় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া এবং অস্থির না হওয়া।

وَصَابِرُوا অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের মোকাবেলায় অটল থাকতেন, লৌহ প্রাচীরের ন্যায় শক্ত, সুদৃঢ় এবং হিমালয়ের ন্যায় অটল অবিচল হয়ে দণ্ডায়মান থাকেন। কেননা জেহাদে যেভাবে দুশমনরা কষ্ট ভোগ করে তেমনি তোমরাও কষ্ট ভোগ কর, কিন্তু তাদের পরকালের কোন আশা নেই; বরং তাদের শাস্তি অবধারিত। আর তোমরা আল্লাহর দরবার থেকে জান্নাতের আশা কর; আর জান্নাত লাভের আশায় যত কষ্টই হোক না কেন তা অতি সামান্য।

وَرَابِطُوا

অর্থাৎ মুসলমানদের সীমান্তে দুশমনের মোকাবেলা করার জন্যে নিজে তৈরী থাক অথবা এর অর্থ হলো নিজের প্রাণ, অন্তর এবং দেহকে আল্লাহর জিকর এবং তাঁর আনুগত্যের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত রাখ। আর মসজিদে এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্যে অপেক্ষা কর, আল্লাহর জিকরের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্যে তৈরী হও।

'রব্‌তুন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছু বেধে নেয়া, এর তাৎপর্য হলো সীমান্তে অশ্ব বেধে রাখা। এ শব্দটির ব্যাখ্যা আরো সম্প্রসারিত হওয়ার পর এর

অর্থ হলো সীমান্তে আক্রমণকারী দুশমনের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকা, তার নিকট অশ্ব থাকুক বা না থাকুক। অতঃপর এর অর্থ আরো সম্প্রসারিত হলো, আর এ শব্দটি সীমান্ত প্রহরায় রত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগলো।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুসলিম শরীফ এবং নেসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "এস আমি তোমাদেরকে বলি, কোন্ জিনিসের কারণে আল্লাহ্ পাক গুনাহ্ সমূহকে দূরীভূত করেন এবং মর্তবা বুলন্দ করেন (১) কষ্ট হলেও ভালভাবে পূর্ণ অজু করা। (২) দূর থেকে মসজিদে হাযির হওয়া এবং (৩) এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষা করা। এটিই পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'রবাত' আর এটিই আল্লাহর রাহের প্রস্তুতি। এবনে মরদবিয়ায় রয়েছে, একবার হযরত আবু সালমা (রাঃ)-কে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতঃষ্পুত্র! তুমি কি জান এ আয়াতে শানে নুযুল কি? আবু সালমা (রাঃ) বললেন, জানিনা। তখন তিনি বললেন, শোন! তখন কোন যুদ্ধ ছিলনা, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা মসজিদকে আবাদ রাখতো, যারা সঠিক সময় নামায আদায় করতো এবং এরপর আল্লাহর জিকরে মশগুল হতো। তাদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে যে তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বদা সুদৃঢ় থাক এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এ আমল সমূহই হলো জীবন-সাধনায় সাফল্য অর্জনের সঠিক পন্থা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো লিখেছেন যে, رَابِطُوا শব্দটির অর্থ দুশমনের সঙ্গে জেহাদ করা। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রহরা দেয়াও তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এ পর্যায়ে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী সমূহের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

একদিনের সীমান্ত প্রহরার প্রস্তুতি দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে তার থেকে উত্তম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলিত হয়েছে বোখারী শরীফে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, এক দিন ও রাতের জেহাদের প্রস্তুতি পূর্ণ এক মাসের রোজা এবং এক মাসের রাত্রি জাগরণের চেয়েও উত্তম।

আর যদি এ প্রস্তুতি রত অবস্থায় মৃত্যু আসে তবে সে ব্যক্তি যত নেক আমল করতো তার সওয়াব সে পেতে থাকবে, আর আল্লাহর দরবার থেকে তাকে রিযক পৌঁছানো হবে। আর সকল বিপদাপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৭

মসনদে আহমদে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের দ্বার বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জেহাদে থাকে এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাকে কবরের আযাব থেকে নাজাত দেয়া হয়।

আর এবনে মাজার (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে, সে কেয়ামতের দিনের ভয়-ভীতি থেকেও নিরাপদ থাকবে।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) একবার মসজিদে নববীতে মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছিলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কথা শুনেছি, তা এখন আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহর রাহে এক রাত্রি প্রহরায় রত থাকা এক হাজার রাত্রি এবাদতের চেয়েও উত্তম, যে রাত সমূহ আল্লাহর এবাদতে এবং দিনগুলো রোজা অবস্থায় অতিবাহিত করা হয়। আমি এতদিন তোমাদের নিকট এ হাদীস এজন্যে বলিনি যে, আমার ভয় ছিল যদি আমি এই হাদীস তোমাদের নিকট বর্ণনা করি তবে তোমরা মদীনা শরীফ ছেড়ে রণাঙ্গনে চলে যাবে। এখন আমি এ হাদীস শুনিয়ে দিলাম। অতঃপর ইচ্ছা মাফিক তোমরা কর্মসূচী গ্রহণ করতে পার। এরপর তিনি বললেন, আমি কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি সাক্ষী থাক।[১]

অনুরূপ কয়েক খানি হাদীস তফসীরে মাজহারীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২]

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, হয়ত এ সমস্ত নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তোমরা সফলকাম হবে।

'ফালাহ' শব্দটির তাৎপর্য হলো কোন অপছন্দনীয় বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করে প্রিয় বস্তু পাওয়া। অতএব, পবিত্র কোরআনের এ বিধি- নিষেধ পালনের মাধ্যমেই মানব-জাতি জীবন-সাধনায় সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে।

সূরা আলে-এমরান তেলাওয়াতের ফজিলত ঃ

হযরত ওসমান এবনে আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সূরা আলে এমরানের শেষ আয়াত সমূহ কোন রাতে তেলাওয়াত করবে, সারা রাত এবাদত করার সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। (দারমী)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৬২
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৮

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-এমরান পাঠ কর। এ দুটি সূরা কেয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্যে ছায়া দানকারী হবে। এ দুটি সূরা তাদের পাঠকদের জন্যে হবে সাহায্যকারী। (মুসলিম শরীফ)

হযরত এবনে সামান (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন পবিত্র কোরআন ও তার সেই পাঠকদেরকে পেশ করা হবে যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি আমল করতো। সর্ব প্রথম বাকারা এবং সূরা আলে এমরান থাকবে। এ দুটি সূরা দুটি আবর বা কালো বর্ণের শামীয়ানার ন্যায় থাকবে। অথবা মনে হবে যে দুটি পাখি দলের সুন্দর দৃশ্য। এ দুটি সূরা তাদের পাঠকদের সাহায্য করবে। (মুসলিম শরীফ)

মকহুল (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা আলে এমরান পাঠ করে রাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে দোয়া করে থাকে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা আলে-এমরানের তফসীর অদ্য শেষ হলো।
২১শে রবিউল আউয়াল ১৪০৮ হিজরী

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নেসা

সূরা নেসার ভূমিকা

সূরা নেসা মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়। এতে রয়েছে ১৭৬ আয়াত, ৩,০৪৫টি বাক্য এবং ৬,০৩০ অক্ষর, আর ২৪টি রুকু। সূরা বাকারা এবং আলে এমরানে যেসব কথার বিবরণ রয়েছে তার কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে এ সূরায়। মনে হয় এ সূরা খানি ওহোদের যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বদর এবং ওহোদের যুদ্ধের পর মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান শুধু আরববাসীকেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মুসলমানদের ওঠা-বসা, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু কয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল এবং যুগে যুগে যে সমস্ত কুসংস্কারের অন্ধকার আরববাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা ধীরে ধীর পরিহার করার নির্দেশ এসেছিল। যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেন তাদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং শহীদদের এতীম শিশুদের প্রশ্ন ও তাদের বিধবা স্ত্রীদের বিষয়, এতীমদের হক্ব, বিয়ে-শাদীর নিয়ম কানুন, মোহাজের ও আনসারদের ঐক্য, আর সে ঐক্যে ফাটল ধরাবার মোনাফেকী অপচেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের হক্ব, প্রতিবেশীর অধিকার, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ, আত্মসংশোধনের শিক্ষা, যুদ্ধাবস্থায় নামাযের প্রশিক্ষণ, মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ই এ সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচত হয়েছে। সূরা আলে-এমরানের শেষ আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ ছিল আর এ সূরাতেও তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহ্র ভয়ের তাগিদ দ্বারাই শুরু করা হয়েছে। তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধের পর যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলোর সমাধানই পেশ করা হয়েছে সূরার প্রারম্ভে এবং এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম এতীমদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র মানব জাতি একই পিতা-মাতার সন্তান। ভ্রাতৃতের এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করা মানবতার মানোন্নয়নের পূর্ব শর্ত। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে, মানুষের পরস্পরের মমত্ববোধ এবং সহমর্মিতার উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّسِتٌّ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ
اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴿٢﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ
اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا
فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾
وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ﴿٤﴾

তরজমা

(১) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকেই তার জীবন-সঙ্গীনী এবং উভয় থেকে যিনি অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর ভয় কর সেই আল্লাহ্ পাককে যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

(২) এবং এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও আর নিকৃষ্ট সম্পদের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ বদল করোনা। আর তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে তাদের ধন-সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করোনা। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এটি মহা পাপ।

(৩) আর যদি তোমাদের ভয় হয় যে তোমরা এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে তোমাদের পছন্দ মোতাবেক দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে পার, তবে যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, এদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে বিবাহ কর। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত বাঁদীতেই ক্ষান্ত থাক, এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৪) এবং তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় কর অবশ্য যদি তারা আপন খুশীতে তা থেকে কিছু বাদ দেয় তবে তা সানন্দে ভোগ করতে পার।

তফসীরুল কোরআন

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় নারী জাতির অধিকার, বিবাহের বিধি-নিষেধ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ বিধান এবং তাগিদ রয়েছে তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে- "আন্ নেসা"।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আলে এমরানের শেষ বাক্যটি ছিল-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"(অর্থাৎ) তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, হয়তো জীবন-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে"। এ সূরার প্রথম বাক্যেও আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের নির্দেশ রয়েছে। এরশাদ হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই প্রতিপালককে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে"।

এতে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, উভয় সূরাতেই আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণের তাগিদ রয়েছে। কেননা জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ পথভ্রষ্ট হতে পারে, লক্ষচ্যুত হতে পারে, বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত হতে পারে। মানুষের জন্যে এ অবস্থা সত্যিই অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ সমূহ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পবিত্র কোরআন মানুষকে আল্লাহর ভয়ের তাগিদ করেছে। যদি মানব অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে তবে সে শয়তানের অনুগামী হয় না, হতে পারে না, আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্য করে না। মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে সত্য ও ন্যায়কে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে, আর এটিই সাধনায় সার্থকতার চাবিকাঠি। এখানে আরো একটি বিষয়

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সূরা আলে এমরানে আল্লাহর রাহে জেহাদের বিবরণ সন্নিবেশিত রয়েছে। শক্রদের সাথে মুসলমানদের আচরণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। জেহাদ লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে। আর এ সূরায় মানব জাতির পরস্পরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব পালনের তাগিদ করা হয়েছে। নারী জাতির অধিকার আদায়ের, অনাথ-বিপদগ্রস্ত, এতীম মিসকিনদের প্রতি কর্তব্য পালনের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। তাদের অর্থ সম্পদের হেফাজতের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের হুকুম দেয়া হয়েছে। পরস্পরের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার রীতি-নীতি পালনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার এবং আত্মীয়তার হক্ব আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

يَآيُّهَا النَّاسُ

সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি আহ্বান

হে মানব জাতি! এতদ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্ত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলকেই এ বাক্যটি দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআন বিশ্ব গ্রন্থ, বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান বাণী যা বিশ্ব নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা এক আল্লাহ পাক, তিনিই মানব জাতিকে আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির সৃষ্টির মূল উৎসই হলেন হযরত আদম (আঃ), তাঁকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করার পর যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁর বাম পাজরের হাড় থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে তাঁর জীবন-সঙ্গীনী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন; আর এ আদম হাওয়া থেকে তথা একই পিতা-মাতা থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে। অতএব স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং রিযক দাতা হিসেবে মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য রয়েছে আল্লাহ পাকের প্রতি। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, শুধু তাঁকে ভয় করা, শুধু তাঁর কাছে আশা করা, শুধু তাঁর প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের জন্যে চাই আল্লাহ্র প্রতি ভয় পোষণ। তাই এরশাদ হয়েছে–

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ

"হে মানব জাতি! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে"।

সৃষ্টির মূলতত্ত্ব

এ আয়াতে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা হলো বিশ্ব মানবের সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র মানব জাতিকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, সৃষ্টি সূত্রে সমগ্র মানব জাতি পরস্পর ভাই ভাই।

পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ

পরস্পরের এ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় রাখা প্রত্যেকটি মানুষের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। পবিত্র কোরআনের এ ঐতিহাসিক ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এখানে সাদা-কালোর প্রশ্ন অবান্তর। বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা এবং পেশা প্রভৃতির কারণে মানব সমাজে কোন পার্থক্য করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। মানুষ মানুষই, মানুষ আদম সন্তান, সাদা, কালো, ধনী, দরিদ্র সবাই আদম সন্তান। অতএব, মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে হবে সে যে দেশেরই হোক, যে বর্ণের হোক, যে ভাষায়ই কথা বলুক। মানুষ হিসেবে তার যে প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। তার সাথে সদ্ব্যবহার, মিতাচার ও মধুর ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। একে অন্যের কল্যাণ কামনায় এবং পরস্পরের সহযোগিতায় অগ্রসর হতে হবে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের নির্দেশ পবিত্র কোরআন ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ শুনিয়ে ছিলেন তখন যারা ইতিপূর্বে বছরের পর বছর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো তারা পবিত্র কোরআনের এ মহান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক, অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য সত্ত্বায় পরিণত হলেন। কালেমা তৈয়্যেবার সোনালী সূত্র তাদেরকে গ্রথিত করলো। পবিত্র কোরআন বিষয়টির উপর কত বেশী গুরুত্বারোপ করেছে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এ বাক্যটি দ্বারা যা আলোচ্য আয়াতের শেষার্ধে এরশাদ হয়েছে–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

মানুষের পরস্পরের হক্ব আদায়ের ব্যাপারে পুনরায় আল্লাহকে ভয় করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং তোমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে যাঁর নাম তোমরা ব্যবহার কর, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কামনা কর। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে তাগিদ করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য।

আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাগিদ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেছেন ঃ "আমি আল্লাহ, আমি রহমান, আত্মীয়তার বন্ধন আমার অবদান। যে এ বন্ধনকে জুড়ে রাখবে আমিও তাকে জুড়ে রাখবো; আর যে আত্মীয়তার এ বন্ধনকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক যখন মানুষের পরস্পরের এ রক্ত সম্পর্ক তথা আত্মীয়তার এ বন্ধন সৃষ্টি করেন তখন তা আল্লাহ পাকের আরশের খুঁটি ধরে এ আরযী পেশ করে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাকে যে জুড়ে রাখবে আমিও তাকে জুড়ে রাখবো; কিন্তু যে তোমাকে বিনষ্ট করবে, আমিও তাকে বিনষ্ট করবো"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রেহেম' তথা রক্তের সম্পর্ক রক্ষাকারী সে ব্যক্তি নয় যে সমান ব্যবহার করে, বরং রক্তের সম্পর্ক রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যার সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করা হয় তবু সে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে। (বোখারী শরীফ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরো এরশাদ করেছেন ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তার রিয্‌কে প্রাচুর্য আসুক, সে দীর্ঘজীবি হোক তবে তার কর্তব্য হলো সেলায়ে রেহমী করা তথা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। (সিহাহ সিত্তাহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে রাখতে চাই কিন্তু তারা আত্মীয়তার এ বন্ধনকে ছিন্ন করতে তৎপর, আমি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহার সহ্য করি, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে মূর্খতাসুলভ ব্যবহার করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি তুমি এমন হও যেমন তুমি বর্ণনা করেছ তবে তুমি যেন তাদের প্রতি মাটি নিক্ষেপ করছো। যত দিন তুমি এ অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তুমি একজন গায়বী সাহায্যকারীর সাহায্য লাভ করবে যে তোমার পক্ষ থেকে তাদের সাথে মোকাবেলায় রত থাকবে।

মেশকাত শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁর মহান দরবারে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম। আমি যে কথাটি তাঁর জবান মোবারক থেকে শুনলাম তাহলো ঃ "হে লোক সকল! তোমরা একে অন্যকে অধিক পরিমাণে সালাম দিও আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং সেলায়ে রেহমী কর তথা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার কর। আর এমন সময় নামায আদায় কর যখন মানুষ থাকে নিদ্রায় বিভোর। যদি এ কর্মসূচীর উপর আমল কর তবে তোমরা অবশ্যই অতি শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার উপর এত বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন যে, বিষয়টিকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের পরবর্তী স্তরের সৎ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

احب الاعمال الى اللّٰه الايمان ثم صلة الرحم

আল্লাহ্ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আরো সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন–

اِنَّ الرَّحْمَ لَيَتَعَلَّقُ بِالْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقُوْلُ يَارَبِّ اِقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِىْ وَصِلْ مَنْ وَصَلَنِىْ

(আত্মীয়তা কেয়ামতের দিন আরশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! সে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দাও, যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং ঐ ব্যক্তিকে নিকটে রাখ যে আমার সম্পর্ক ঠিক রেখেছিল।)

আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে আরো কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন ঃ

اثنان لا ينظر اللّٰه اليهما يوم القيامة قاطع الرحم وجائر السوء

অর্থাৎ দু' ব্যক্তির দিকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) দৃষ্টিপাত করবেন না। তারা হলো ঃ

(১) আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী,

(২) মন্দ প্রতিবেশী।

এমনিভাবে আরো বহু হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার, আত্মীয়তার হক্ব আদায়ের, তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করার, সকল মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করার এবং পরোপকারেরর তাগিদ করেছেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব মানবিক গুণাবলীর কথা এমন সমাজকে বলেছিলেন যে সমাজের লোকেরা ছিল সর্বদা কলহ দ্বন্দ্ব এমনকি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত, যারা দুর্বলের প্রতি জুলুম অত্যাচার করাকে বীরত্ব মনে করতো। বিশ্ব মানবের কল্যাণ এবং মুক্তির মহাসনদ পবিত্র কোরআনের এ মহান শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষণ তদানীন্তন কালের মানুষের জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যারা ছিল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত তারাই হলো পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিশ্ববাসীর জন্যে আদর্শ হয়ে রইল। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য তা হলো, এ পৃথিবী হলো কর্মক্ষেত্র। কর্মফল লাভ করা যাবে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে, মানুষের কোন কাজই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এড়ায় না, তিনি সবই দেখেন, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। অতএব, মানুষ অন্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ কতখানি পালন করছে তা আল্লাহ পাক সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-বিষেধ পালনে তোমরা কতখানি তৎপর তা আল্লাহ পাক নিজেই নিরীক্ষণ করছেন। অতএব প্রত্যেকেরই সতর্ক এবং সাবধান থাকা উচিত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ

শানে নুযুল

মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একজন গাতফানী ব্যক্তির নিকট তার এতীম ভ্রাতঃষ্পুত্রের অনেক ধন-সম্পদ সঞ্চিত ছিল। এতীম সাবালক হয়ে চাচার নিকট তার অর্থ-সম্পদ দাবী করলে চাচা তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানালো। তখন উভয়ে এ মোকদ্দমা নিয়ে হাযির হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। ঐ সময়ে এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এতীমদের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এতীমদের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের তাগিদ করেছেন। পিতৃহীন শিশুকে এতীম বলা হয়। কিন্তু যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত তথা সাবালক হয় তখন আর তাকে এতীম বলা হয় না। এতীমের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিশেষ তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এতীম আত্মীয় হোক কি অনাত্মীয়, অনাথ বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণে তাদের প্রতি সহানুভূতি- সহমর্মিতা প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর যদি সেই এতীম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হয় এবং অভিভাবক হিসেবে তার অর্থ সম্পদও সংরক্ষিত থাকে এমন এতীম যখন সাবালক হয়, সে তার ভাল-মন্দ বুঝতে সক্ষম হয়, সেই এতীমকে তার ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছে "এতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও"।

এ আয়াত যাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তাদের মধ্যে এতীমের চাচা এ আদেশ শ্রবণ করা মাত্র বললেন ঃ আমরা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত। আমরা গুনাহ কবীরা বা মহা পাপ থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই। এরপর তিনি তাঁর সমস্ত মাল এতীমকে দিয়ে দেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি লোভ-লালসা থেকে নিরাপদ থাকে এবং এভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করে সে বেহেশতে বাস করবে"। বর্ণিত আছে, ঐ এতীম ছেলেটি অর্থ সম্পদ লাভ করার পর তা আল্লাহর রাহে দান করে দেয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ সওয়াব বা শুভ পরিণতি পাকাপোক্ত হলো, আর বোঝা রয়ে গেল। অর্থাৎ যে ছেলেটি আল্লাহর রাহে দান করলো তার সওয়াব লাভ করা সুনিশ্চিত হলো, আর তার পিতা যে এ সম্পদ রোজগার করেছে তার উপর রয়েছে রোজগারের হিসেব দেয়ার ভার। (বগবী)

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭১-৭২

এ আয়াতে একথারও তাগিদ করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক যখন এতীমের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালন করে, এ সুযোগে যেন এতীমের উৎকৃষ্ট সম্পদ রেখে দিয়ে তার নিকৃষ্ট সম্পদ এতীমকে না দেয়। হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং জুহরী প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলো এতীমদের কোন কোন অভিভাবক নিজের নিকৃষ্ট সম্পদ এতীমকে দিয়ে তার উৎকৃষ্ট সম্পদ নিজে রেখে দিত। যেমন বকরীর পালের মধ্য থেকে মোটা তাজা বকরী গুলো নিজের ভাগে রেখে দুর্বল বকরীগুলো এতীমের ভাগে বরাদ্দ করা। আলোচ্য আয়াতে এমন অন্যায় কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হলো তড়িৎ গতিতে হারাম রিয্‌ক গ্রহণ করানো। আল্লাহ পাক যে রিয্‌কের অঙ্গীকার করেছেন তা পাওয়ার পূর্বে হারাম রুজি অর্জনের ব্যাপারে তোমরা অধৈর্য হয়োনা।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَهُمْ إِلٰٓى أَمْوَالِكُمْ

নিজের এবং এতীমের অর্থ সম্পদ একত্রিত করে এতীমের সম্পদ হজম করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ আয়াতে। এতীমের ধন-সম্পদের সঙ্গে নিজের ধন-সম্পদ একত্রিত করার ব্যাপারে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে কিন্তু সকল অবস্থাতেই যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাধান্য লাভ করবে তা হলো এতীমের কল্যাণ কামনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই এতীমের ক্ষতি করা যাবে না। এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাত করা মহাপাপ। এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা মহাপাপ"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা কর। এতীমের ধন-সম্পদ হজম করা এ সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের অন্যতম বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

বর্বরতার যুগে এতীম মেয়েদের রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে অভিভাবকরাই তাদেরকে বিয়ে করতো। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই অভিভাবক, ফলে এ অসহায় পিতৃহীন মেয়েদের পক্ষে কথা বলার কেউ থাকতো না। তাই তাদের মোহরানার হক্ব আদায় করা হতো না, এভাবে তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হতো।

কোন কোন ক্ষেত্রে এতীম মেয়েদের রূপ যৌবন আকর্ষণীয় বস্তু হতো না; বরং যেহেতু পিতৃহীনা মেয়েদের ধন-সম্পদ অভিভাবকদের নিকট রক্ষিত থাকতো, অন্যত্র এমন মেয়ের বিয়ে হলে ধন-সম্পদ অন্যের আয়ত্তে চলে যাবে- এই ভয়ে এমন মেয়েদের বিবাহ করা হতো। সমাজ জীবনের এ অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার পরিহার করার নির্দেশ দান করা হয়েছে এ আয়াতে, এরশাদ হয়েছে– "যদি তোমরা এতীম মেয়েদের মোহরানা আদায়ে এবং তাদের সাথে দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে না বলে আশংকা কর তবে সাবধান হও, এতীম মেয়েদের বিয়ে করতে যেয়োনা, তাদের প্রতি অবিচার করোনা, তোমাদের বিয়ের প্রয়োজন হলে একটি দু'টি নয়; বরং চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। অতএব, তোমাদের পছন্দ মত অন্য মেয়েদেরকে তোমরা বিয়ে কর। তবু কোন অবস্থাতেই অসহায়, নিরুপায়, পিতৃহীনা এতীম মেয়েদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করোনা, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করোনা।

ইমাম বোখারী (রঃ) সংকলিত একখানি হাদীস এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওরওয়াহ এবনে যোবায়ের বর্ণনা করেন যে, আমি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এ আয়াতে সেই এতীম মেয়ের কথা বলা হয়েছে যার অভিভাবক হতো এমন ব্যক্তি যে তাকে বিয়ে করতে পারতো, তার রূপ যৌবন এবং সম্পদ দেখে বিয়ে করার ইচ্ছে করতো কিন্তু তার সঠিক মোহরানা আদায় করতো না। এমন অভিভাবকদেরকে এমনি এতীম মেয়েদের বিয়ে না করার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, অতঃপর মানুষ যখন এতীম মেয়েদের বিয়ের মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছে তখন আল্লাহ পাক وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ থেকে تَنْكِحُوهُنَّ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এতীম মেয়েরা যদি সুন্দরী এবং সমৃদ্ধশালী হয় তবে লোকেরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে, যদি তাদের সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদ না থাকে তবে তাদেরকে বিয়ে করার কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব যেভাবে ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্য না থাকলে তোমরা এতীম মেয়েদের পাণি গ্রহণে ইচ্ছুক হওনা, ঠিক তেমনি সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদ থাকলেও তাদেরকে বিয়ে করোনা।

তবে যদি তাদের যথাযোগ্য মোহরানা আদায় করা হয় এবং তাদের প্রতি দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হয় তবে তাদেরকে বিয়ে করা অবৈধ নয়।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন ঃ মদীনা শরীফে কিছু লোক এমন ছিল যে, তাদের নিকট এতীম মেয়েরা থাকতো, তাদের ধন-সম্পদও সংরক্ষিত থাকতো, তাদের ধন-সম্পদের লোভেই তাদেরকে বিয়ে করা হতো।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত একরামা (রঃ) বলেছেন যে, কোন কোন কোরায়শী বর্বরতার যুগে দশ দশটি বিয়ে করতো। যখন পারিবারিক ব্যয় বহনে অসুবিধা হতো তখন এতীমদের ধন-সম্পদের দিকে হাত বাড়াতো এবং তাদের টাকা পয়সা ব্যয় করে ফেলতো। তাই হুকুম হয়েছে চারটির বেশী যেন কেউ বিয়ে না করে।[১]

আবু দাউদ শরীফে একটি ঘটনা সংকলিত হয়েছে। হযরত কায়েস এবনুল হারেস আসাদী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি যখন ইসলাম কবুল করি তখন আমার স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল আট। আমি বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করলে তিনি আমাকে চারজন স্ত্রী রেখে অবশিষ্ট সকলকে বিদায় দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার যে স্ত্রীদের সন্তান-সন্ততি ছিলনা তাদেরকে বললাম তোমরা বিদায় গ্রহণ কর, আর যাদের সন্তান-সন্ততি ছিল তাদেরকে বললাম তোমরা থাক।

আহমদ, তিরমিযী এবং এবনে মাজায় সংকলিত বিবরণে রয়েছে, হযরত গায়লাম এবনে সালমা সকফী (রাঃ) যখন ইসলাম কবুল করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি তন্মধ্যে চার জনকে রেখে বাকী ছয় জনকে বিদায় কর।

এমনিভাবে হযরত নওফেল এবনে মরয়ম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি যখন ইসলাম কবুল করি তখন আমার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেন, তুমি একজনকে ছেড়ে দাও, আর চার জনকে রেখে দাও। আমি একজনকে ছেড়ে ছিলাম যে আমার কাছে ৬০ বছর ছিল, তবে বন্ধ্যা ছিল।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৪-৭৫

বস্তুতঃ একসঙ্গে চারজন স্ত্রীর অধিক না রাখার ব্যাপারে আমাদের চারজন ইমামই একমত অর্থাৎ এক সঙ্গে চারটির অধিক বিবাহ হারাম। এমনিভাবে একসঙ্গে দু' বোনকে স্ত্রী হিসেবে রাখার অনুমতি ইসলাম দেয়না।

যাহ্যাক এবনে ফিরোজ তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন ঃ আমি মুসলমান হয়েছি তবে আমার নিকট দু' বোন স্ত্রী হিসেবে রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তাদের দু'জনের যে কোন একজনকে রেখে দাও।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বহু বিবাহ ইসলামের নির্দেশ নয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে ইসলাম এ বিষয়ে অনুমতি দেয় যে, চারজন পর্যন্ত স্ত্রী একসঙ্গে রাখা যায়। আর এ অনুমতিও শর্ত সাপেক্ষ। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থাৎ তোমরা যদি এ আশংকা কর যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার ও সমদর্শিতা রক্ষা করতে পারবেনা তবে শুধু একজন স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন যে, যার দু' স্ত্রী থাকে সে যদি সমদর্শিতার পরিচয় না দেয় তবে কেয়ামতের দিন তার একপার্শ্ব পক্ষাঘাত গ্রস্ত থাকবে।

অতএব, ইসলাম একাধিক বিয়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করে, তবে যদি সামর্থ থাকে, প্রয়োজন দেখা দেয়, তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের আশা থাকে তবে ইসলাম একসঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। আর সকল অবস্থায় নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণের তাগিদ করে। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

অর্থাৎ শুধু একটি বিয়ের নীতি এমন যা কোন বিশেষ দিকে আকৃষ্ট না হওয়ার নিকটবর্তী। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এর অর্থ হলো একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় একজনের হক্ব বিনষ্ট করে অন্যজনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এ পন্থায় থাকে না।

মুজাহেদ (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো এ পন্থা এর নিকটবর্তী যে, তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

আর ফররাহ (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো, এক বিয়েতে তৃপ্ত থাকলে তোমরা সীমা লংঘন করবে না।[১]

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক নারী জাতির হক্ব আদায়ের বিশেষ তাগিদ করেছেন ঃ

আর মেয়েদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় কর। স্বামীর কর্তব্য হলো তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাগাদা করার অপেক্ষা না করা এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলা না করা।

কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ আয়াতে স্ত্রীলোকদের অভিভাবকদের সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। কোন কোন লোক মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন মোহর নিজেই গ্রহণ করতো, মেয়েকে দিত না। আল্লাহ্ পাক এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, কোন স্ত্রীলোকের অভিভাবক তার বিবাহ সুসম্পন্ন করতো, আর স্ত্রীলোকটি নিজের খান্দানের মধ্যেই থাকতো তখন দেন মোহর সে নিজেই গ্রহণ করতো, মেয়েটিকে কিছুই দিত না। আর যদি মেয়েকে দূরে কোথাও বিয়ে দিত তখনও অভিভাবক দেন মোহর নিজে গ্রহণ করতো এবং মেয়েটিকে একটি উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে বিদায় করে দিত। তাকে আর কিছুই দেয়া হতো না। ইসলাম সকল জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাই এ আয়াতে নারী জাতির প্রতি এমনি জুলুম বন্ধ করার নির্দেশ রয়েছে।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তার মোহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয় অথবা সম্পূর্ণ দেন মোহর উশুল করার পর স্বামীকে তার কিছু অংশ দান করে তবে স্বামী সানন্দে তা ভোগ করতে পারে। কেননা উভয়ের সন্তুষ্টিই এখানে কাম্য এবং প্রাপ্য।

আমালুল কোরআন

فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

হযরত আলী (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দেন মোহর বাবদ নগদ অর্থ দান করে, স্ত্রী সে অর্থ গ্রহণ করে পুনরায় স্বামীকে দান করে আর সেই নগদ অর্থ দিয়ে যদি মধু ক্রয় করা হয় এবং বৃষ্টির পানি তাতে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮২

মেশানো হয় তবে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে ঐ মধু পান করানো হলে ইনশাআল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে। (ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑤

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑥

তরজমা

(৫) আর আল্লাহ পাক তোমাদের যে ধন-সম্পদকে তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন তা নির্বোধ লোকদের দিও না। তাদেরকে তা থেকে খোরপোষ দাও এবং তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বল।

(৬) আর এতীমদেরকে বিবাহের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা কর (অর্থাৎ সাবালক হওয়া পর্যন্ত) অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিচার বুদ্ধি দেখতে পাও তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে সোপর্দ কর এবং তারা বড় হয়ে উঠলো (এই ভয়ে) তাদের ধন-সম্পদ তাড়াহুড়া করে অতিরিক্ত ভোগ করোনা। আর যার প্রয়োজন নেই সে যেন এতীমদের সম্পত্তি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। আর যে দরিদ্র হবে সে ন্যায় নীতি অনুসারে ভোগ করবে। অতঃপর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে ফেরত দেয়ার ইচ্ছা কর তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখে দিও এবং আল্লাহ পাক হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে এতীমদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। আরো এরশাদ হয়েছে স্ত্রীদের নিকট তাদের দেন মোহর দিয়ে দাও।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে নির্বোধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে অর্থ-সম্পদ সোপর্দ করোনা। কেননা অর্থ সম্পদ আল্লাহর নেয়ামত, অর্থ-সম্পদের সাধ্যমেই মানুষ তার জীবন ধারণ করে, জীবন যাত্রা অর্থ-সম্পদ ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাকই মানুষকে অর্থ-সম্পদ দান করেন। কিন্তু নির্বোধ, নির্বোধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং দায়িত্বহীন স্ত্রীদের নিকট অর্থ সম্পদ দিলে তারা তা বিনষ্ট করতে পারে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যেন একথা এরশাদ করেছেন যদিও আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা এতীমদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও এবং স্ত্রীলোকদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় কর, এ আদেশ তখনকার জন্যে যখন তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, যখন তারা বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হয় এবং অর্থ-সম্পদের হেফাজত করতে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে, যদি তারা সাবালক না হয় অথবা সাবালক হয়েও বুদ্ধিমান না হয় এমন অবস্থায় তাদের নিকট অর্থ-সম্পদ দিওনা, সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এ নির্দেশ।

অর্থ-সম্পদের হেফাজতের তাগিদ

এ আয়াতে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কেননা, অর্থ-সম্পদ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত। যারা নির্বোধ তারা এ নেয়ামতের কদর করতে পারবে না।[১]

যদিও এতীমদের বিষয়ই আলোচনা হচ্ছিল কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ), হাকাম এবনে উয়াইনা (রাঃ), হাসান এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে এ আয়াতে যে সতর্কবাণী রয়েছে তা শুধু এতীম শিশুদের সম্পদ সম্পর্কে নয়, বরং এ সতর্কবাণী প্রত্যেকটি মানুষের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির জন্যেও। কেননা অনেকে অতি স্নেহের কারণে তার ধন-সম্পদ অল্প বয়স্ক সন্তান-সন্ততি অথবা স্ত্রীদের হাতে দিয়ে দেয় এবং তারা যখন অর্থ-সম্পদ নষ্ট করে দেয় তখন আক্ষেপ করা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর থাকেনা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলো তোমরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি এবং অনভিজ্ঞ স্ত্রীর নিকট অর্থ সম্পদ দিয়ে নিজেকে করুণার পাত্র করে তুলোনা কেননা, তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আল্লাহ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, ১৮৩-৮৪

পাক তোমার প্রতি অর্পণ করেছেন। অতএব, তোমরা তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা কর। যদি তারা অর্থ সম্পদ লাভের জন্যে জেদ ধরে তবে তোমরা বিনম্র ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, এ ধন-সম্পদ তোমাদেরই। আজ অথবা কাল অবশেষে তোমারাই হবে এর মালিক। তোমাদের কল্যাণ সাধনের তাগিদেই এ মুহূর্তে তোমাদের হাতে এ অর্থ-সম্পদ দেয়া যাচ্ছে না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানি এই ঃ তিন প্রকার লোক রয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন না।

১. সে ব্যক্তি যার স্ত্রীর চরিত্র মন্দ অথচ সে তাকে তালাক দেয়না।

২. যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ কোন নির্বোধকে দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ পাকের হুকুম হলো অর্থ সম্পদ কোন নির্বোধকে দিওনা।

৩. সে ব্যক্তি যে কোন লোককে ঋণ দেয়, অথচ ঋণের ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী করেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক মানুষকে তার জীবন যাত্রার জন্যে যে অর্থ-সম্পদ দান করেন তার হেফাজত করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। এ অর্থ-সম্পদ দ্বারাই হজ্জ এবং জেহাদের ন্যায় অবশ্য কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়। আর এমনি নেক কাজের মাধ্যমেই মানুষ দোযখ থেকে নাজাত লাভ করে। অতএব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী বা সন্তান সন্ততির হাতে তুলে না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন যে, এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের অত্যন্ত বড় নেয়ামত। এর কদর করা তথা হেফাজত করা পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ধন-সম্পদ অবুঝ এতীমদের হাতে দিওনা। নিজের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যারা বিবেকবান নয় তাদের হাতে অর্থ-সম্পদ না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে। কেননা তারা অর্থ সম্পদের অপচয় করবে। তিনি আরো লিখেছেন যে, ফোকাহাগণ তথা ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট না করা তথা এর

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৫

হেফাজত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এ আয়াত দ্বারাই তারা অযোগ্য সন্তান এবং স্ত্রীর খোরপোষ ও যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে প্রমাণ করেছেন।[১]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সাধারণত মনে করা হয় যে, ইসলাম অর্থ-সম্পদ আহরণের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেনা, বরং ত্যাগের মহিমায় নিজেকে মহিমান্বিত করার শিক্ষাই দেয় ইসলাম। একথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। ইসলাম মানুষকে অর্থ-সম্পদ আহরণে এবং জীবিকা উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা জুমআয় আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"যখন নামায সুসম্পন্ন হয় তখন তোমরা ছড়িয়ে পড় সমগ্র পৃথিবীতে এবং আল্লাহর দানের (জীবিকার) অন্বেষণ কর। আর আল্লাহ পাককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে, হয়তো তোমরা জীবন সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হবে"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হালাল জীবিকা উপার্জন অন্যতম ফরজ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন ঃ ফজরের নামাযের পর জীবিকা অন্বেষণের সময় তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো না। সে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ নিজের জন্যে বরাদ্দ পরিমাণ জীবিকা যতক্ষণ না মানুষ সম্পূর্ণভাবে ভোগ করেছে, ততক্ষণ সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে না। মৃত্যু যেমন মানুষের পিছু পিছু ছোটে জীবিকা বা রিয্কও তেমনি মানুষের পিছু পিছু ছোটে। তবে সে বরাদ্দকৃত জীবিকা উপার্জনের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। নিঃশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে জীবিকা মুখে এসে হাযির হবেনা।

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

لا يقعد احدكم من طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারো জন্যে উচিত নয় যে, সে তার হালাল রুজির অন্বেষণ না করে বসে থাকবে। আর আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, এলাহী! আমাকে

১। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯

রিয্ক দান কর। তোমরা নিশ্চিত ভাবে একথা জান যে, আসমান স্বর্ণ রৌপ্য বর্ষণ করেনা। অর্থাৎ এ জগতে সম্পদ অর্জন করতে হলে মানুষকে এ জগতের বুকেই পরিশ্রম করতে হবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে হালাল রুজি অন্বেষণের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। তবে এ পর্যায়ে যে কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ উপার্জন মানব জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং উপলক্ষ মাত্র। পথিক মাত্রকে পাথেয় সংগ্রহ এবং সযত্নে তা সংরক্ষণও করতে হয়। তাই বলে কোন পথিকের পাথেয় তার পথ চলার উদ্দেশ্যে পরিণত হতে পারেনি কোন দিনও। আর এজন্যে মানবতার অবমাননাকর, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর যত পন্থা রয়েছে সেসব পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে ইসলাম অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে, যেমন ঘুষখোরী, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা, ছলচাতুরী, সুদখোরী, পরিমাপে কম দেয়া, ব্যাভিচার লব্ধ অর্থ, মদ ও মূর্তির ব্যবসা, গান-বাদ্যের পারিশ্রমিক, ভেজাল দ্রব্যের ব্যবসা প্রভৃতি যাবতীয় পন্থাকে ইসলাম অবৈধ বা হারাম বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম আমানত রক্ষার তাগিদ করেছে। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে ব্যবসা করতে নিষেধ করেছে। ৪০ দিনের অধিক খাদ্য দ্রব্যের মজুদদারী বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেভাবে ইসলাম অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তেমনি ব্যয়ের ব্যাপারেও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

(তোমরা পানাহর কর, আর অপব্যয় করনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপব্যয়কারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।) বস্তুতঃ ইসলাম অর্থ সম্পদের অপচয় তথা অপব্যয়কারীকে "শয়তানের ভাই" বলে আখ্যা দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ

"(অর্থাৎ) নিশ্চয় অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই"।

এমনিভাবে ইসলাম অর্থ-সম্পদকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে কুক্ষিগত না করার তাগিদ করেছে, দান সদকাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২.৫% (আড়াই) হারে যাকাত প্রদানকে অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করেছে। উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান পেশ করেছে। শ্রমিককে ঘাম শুস্ক হবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

মূলতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ হলো আল্লাহ পাকের দান। এ দানের হেফাজত করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের তাগিদ করেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ- الاية

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে সম্পদকে তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন হিসেবে দান করেছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে দিওনা, তাদেরকে খোরপোষ দাও।

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ তাদের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বল, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সমাজের ভাগ্যাহত, দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের সাহায্য করা ভাগ্যবান মাত্রেরই কর্তব্য। এরপর এরশাদ হয়েছে-

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

এতীমের দেখা-শুনা কর, তাদের পরীক্ষা করতে থাক, তারা সাবালক হলে যদি তাদের হিতাহিত জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পার তবে তাদের অর্থ সম্পদ তাদের নিকট অর্পণ কর। পক্ষান্তরে, যদি সাবালক হওয়ার পরও তাদের বিবেক বুদ্ধি না হয় তবে এক্ষেত্রে ইমাম আযম হযরত আবু হানিফার (রঃ) মতে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা। ২৫ বছর হলে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি পূর্ণ হোক বা না হোক তাদের সম্পত্তি অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে।

এর পরবর্তী আয়াতে এতীমের অভিভাবকদেরকে এতীমের সম্পদ সম্পর্কে আরো একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا

অর্থাৎ এতীমের অর্থ-সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্তি ব্যয় করোনা এবং এতীম বড় হয়ে তার সম্পত্তি সে নিয়ে যাবে- এ ভয়ে তাড়াহুড়া করে তার সম্পদ ব্যয় করোনা, বরং এতীমের হক্ব বা অধিকার রক্ষা কর। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ এতীমের অভিভাবক যদি ধনী হয় তবে এতীমের সম্পদ ভোগের কোন অধিকার নাই। এরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

যে ধনী সে যেন এতীমের সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তবে এতীমের সেবা যত্ন অনুপাতে ন্যায় নীতি অনুসারে ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

হযরত আমর এবনে শোয়েব (রাঃ)-এর পিতামহের বর্ণনা হলো, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, তবে আমার নিকট একটি এতীম রয়েছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ নিতান্ত প্রয়োজনে কিছু গ্রহণ কর, তবে সীমা লংঘন করোনা। অতি শীঘ্র সেই সম্পদ শেষ

করার চেষ্টা করোনা এবং নিজের রোজগার সঞ্চয় করে তার সম্পদ হজম করোনা। (আবু দাউদ, নেসায়ী, এবনে মাজাহ)

এ পর্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি কথার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তিনি যখন খলিফাতুল মুসলেমীন হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন তখন তাঁর নীতি নির্ধারণী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি সরকারী তহবিলের ব্যাপারে নিজেকে এতীমের অভিভাবকের ভূমিকায় রাখবো। অর্থাৎ যদি আমি স্বচ্ছল থাকি তবে সরকারী অর্থ সম্পদ থেকে আমি আত্মরক্ষা করবো। আর যদি আমার প্রয়োজন থাকে তবে ঋণ হিসেবে সরকারী তহবিল থেকে আমার প্রয়োজনের আয়োজন করবো। আর যখন স্বচ্ছলতা আসবে তখন আমি তা সরকারী তহবিলে আদায় করে দেব।

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে এতীমকে তার ধন-সম্পদ অর্পণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন এতীমকে তার অর্থ সম্পদ ফেরত দেয়ার জন্যে যোগ্য মনে করা হয় এবং সে অর্থ-সম্পদ বাস্তবে তাকে দেয়া হয় তখন তোমরা সাক্ষী রেখে দিও, যেন পরবর্তীতে এসব বিষয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে বা কোন কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষীর সাক্ষ্য উপকারী হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো মৃত্যু হলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কয়েকজন একত্রিত হয়ে মৃত ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করবে এবং একজন আমানতদার অভিভাবক নিযুক্ত করবে, তার নিকট থাকবে এতীমের অর্থ-সম্পদ। যখন এতীম ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবে (তারা বিবেক বুদ্ধি লাভ করবে) তখন পূর্বে প্রস্তুত তালিকা মোতাবেক তাদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেবে। আর এ ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রাখবে যেন পরবর্তীতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সাক্ষ্য প্রমাণ কাজে লাগে।

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ সাক্ষী রাখার আদেশটি অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ নয়, বরং মুস্তাহাব।

ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, যদি সাক্ষী নাও থাকে তবে এক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

আর হিসাব নেবার জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, অর্থাৎ সবই তিনি দেখছেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। সব বিষয়ই তাঁর নখদর্পণে। আর সকলকে অবশেষে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করতে হবে।

এ পর্যায়ে মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত

আবুজর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, "হে আবুজর! আমি তোমাকে বড় অসহায় দেখতে পাই। আমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করি তা তোমার জন্যেও পছন্দ করি। খবরদার! কোন সময় দু' ব্যক্তিরও নেতা হবে না, আর কোন সময় কোন এঁতীমের অভিভাবক হবে না"। বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীস এ যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা এ যুগে অনেকেই মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণে একান্ত আগ্রহী থাকে। কিন্তু কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন নেতৃত্ব এবং অভিভাবকত্বের হিসেব দিতে হবে তখনই সত্য উদ্ভাসিত হবে। আর তখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ সতর্কবাণীর সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ
وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ
لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾

তরজমা

(৭) পিতা-মাতা এবং নিকটতর আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে সে অংশ বেশী হোক বা কম তার পরিমাণ নিদৃষ্ট রয়েছে।

(৮) আর যখন (ওয়ারিশগণের মধ্যে সম্পদ) বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন, এতীম মিসকিনগণ আসে তখন ঐ সম্পদ থেকে তাদেরকেও কিছু দান কর এবং তাদের সাথে (বিনম্রভাবে) ভাল কথা বল।

(৯) যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অসমর্থ সন্তান-সন্ততি রেখে যায় পরে তাদের অবর্তমানে তাদের অবস্থা যেন ভেবে দেখে (এমন লোককে তাদের জন্যে (পূর্বেই) ভীত এবং শংকিত হওয়া উচিত) অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে এ কুসংস্কার ছিল যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে শুধু তার সাবালক ছেলেরাই অংশীদার হতো, মেয়েরা নাবালিকা সাবালিকা নির্বিশেষে কারো ভাগ্যে কিছু জুটতোনা। শুধু যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন ছেলেরাই মৃত পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হতো, ছোট ছোট এতীম ছেলে মেয়েরা তাদের পিতার সম্পত্তি থেকে চির বঞ্চিত হতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় আওস এবনে সাবেত (রাঃ) নামক এক সাহাবীর এন্তেকাল হলো। তিনি দুটি মেয়ে এবং একটি ছোট ছেলে রেখে গেলেন। আওস (রঃ)-এর চাচাতো ভাই খালেদ এবং আরফাজা এসে তার সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ দখল করে নেয়। আওসের স্ত্রী উম্মুল হার (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আল্লাহ পাক হুকুম নাযিল করবেন। ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো এবং বর্বরতার যুগের কুসংস্কার দূরীভূত হলো। পিতার সম্পত্তিতে শুধু পুরুষ নয়; নারীদেরকেও অংশীদার বলে ঘোষণা করা হলো।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এতীমদের সম্পর্কে কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে। নারী জাতিকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, যখন আওস এবনে সাবেত (রাঃ)-এর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর বিপদের করুণ কাহিনী বর্ণনা করলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আওসের চাচাতো ভাইদেরকে ডাকলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, এ শিশুরা অশ্বারোহনে সক্ষম নয় এবং দুশমনের সাথে লড়াই করতেও অযোগ্য।

বস্তুত বর্বরতার যুগে উত্তরাধিকারী হওয়ার এটিই ছিল মানদণ্ড। যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারতো, লুটতরাজ করতে পারতো তাদেরকেই উত্তরাধিকারী হওয়ার

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৪
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৪
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-২১০

যোগ্য মনে করা হতো। পবিত্র কোরআন এ আয়াত দ্বারা বর্বরতার যুগের এ অন্ধকার তথা এ জুলুম অত্যাচার চিরতরে দূর করলো এবং ঘোষণা করা হলো, মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি ছোট হোক বড় হোক, ছেলে হোক মেয়ে হোক সকলেই উত্তরাধিকারী হবে।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ

অর্থাৎ যখন ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয় তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বভাবতই হাযির হয়। যারা উত্তরাধিকারী তারা সম্পদের অংশ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয় কিন্তু উত্তরাধিকারে যাদের কোন অংশ থাকেনা তাদের মনে দুঃখ বা আক্ষেপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এমন পরিস্থিতিতে যা করণীয় তারই নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে। এরশাদ হয়েছে, সম্পদ বন্টনের সময় যদি এমন আত্মীয়-স্বজন হাযির হয় যাদের অংশ নেই এবং অন্যান্য এতীম মিসকিনদেরও তোমরা কিছু দাও, তাদেরকে অন্তত পানাহারে খুশী রেখ। এ আদেশ অবশ্য কর্তব্য না হলেও অত্যন্ত প্রশংসনীয় তথা মুস্তাহাব। এমনকি যদি তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও না করতে পার, অন্ততঃ মুখের কথায় তাদেরকে খুশী করার চেষ্টা করো। এভাবে কথা বলা যেতে পারে যে, ভাই! ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনাদেরকে কিছু দিয়ে যে খুশী করবো সে সুযোগও পেলাম না কেননা, সম্পদ এতীমের, মরহুম ব্যক্তি কোন অসিয়ত করে যান নাই। এমন অবস্থায় আপনাদের খেদমতে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। একথাটিকে কোরআনে করীমে এভাবে এরশাদ করেছে–

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ তাদের সাথে ভাল ভাবে কথা বল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে মোহাম্মদ এবনে সীরিন (রঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ হযরত ওরায়দা সালমানী (রাঃ) এতীমদের সম্পত্তির কিছু অংশ রেখে একটি বকরী ক্রয় করেন এবং কিছু খাবার তৈরী করে উপস্থিত সকলকে সে খাবারে শরীক করলেন। এরপর বললেন, যদি এ আয়াত না হতো তবে এ বকরীটি আমার সম্পদের অংশ হতো।[১]

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৭

এতীমদের অভিভাবকদের প্রতি এ নির্দেশ যে, তোমাদের নিজেদের মৃত্যুর পর যদি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে যাও তবে তাদের অবস্থা কি হবে? এ বিষয়টি ক্ষণিকের জন্যে চিন্তা কর এবং তাদের সাথে যে ব্যবহার তোমরা আশা কর সেই ব্যবহারই তোমরা নিজেদের জীবদ্দশায় এতীমদের সঙ্গে কর। যেভাবে মানুষের নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহারের আশংকা কর, সেই ব্যবহার নিজেরা কোন এতীমের সঙ্গে করোনা। এতীমদের মনে দুঃখ দিও না। তাদের মনকে আহত করোনা। অতএব, যারা ওয়ারিশ নয় এমন অসহায় লোকেরা যখন হাযির হয় তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি রেখ।

কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের আদেশ এতীমদের অভিভাবক এবং যাদের জন্যে অসিয়ত রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যেন তারা এতীমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, এতীমদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করে যে ব্যবহার তাদের অসহায় শিশুদের সঙ্গে তারা আশা কর।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এ আয়াতটির কথা সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রয়েছে যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে এবং তার চারিপার্শ্বে লোকজন জমা হয়েছে এবং তারা বলছে তোমার ওয়ারিশগণ তোমার কোন কাজে আসবে না; বরং তুমি আল্লাহর রাহে তোমার ধন-সম্পদ দান করে দাও, এভাবে তার যাবতীয় সম্পদ বিতরণ করার পরামর্শ দেয়, এমন লোকদেরকে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং রুগ্ন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিকে নিজের সন্তান-সন্ততি মনে করে এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে এমন পরামর্শ না দেয় যদ্বারা তার সন্তান-সন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা এর অর্থ হলো যারা ওসিয়ত করে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ওসিয়তের ব্যাপারে তারা যেন সীমা লংঘন না করে এবং এমন ওসিয়ত না করে যদ্বারা রুগ্ন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদের ওসিয়ত করে।

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

সঠিকভাবে কথা বলা উচিত। অর্থাৎ অভিভাবক এতীমদের সঙ্গে যেন সস্নেহে কথাবার্তা বলে। এভাবে এতীমদের সঙ্গে কথা বলে আর এমন কথা বলে যাতে এতীমের কল্যাণ থাকে। মোট কথা এতীমদের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। কোন অবস্থাতেই যেন এতীমের হক্ব বিনষ্ট না হয় এবং তাদের মন আহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠

তরজমা

(১০) নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের অর্থ সম্পদ ভোগ করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। অতিসত্বর তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

তফসীরুল কোরআন

এতীমদের অর্থ সম্পদ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী

এ আয়াতে এতীমের সম্পদ গ্রাসকারী লোকদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে আরো কয়েক খানি আয়াতে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে–

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

অর্থাৎ এবং তোমরা এতীমদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও এবং অপবিত্রকে পবিত্রের সাথে বদল করোনা। আর তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ যোগ করে ভোগ করোনা। নিশ্চয় এটি মহা পাপ।

এ আয়াত সমূহে এতীমের মাল অন্যায় ভাবে হজম না করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এরপর এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল গ্রাস করে থাকে তারা আসলে অগ্নি দ্বারা তাদের উদর পূর্ণ করে। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন একটি সম্প্রদায়কে উঠানো হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের মুখে জ্বলন্ত অগ্নি থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হবে, এরা কারা? জবাব দেয়া হবে, এরা সে সব লোক যারা এতীমের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন ঃ শবে মে'রাজে একটি সম্প্রদায়কে দেখেছি যে, তাদের ওষ্ঠদ্বয় উষ্ট্রের মত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক ব্যক্তি তাদের ঠোট কে ধরে রেখেছিল। তাদের মুখে অগ্নি প্রবেশ করানো হচ্ছিল যা তাদের পেছনের পথ দিয়ে বেরুচ্ছিল এবং তারা গাভীর মত চিৎকার করছিল ঃ আমি বললাম ঃ হে জীব্রাঈল! এরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? জীব্রাঈল বললো, এরা এতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করতো। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সাত প্রকার পাপ কার্য থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা এগুলো ধ্বংসের

কারণ হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, সে পাপ কার্যগুলো কি কি? তিনি এরশাদ করেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে শেরক করা। (২) যাদু (৩) অন্যায় ভাবে হত্যা করা (৪) সুদ খোরী (৫) এতীমের সম্পদ গ্রাস করা (৬) জেহাদ থেকে বিমুখ থাকা (৭) সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে আরো একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এতীমের সম্পদ হরণকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার কবর থেকে এভাবে উঠবে যে, তার মুখ থেকে, চোখ থেকে এমনকি প্রতিটি রন্ধ্র রন্ধ্র থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হবে। প্রতিটি মানুষ তাকে দেখেই বুঝবে যে, সে কোন এতীমের অর্থ-সম্পদ হজম করেছে।

এবনে মরদবিয়ায় আরো একখানি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করি যে, তোমরা দুটি দুর্বল সম্প্রদায়ের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে পৌঁছে দাও। একটি হলো নারী সম্প্রদায়, আর অপরটি এতীম সম্প্রদায়। তোমরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাদের নিকট এতীম ছিল তাদের পানাহারের ব্যবস্থা ভিন্ন করে দেয়। তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের আহার্য বস্তু যদি অবশিষ্ট থাকতো তবে পরবর্তী সময় তাদেরকে দেয়া হতো অথবা রাস্তায় ফেলে দেয়া হতো। যে বাড়ীতে এতীম থাকতো সে বাড়ীর কেউ এতীমের খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করতে সাহস করতো না। এ বিষয়টি উভয় পক্ষের জন্যেই অসুবিধাজনক হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ সম্পর্কে আরযী পেশ করা হলো। তখন নাযিল হলো পবিত্র কোরআনের এ আয়াত–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى

অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে এতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এরপর আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ হয়, যে পন্থায় এতীমদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তোমরা সে পন্থা অবলম্বন কর। এরপর এতীমদের পানাহার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পুনরায় একত্রিত করা হয়।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৪৯

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

তরজমা

(১১) আল্লাহ পাক তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে এ আদেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দু' কন্যার অংশের সমান কিন্তু যদি কন্যা সন্তানই দুয়ের অধিক থাকে তবে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু' তৃতীয়াংশ। আর যদি এক কন্যাই থাকে তবে সে লাভ করবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে তবে তার পিতা-মাতার মধ্যে প্রত্যেকের জন্যে মূল সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ রয়েছে। আর যদি তার কোন সন্তানই না থাকে এবং পিতা মাতাই হয় তার ওয়ারিশ, তবে মাতার জন্যে এক তৃতীয়াংশ। আর যদি একাধিক ভাই বোন থাকে তবে তার মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ (অবশ্য এ ভাগ কার্যকর হবে মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করেছে তা আদায় করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধ করার পর)। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিকতর উপকারী হবে তা তোমরা জান না, এটি আল্লাহর বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী এবং এবনে মাজায় এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, বনী সালমা নামক মহল্লায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আগমন করেন। আমি তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম। তিনি অজু

করে আমার উপর পানির ছিঁটা দেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন আরজ করি ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি আমার সম্পদের ব্যাপারে কোন ওসিয়ত করতে পারি? এ সম্পর্কে হুজুরের কি আদেশ? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সা'দ এবনে বারীর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সা'দ (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে আপনার সঙ্গে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। এ দুটি কন্যা তিনি রেখে গেছেন, আর এ কন্যাদ্বয়ের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নিয়েছে। অথচ অর্থ সামর্থ ব্যতীত এদের বিয়ে শাদী দেয়াও সম্ভব নয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, এরপর এ আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কন্যাদ্বয়ের চাচাকে আদেশ করলেন, সা'দের পরিত্যক্ত সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ তাদের কন্যাদেরকে দাও। আর এক অষ্টমাংশ তাঁর স্ত্রীকে দাও। আর অবশিষ্টাংশ তোমরা ভোগ কর।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বর্বরতার যুগে কন্যা সন্তানদেরকে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে কিছুই দেয়া হতো না। এমনকি অল্প বয়স্ক পুত্র সন্তানরাও কিছু লাভ করতো না। উত্তরাধিকার লাভ করার সৌভাগ্য তারই হতো যে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি রাখতো। হযরত হাস্যান (রাঃ) যিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাঁর ভাই আবদুর রহমানের এন্তেকাল হয়। তিনি এক স্ত্রী এবং পাঁচ কন্যা রেখে যান। তখন অন্য ওয়ারিশগণ তাঁদের অর্থ-সম্পদ দখল করে নেয়। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করলে নাযিল হয় এ আয়াত।

فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

আর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর স্ত্রী সম্পর্কে নাযিল হয়–

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

বর্বরতার যুগে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কন্যা সন্তানদেরকে বঞ্চিত করা হতো। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে উত্তরাধিকারের বন্টনে যে অত্যাচার হতো তা বন্ধ করার ঘোষণা রয়েছে।

উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ

এখানে একথা প্রণিধাণযোগ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার আপনজনদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে এবং

ওয়ারিশানদের মধ্যে যারা এতীম তাদেরকে আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এতীমের হক্ব যারা গ্রাস করে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার অংশ কতখানি তার বিস্তারিত বিবরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে ঘণিষ্ট সম্পর্ক থাকে তার সন্তান-সন্ততির সাথে। তাই তাদের সম্পর্কেই সর্ব প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র কন্যা উভয়েই থাকে তবে এক ছেলে পাবে দু' মেয়ের অংশের সমান অর্থাৎ ছেলের অংশ মেয়ের অংশের দ্বিগুণ হবে কেননা, ছেলেদের যেমন দায়িত্ব বেশী তেমনি প্রয়োজনও বেশী। তাদেরকে অনেকের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ পর্যায়ে একটি তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি কত মেহেরবান তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় এ আয়াতে। কেননা এতে আল্লাহ্ পাক পিতার প্রতি নির্দেশ জারী করেছেন যেন তার সন্তানদের ব্যাপারে সে দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করে। এতদ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানের প্রতি যত মেহেরবান হয় তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ অধিকতর মেহেরবান হন স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টির উপর। একখানি হাদীসে রয়েছে– এক বন্দী মহিলার সন্তান হারিয়ে গেলে সে পাগলের মত ছুটাছুটি করে সন্তানের সন্ধানে। একটু পরে শিশুটিকে যখন পাওয়া যায় তখন সে তাকে বুকে নিয়ে সকলের সামনেই দুধ পান করাতে শুরু করে। তখন সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, এ মহিলা কি তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই নয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি এর চেয়ে অধিকতর মেহেরবান।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদের হক্বদার হতো শুধু তার ছেলেরা। আল্লাহ্ পাক ঐ নিয়ম বাতিল ঘোষণা করে ছেলে মেয়ে উভয়কে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী বলে ঘোষণা করেন অবশ্য একথা সত্য যে, এক ছেলে দু' কন্যার সমান অংশ লাভ করবে।[১]

যদি কারো এক ছেলে এবং দু' মেয়ে থাকে তবে ঐ ছেলে অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে আর মেয়েরা পাবে অবশিষ্ট অর্ধেক। কিন্তু কারো যদি একটি ছেলে এবং

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

একটি মেয়ে থাকে তবে ছেলে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ, আর মেয়ে পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। যদি কারো পুত্র সন্তানই না থাকে শুধু মেয়েই থাকে তবে দুই বা তার চেয়ে বেশী মেয়ে থাকলে তারা দু' তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, মাত্র একটি মেয়েই রয়েছে তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতার অংশের কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তার পিতা-মাতা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি সন্তান-সন্ততি এবং ভাই বোন না থাকে এমন অবস্থায় পিতা-মাতাই হয় তার ওয়ারিশ। তবে মাতা পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে, আর পিতা পাবে দু' তৃতীয়াংশ। আর যদি তার সন্তান সন্তুতি না থাকে কিন্তু তার সহোদর বা বৈমাত্রিয় বা বৈপিতৃয় ভাই বোন এক বা তার চেয়ে বেশী থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, অবশিষ্ট যা কিছু থাকে তা পাবে তার পিতা। ভাই বোনেরা কিছু পাবে না।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ওয়ারিশানদের মধ্যে এ সম্পদ কখন বন্টন করা হবে তাও পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছে–

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি কোন ঋণ থাকে তা আদায়ের পর এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পর্যন্ত তার ওসিয়ত সম্পাদনের পর (যদি সে ওসিয়ত করে থাকে) যা কিছু থাকবে তা উপরোল্লিখিত হারে ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সন্তান-সন্ততির অংশ এবং পরে পিতা-মাতার অংশের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর এরশাদ হয়েছে–

اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

অর্থাৎ পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের সবচেয়ে উপকারী এ কথা তোমরা জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, আল্লাহ্ পাক যার জন্যে যে অংশ নির্ধারণ করেছেন তা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক ওয়াকেফহাল। অতএব, তাঁর হুকুম অবশ্য

পালনীয়। তাঁর বিধান বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরাধিকারের বিতরণ এবং অসিয়ত কার্যকর করার পূর্বে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। কেননা ঋণ মৃত ব্যক্তির মাগফেরাত লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ মাফ করা হয়। (মুসলিম শরীফ)

তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর তার ঋণ আদায় করা কর্তব্য। যদি প্রয়োজন হয় তবে তার সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারাও তার ঋণ আদায় করতে হবে। অতঃপর তার এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পর্যন্ত অসিয়ত কার্যকর হবে। এরপর যা থাকবে তা ওয়ারিশানদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[১]

وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১২

তরজমা

(১২) এবং যদি তোমাদের পত্নীগণের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তোমরা অর্ধাংশ পাবে; আর যদি ঐ পত্নীগণের কোন সন্তান থাকে, তবে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অবশ্য (এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে) তোমাদের পত্নীদের অসিয়ত অথবা ঋণ আদায়ের পর। এবং যদি তোমাদের কোন সন্তান সন্ততি না থাকে, তবে তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান সন্ততি থাকে তবে তোমাদের অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ থেকে পত্নীগণ অষ্টমাংশ পাবে। যদি কোন মৃত ব্যক্তির কেউ ওয়ারিশ হয়, সে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী যার (অবস্থা এরূপ যে) না আছে মূল না আছে শাখা এবং তার এক ভাই এবং বোন থাকে তবে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন বেশী থাকে তবে তার অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ সবাই অংশীদার হবে। (আর এ কাজটি এভাবে করতে হবে) যেন কারো কোন ক্ষতি না হয়– এটিই আল্লাহর আদেশ। এবং আল্লাহ পাক সব কিছুই জানেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন।

(১৩) এসব আল্লাহ পাকের নিদৃষ্ট সীমা সমূহ। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের তাবেদারী করবে আল্লাহ পাক তাকে (পুরস্কার স্বরূপ) এমন বেহেশত দাখিল করবেন যার তলদেশ থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, তারা সেই বেহেশতে চিরদিন থাকবে; আর এটি হবে তাদের মহা সাফল্য।

(১৪) আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা সমূহকে লংঘন করবে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে দোযখে দাখিল করবেন। সে চিরদিন দোযখে থাকবে এবং তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

উত্তরাধিকারের বন্টন সম্পর্কে আরো কিছু কথা

কারো স্ত্রীর মৃত্যু হলে যদি তার সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আর যদি সন্তান-সন্ততি থাকে তবে স্বামী পাবে চার ভাগের এক ভাগ। অবশ্য এ বন্টন বিধি কার্যকর হবে তখন, যখন তার ওসিয়ত পূর্ণ করা হয় অথবা যদি ঋণ থাকে তা আদায় করা হয়। আর স্বামীর মৃত্যুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ লাভ করবে যদি স্বামীর কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে আর যদি স্বামীর সন্তান-সন্ততি থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে স্ত্রী। এক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পূর্ণ করার অথবা ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরই এ বন্টন বিধি কার্যকর হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি ঐ স্বামীর ঔরশজাত হোক বা অন্য স্বামীর পক্ষ থেকে হোক, এমনিভাবে স্বামীর সন্তান ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক বা অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভজাত হোক তাতে স্বামী স্ত্রীর অংশের ব্যাপারে যে নিয়ম নীতি ঘোষণা করা হয়েছে তার কোন পার্থক্য হবে না। এমনিভাবে সন্তানের সংখ্যা এক হোক বা একাধিক, ছেলে হোক কি মেয়ে, সকল অবস্থায়ই স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে ঘোষিত বিধানে কোন পরিবর্তন হবে না। এক্ষেত্রে যে ঘোষণাটি পবিত্র কোরআন একাধিকবার করেছে তাহলো, ওয়ারিশদের অংশ যাই নির্ধারিত হোক না কেন তার বন্টন কার্যকর হবে শুধু মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ এবং কোন ওসিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করার পর।

এ আয়াতের তফসীরে তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরো বলেছেন, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দেয়, আর স্ত্রী ইদ্দতের অবস্থায় থাকে এমন সময় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। পক্ষান্তরে, যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দত অতিবাহিত করার সময় স্বামীর মৃত্যু হয় তবে এ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। এখানে আরো একটি কথা আছে তাহলো, স্ত্রী যদি ইদ্দত অতিবাহিত করার অবস্থায় থাকে তখনই শুধু স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে। এ মত পোষণ করেন ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)।

আর ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মত হলো, ইদ্দত অতিবাহিত করার পরও এমন অবস্থায় স্ত্রী উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত হলো, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত করে সে নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়।

আর ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করে যদি অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবু সে উত্তরাধিকারী হবে।

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

এ আয়াতে 'কালালা' সম্পর্কে বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম 'কালালা' শব্দটির ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, 'কালালা' সে ব্যক্তি যার পিতাও নাই, পুত্রও নাই।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) 'কালালা' শব্দটির এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে যখন আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'কালালা' শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন ঃ আমি আমার মত পেশ করছি, যদি সঠিক হয় তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হবে, আর যদি সঠিক না হয় তবে আমার তরফ থেকে হবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমার মতে 'কালালা' সেই ব্যক্তি

যে কারো পিতা নয় এবং যার কোন সন্তান-সন্ততিও নেই। যখন হযরত ওমর (রাঃ) খলিফাতুল মুসলেমীন নির্বাচিত হলেন, তাঁকে 'কালালা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) যে মত পোষণ করেছেন আমিও সে মতই পোষণ করি। আমি তাঁর মতের বরখেলাফ কিছু চিন্তা করতে লজ্জাবোধ করি। (বায়হাকী)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত বরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, আমি 'কালালা'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির পিতা এবং সন্তান ব্যতীত যে ওয়ারিশ থাকে সে-ই 'কালালা'।

ইমাম আবু দাউদ, আবু সালমা এবনে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতাও রেখে যায়না এবং সন্তানও রেখে যায়না তার ওয়ারিশ হয় 'কালালা'।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদি মা এক পিতা ভিন্ন হয় তবে তাদেরকে "আখয়াফী" বলা হয়, যদি 'কালালা'র 'আখয়াফী' ভাই বোন থাকে তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। এ বিধান তখন যখন এক ভাই বা এক বোন থাকে কিন্তু যদি তারা একাধিক থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সকলেই সমানভাবে শরীক হবে।[১]

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পূর্ণ করার পর এবং কোন ঋণ থাকলে তা আদায়ের পরই ওয়ারিশানের মধ্যে সম্পদ বন্টন হবে এবং কারো যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মৃত ব্যক্তি তার সম্পদের শুধু এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারেই ওসিয়ত করতে পারে। যদি এর অধিক ওসিয়ত করা হয় তবে স্বভাবতই ওয়ারিশগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোন কোন পুরুষ এবং মহিলা সাতটি বছর যাবত আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে কিন্তু মৃত্যুর সময় ওসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারিশদের ক্ষতি করে, আর এ কারণে তাদের জন্যে দোযখও ওয়াজেব হয়ে যায়। তবে এ হাদীস বর্ণনার পর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। (আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ)

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৬-১৮

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওয়ারিশদের উত্তরাধিকার কেটে নেবে আল্লাহ পাক তার জান্নাতের অংশ কেটে দেবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যদি আমি সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশের ওসিয়ত করি তবে তা এক চতুর্থাংশের ওসিয়ত থেকে উত্তম মনে করি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশের জন্যে ওসিয়ত করে সে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ সম্পদের ওসিয়তকারী থেকে উত্তম। (বায়হাকী)

ওসিয়ত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ওসিয়ত কয়েক প্রকার হতে পারে যথা- ওয়াজেব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ। যদি মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় তার উপর যাকাত, মানত বা ফরজ হজ্জ বা নামায রোজার কাজা ওয়াজিব থাকে তবে ঋণ এবং যাকাত আদায়ের পর নামায রোজার ফেদিয়া দেয়ার ওসিয়ত করা ওয়াজেব। অতএব মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা কর্তব্য। ঋণ আদায়ের পর এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। যদি এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ওসিয়ত করা হয় তবে এমন ওসিয়ত কার্যকর হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোন মুসলমানদের নিকট যদি কারো হক্ব থাকে যার ওসিয়ত করা জরুরী তার জন্যে ঐ ওসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে দুটি রাত অতিবাহিত করা বৈধ নয়। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় দু' রাতের বদলে তিন রাতের উল্লেখ রয়েছে।

যে ব্যক্তির উপর কারো হক্ব নেই তার জন্যে এক দশমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো যদি তার ওয়ারিশগণ ধনী হয়।

পক্ষান্তরে, যদি ওয়ারিশগণ অভাবগ্রস্ত হয় তবে এমন অবস্থায় ওসিয়ত করা বা খয়রাত করা মকরূহ তানজিহী তথা এমন ক্ষেত্রে অসিয়ত না করা উত্তম কেননা, অসিয়ত না করার কারণে তার ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন হবে।

দান খয়রাত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন গরীব মিসকিনকে দান খয়রাত করা দানই হয় কিন্তু কোন গরীব আত্মীয়কে দান করা হয় তবে যেমন দান হয় তেমনি সেলায়ে রেহমী অর্থাৎ গরীব আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করাও হয়। (আহমদ, তিরমিযী, দারমী, এবনে মাজাহ)

ওয়ারিশদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যে ওসিয়ত করা হয় অথবা যে ওসিয়ত দ্বারা কার্যত ওয়ারিশগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন ওসিয়ত হারাম।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২০-২১

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ

অর্থাৎ এটি আল্লাহর হুকুম, এ হুকুমের বরখেলাফ করার অধিকার কারোই নাই।

অতএব, ওসিয়ত করে আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। এমন ওসিয়ত চির নিষিদ্ধ। এমনিভাবে ওসিয়ত সম্পাদন এবং ঋণ পরিশোধ না করে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন বৈধ নয়। এ বিষয়টিকে বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের পর সর্বপ্রথম জরুরী কাজ হলো তার ঋণ পরিশোধ করা, এরপর আসবে ওসিয়তের কাজ। অতঃপর বিধান মোতাবেক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করা হবে।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি অত্যন্ত ভাল ভাবেই জানেন কে আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ করে, আর যেহেতু তিনি হালীম বা ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক, তাই সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়কারীদের শাস্তি বিধান করেন না।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এতীমের হক্ব, উত্তরাধিকার, মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত সম্পর্কে যে নিয়ম-কানুন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ এসব হলো আল্লাহর বিধান, তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম কানুন। যে এ নিয়ম কানুন মেনে চলবে সে চিরদিন বেহেশতে বাস করবে আর যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করবে, আল্লাহর বন্টন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করবে বা অপছন্দ করবে, কোন ওয়ারিশকে কম বা বেশী দেবে বা এসব বিষয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে না তবে তার জন্যে রয়েছে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি।

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا
عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي
الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ
سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا
وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

তরজমা

(১৫) এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী গ্রহণ কর, অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে স্বীয় গৃহ সমূহে অবরুদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদেরকে শেষ করে দেয় অথবা আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে অন্য কোন পথ নির্ধারিত করেন।

(১৬) এবং তোমাদের মধ্যে যে দু' ব্যক্তি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে উভয়কে শাস্তি দাও। অতঃপর যদি তারা উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে তবে তাদের পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তওবা গ্রহণকারী, অতিশয় দয়ালু।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এতীমের হক্ব এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্দেশ সমূহ বর্ণনার পর নারীদের ব্যাপারে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কেননা, প্রাক-ইসলামী যুগে নারী জাতির প্রতি জুলুম অত্যাচার হতো অহরহ। ইসলামের আবির্ভাবের পর নারী জাতির অধিকার স্বীকৃত হয় এবং আবহমান কাল ধরে তাদের প্রতি যে অত্যাচার অবিচার করা হচ্ছিল তা বন্ধ করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি কারো স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তবে তোমরা এ ব্যাপারে চার জন মুসলমান স্বাধীন, সাবালক সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি চার জন সাক্ষী অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে উক্ত মহিলাকে গৃহে বন্দী রাখা হবে। বাইরে যাতায়াতের অনুমতি দেয়া হবে না এবং কারো সঙ্গে মোলামেশা করার অনুমতিও সে পাবে না। তার মৃত্যু পর্যন্ত এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে অথবা আল্লাহ্ পাক তার সম্পর্কে অন্য কোন নির্দেশ দান করবেন, আর এ নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাকে গৃহ বন্দী রাখতে হবে। ইসলামের প্রথম যুগে এটিই ছিল ব্যাভিচারিনীর শাস্তি। পরবর্তীতে সূরা নূরে ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা হয় পাথর মেরে হত্যা করা। আর অবিবাহিতার জন্যে একশত বেত্রাঘাত।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সূরা নূরের এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাভিচারিনীর শাস্তি স্বরূপ এ আদেশই জারী ছিল। অতঃপর যখন সূরা নূরে রজমের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হলো তখন এ আদেশ বাতিল হলো।

হযরত সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত আতা খোরাসানী (রঃ), হযরত আবু সালেহ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) হযরত যাহ্যাক (রঃ) এ অভিমতই পোষণ করেছেন এবং তাঁরা একমত যে, আয়াতটি মনসুখ হয়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৭৯

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا

কোন দু' ব্যক্তি যদি ব্যাভিচারের ন্যায় অপরাধ করে তাদের একজন নারী একজন পুরুষ হোক অথবা দু জনই পুরুষ হোক তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।

ইমাম আতা এবং কাতাদা বলেছেন যে, তাদেরকে মুখে তিরস্কার করতে হবে এবং দৈহিক শাস্তিও দিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন তাদেরকে তিরস্কার কর এবং হাত দিয়ে শাস্তি দাও এবং জুতা মার।

পরবর্তীতে যখন সূরা নূরে ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয় তখন সে শাস্তিই জারী হতে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় হযরত মায়েজ (রাঃ) এবং গামেদীয়া নামক মহিলাকে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং দু' জন ইহুদীকেও এ শাস্তি প্রদান করা হয়। আর যদি দু' জন পুরুষ এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় তথা লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অন্যায় করে তাদের জন্যেও শাস্তির আদেশ রয়েছে এ আয়াতে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, ব্যাভিচারের আর লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের একই শাস্তি। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, তরবারীর আঘাতে বা অন্য কোন উপায়ে মেরে ফেলাই হলো এর উপযুক্ত শাস্তি।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন যে, বিচারক যে শাস্তি উচিত মনে করেন লুতী সম্প্রদায়কে সে শাস্তি দিতে হবে। যদি বার বার শাস্তি দেয়ার পরও অপাধ থেকে বিরত না হয় তবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া যেতে পারে অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেয়া যেতে পারে।

فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا

অর্থাৎ যদি তারা তওবা করে আন্তরিকভাবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং এ ঘৃণ্য ও হীন কুকর্মকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে তবে তাদেরকে তোমরা গাল-মন্দ দিওনা। কেননা যে ব্যক্তি পাপাচার থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তওবা করে এবং পাপের পুনরাবৃত্তি না করে সে যেন পাপ করে নাই, তওবার বরকতে তার এ অবস্থা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক বন্দাদের তওবা গ্রহণকারী, তিনি অত্যন্ত দয়াবান, আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল, করুণাময়, তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়, তাঁর দরবারে কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থী হয়ে তওবা করে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন। অতএব এমন অবস্থায় তোমরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করে অপদস্ত করোনা।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـَٔـٰنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৭) আল্লাহ্ পাক শুধু তাদের তওবাই কবুল করেন যারা ভুলবশতঃ কোন অন্যায় কাজ করে তৎপর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফেলে। এ সমস্ত লোকদের প্রতিই আল্লাহ পাক দয়া করেন। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

(১৮) এবং তাদের তওবা নয় (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করেন না তাদেরকে ক্ষমাও করেন না) যারা আজীবন মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে। এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (তখন) সে বলে, নিশ্চয় আমি এখন তওবা করছি এবং তাদের জন্যে তওবা নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়, তাই সেসব লোকদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়। আর এ আয়াতে তওবার সময় এবং শর্ত বর্ণিত হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে তওবা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ তওবা কবুল করা বা গুনাহ মাফ করা আল্লাহ্ পাকের দায়িত্বে সে সব লোকের জন্যে যারা

لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

অজ্ঞাতাবশতঃ পাপাচারে লিপ্ত হয়, এরপর অবিলম্বে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। অতএব, তওবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে দুটি শর্ত

আরোপ করা হয়েছে (১) কেউ যদি মূর্খতা এবং অজ্ঞতাবশতঃ পাপাচারে লিপ্ত হয়। (২) অবিলম্বে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে তাহলে আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ করবেন।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে بِجَهَالَةٍ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, প্রত্যেক পাপকার্য ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় তা অবশ্যই মূর্খতা বা জেহালত। যে আল্লাহর নাফরমানি করে সে জাহেল বা মূর্খ। কালবী (রঃ) এ জেহালত বা মূর্খতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পাপী ব্যক্তি পাপ কার্য সম্পর্কে বেখবর নয়; বরং পাপের শাস্তি সম্পর্কে বেখবর এবং মূর্খ।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এখানে জেহালত বা মূর্খতার তাৎপর্য হলো, চিরস্থায়ী আরাম আয়েশকে ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে গ্রহণ করা জেহালত বা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেন ঃ কুপ্রবৃত্তির তাড়নার সময় আল্লাহর আযাব থেকে গাফেল হওয়াই হলো মূর্খতা।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) "জেহালত" শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন পবিত্র কোরআন থেকে। তিনি বলেছেন ঃ তফসীরকারদের মতে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করা তথা পাপাচারে লিপ্ত হওয়াই হলো মূর্খতা আর যে পাপাচারে লিপ্ত হয় সে হলো মূর্খ। পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফে আল্লাহ্ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যা তিনি তাঁর ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ

"তোমরা কি জান? যে তোমরা ইউসুফ এবং তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা মূর্খ ছিলে"।

এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে সম্বোন্ধন করে যা বলেছিলেন তাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–

اِنِّیْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

(নিশ্চয় আমি তোমাকে নসিহত করি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে।) এমনিভাবে সূরা বাকারায় হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনায়ও এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ঃ

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৮

"মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহর পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে"।[১]

অতএব, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জেহালত অর্থ মূর্খতা তথা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। যারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর নাফরমানী করে, এরপর অনতিবিলম্বে আল্লাহর দরবারে তওবা করে আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন।

আলোচ্য আয়াতে مِنْ قَرِيْبٍ শব্দটির ব্যাখ্যায়ও কথা আছে অর্থাৎ তওবার সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে? এর জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ অন্যায় করার পর অবিলম্বে তওবা করার তাৎপর্য হলো, পাপাচার যেন সৎ কাজ সমূহকে বিনষ্ট না করে তার পূর্বে তওবা করা।

অথবা এর অর্থ হলো, গুনাহর প্রতি আকর্ষণ যেন অন্তরকে কলুষিত না করে তার পূর্বে তওবা করা।

কালবী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ সুস্থ অবস্থায় তওবা করা তথা মৃত্যু-রোগ শুরু হওয়ার আগেই তওবা করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই তওবা করা। একরামা এবং যাহ্যাকও এ ব্যাখ্যাই পেশ করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ ইবলিস শয়তান আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করেছে, তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ, যতক্ষণ মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবো। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমিও তাকে ক্ষমা করবো যখন সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হবে। (আহমদ)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক রাত্রে তাঁর দস্তে মুবারক প্রসারিত করেন যেন দিনে যে গুনাহ করেছে সে তওবা করে এবং তার তওবা আল্লাহ পাক কবুল করেন। এমনিভাবে আল্লাহ পাক দিনে তাঁর দস্তে মুবারক প্রসারিত করেন যেন রাতে যে গুনাহ করেছে সে তওবা করে এবং তিনি তার তওবা কবুল করেন। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে ব্যক্তি তওবা করবে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন। অতএব, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করা।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪

বস্তুতঃ মানুষ যখন পাপ পংকিলতার পথ পরিত্যাগ করে কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় তখন আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন। তাই এরশাদ হয়েছে–

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ এরাই সে সব লোক যাদের তওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করেন, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করেন।

একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বণী ইসরাঈল জাতির এক ব্যক্তি ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছিল। এ সময় তার তওবার ইচ্ছা হলে সে এক ধর্মযাজকের নিকট গমন করে। ধর্মযাজক তাকে বললো, "তোমার তওবা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা"। একথা শ্রবণ করে লোকটি অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ধর্মযাজককে হত্যা করে ফেললো। এরপর তাকে এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে, তোমার তওবা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তোমাকে এ এলাকা ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যেতে হবে। এ পরামর্শ গ্রহণ করে লোকটি স্বীয় এলাকা পরিত্যাগ করে নিদৃষ্ট স্থানে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হাযির হলে, সে ধরাশায়ী হলো। তখন রহমতের ফেরেশতা বললেন, আমি তার রুহ্ কবজ করবো। কেননা এ ব্যক্তি তওবা করে তার এলাকা থেকে হিজরত করেছিল। আর আযাবের ফেরেশতা বললেন, আমি তার প্রাণ বের করবো কেননা, সে এখনও গন্তব্য স্থলে পৌঁছেনি। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আরেকজন ফেরশতা প্রেরিত হলেন। তিনি এসে বিতর্কিত বিষয়টি এভাবে মীমাংসা করলেন ঃ উভয় গ্রামের ব্যবধান পরিমাপ করা হোক। যে গ্রাম নিকটবর্তী হবে তাকে সে গ্রামেরই বিবেচনা করা হবে। এরপর ফেরেশতাগণ পথের পরিমাপ আরম্ভ করলেন, আর লোকটি মুমূর্ষু অবস্থায়ও গন্তব্য স্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছিল যাতে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হয়। তার এ প্রচেষ্টা দেখে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হলেন এবং তওবা কবুল হওয়ার স্থানটিকে এগিয়ে আসার আদেশ দিলেন। ফেরেশতাদের পরিমাপে দেখা গেল লোকটি সেই পবিত্র স্থানের নিকটবর্তী হয়েছে, আর গুনাহর গ্রামটি দূরবর্তী হয়ে রয়েছে। তখন রহ্মতের ফেরেশতা লোকটির রুহ্ কবজ করে।*

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, কে এখলাস বা আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করে তা আল্লাহ্ পাক ভালভাবেই জানেন। আর তার সমস্ত কাজ হেকমত পূর্ণ। তাই কাকে শাস্তি দিতে হবে, কখন শাস্তি দিতে হবে তাও তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

* তওবার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআনের তৃতীয় খণ্ডে।

যে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না

যারা অহরহ পাপাচার লিপ্ত থাকে, পাপ-পংকিলতায় কলুষিত হয় তাদের জীবন, অবশেষে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যারা বলে এখন আমরা তওবা করছি, তাদের তওবা আল্লাহ্ পাক কবুল করেন না। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ

অর্থাৎ এমন লোকের তওবা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয় না যারা সর্বদা অন্যায় অবিচারে লিপ্ত থাকে, অতঃপর যখন মৃত্যুর মখোমুখি হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম। এমন তওবা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়না। যেমন ফেরাউন যখন আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন সে তওবা করেছিল। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

حَتّٰى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

যখন তার নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হলো তখন সে বললো, আমি বিশ্বাস করি যে বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমি অনুগত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে ফেরাউনের তওবা কবুল হল না। তাই এরশাদ হয়েছে–

آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

"এখন তুমি বিশ্বাস করেছ? অথচ অবস্থা এই যে, তুমি ছিলে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।

এমনিভাবে যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাদের তওবাও কবুল হয়না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকেও ক্ষমা করবেন না। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ

অর্থাৎ আর সে সব লোকদের তওবাও কবুল হয় না যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। অথবা এর অর্থ এই যে, তারা মৃত্যুর পর আখেরাতের আযাব দেখে আল্লাহর দরবারে আরযী পেশ করবে ঃ

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আযাব দেখেছি এবং শ্রবণ করেছি। আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিন। যদি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হয় তবে আমরা নেক আমল করবো এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। কিন্তু তাদের এ তওবা কবুল হবে না। তাদের শাস্তি অবধারিত থাকবে। তাই এরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

এরাই সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

তওবা নেককার ও বদকারের দৃষ্টিতে

হারেস এবনে সুহাইদ (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদের নিকট দুটি হাদীস বর্ণনা করেন। একটি তাঁর নিজের তরফ থেকে, আর একটি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ মোমেন ব্যক্তি তার গুনাহকে এভাবে দেখে যেন সে পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান রয়েছে এবং সে আশংকা করছে এই পাহাড়টি তার উপর পড়বে। আর পাপী লোকেরা তাদের গুনাহকে এভাবে দেখে যেন তার নাকের উপর মাছি বসেছে। তাকে হাতে ইঙ্গিত করাতে সে উড়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এই হাদীসে কোন পাপকার্য সংগঠিত হবার পর নেককার এবং বদকার মানুষের অন্তরের যে অবস্থা হয় তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। মোমেন তার কৃত গুনাহকে এত ভয় করে যেন পাহাড় তার ওপর পড়বে এজন্যে সে অবিলম্বে তওবা করে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়। পক্ষান্তরে, যে বদকার সে তার গুনাহকে একটি সাধারণ জিনিস মনে করে যেন তার নাকের ডগায় একটি মাছি বসেছিল যাকে তার হাতের ইশারায় সে দূর করে দিয়েছে অথচ কোন সময় মানুষ যখন অতি ব্যস্ত থাকে তখন মাছি বসার এবং তাকে তাড়াবার খেয়ালও তার থাকেনা। এমনিভাবে যারা পাপীষ্ঠ তাদের গুনাহর প্রতিও খেয়াল থাকেনা এবং তওবাও করে না। হাফেজ এবনে হাজার (রঃ) লিখেছেন, মোমেন তার গুনাহর জন্যে যে ভীত হয় তার কারণ এই যে, তার অন্তর নূরানী হয়। যখন এমন কিছু দেখে যা অন্তরের নূর বিরাধী, তখন সে অবস্থাকে অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টদায়ক মনে করবে। যাহোক, ঈমানী শক্তির কারণেই মোমেন বন্দা পাপ কার্যের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং অবিলম্বে তওবা করে।

পক্ষান্তরে, বদকার লোকদের গুনাহ্ করার পরও নিঃশংক থাকার কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, ফলে পাপাচারকে তারা সাধারণ বিষয় মনে করে। এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় কোন মোমেনের গুনাহকে ভয় না করা বা সাধারণ বিষয় মনে করা তার বদকার হওয়ার প্রমাণ।

তওবার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের কারো তওবা করার কারণে এত সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন মরুভূমিতে ভ্রমণরত থাকে, তার নিকট যানবাহন ছিল তাতে তার পানাহারের যাবতীয় বস্তু ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে তার যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত উষ্ট্রটি হারিয়ে যায়। সে তার খোঁজে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, এমনকি সে মৃত্যুকে তার সম্মুখে দেখতে লাগল অবশেষে চিন্তা করল যেখান থেকে উষ্ট্রটি হারিয়ে গেছে, সেখানেই ফিরে যাই। সেখানে পৌঁছে সে নিরাশ এবং হতাশ হয়ে অসহায় নিরুপায় অবস্থায় তন্দ্রাহত হল। একটু পর সে জাগ্রত হয়ে দেখল যে তার উষ্ট্রটি তার পাশেই দণ্ডায়মান রয়েছে এবং তার পানাহারের যাবতীয় বস্তুও তার পৃষ্ঠদেশে বর্তমান রয়েছে। এ ব্যক্তি যত সন্তুষ্ট হয় তার চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হন আল্লাহ্ পাক যখন কোন বন্দা তাঁর নিকট তওবা করে এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এই হাদীসে বন্দার তওবার কারণে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তির যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। ঠিক এমন সময়ে তার যানবাহন এবং পানাহারের বস্তু সমূহ পেয়ে সে যেন নব-জীবন লাভ করে আর তখন তার আনন্দের সীমা থাকেনা। ঠিক এমনিভাবে কোন বন্দা পাপাচারে লিপ্ত হবার কারণে সে যেন শয়তান জন্তুর আক্রমণের শিকার হয়। সে যেন তাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় কিন্তু তওবা করার কারণে শয়তানের আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পায়। আল্লাহর রহমতের ছায়ায় সে আশ্রয় পায় তাই আল্লাহ্ পাক এ বন্দার তওবার কারণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

এতদ্বারা তওবার গুরুত্ব কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর তওবার কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনার দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এ জীবনে মানুষ স্বভাবগত কারণেই ভুল করে। সে ভুলের প্রতিকার হলো অবিলম্বে তওবা করা আর এটি শান্তি ও মুক্তির পথ। এটিই মানব জাতির বৈশিষ্ট্য। এটিই আল্লাহ্র রহমত লাভের পন্থা।

পবিত্র কোরআনে তওবার প্রতি গুরুত্ব

পবিত্র কোরআনে তওবার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে শুধু তওবার নির্দেশই দেয়া হয়নি, বরং তওবা করে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে আখেরাতের চিরশান্তি লাভের জন্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র কোরআন মজীদের ৭০ খানি আয়াতে তওবা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তন্মধ্যে–

تاب শব্দটি এসেছে ১৮ বার

تابوا শব্দটি এসেছে ১১ বার

تبت শব্দটি এসেছে ৩ বার

يتوب শব্দটি এসেছে ১২ বার

يتوبوا শব্দটি এসেছে ৩ বার

توبوا শব্দটি এসেছে ৭ বার

توبة শব্দটি এসেছে ৬ বার

تواب শব্দটি এসেছে ৮ বার

توابا শব্দটি এসেছে ৩ বার

পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির পর বেহেশতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁদের প্রতি কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ভুলবশতঃ তাঁদের পদস্খলন ঘটে, এজন্যে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করেন। সুদীর্ঘ ৩০০ বছর যাবত আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দন করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেনঃ

فَتَلَقّٰىٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিল। পরে আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেন।)

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে বহু সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের ও আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণের হেদায়েতের কথা এবং তওবা এস্তেগফারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কওমে হুদের প্রতি তওবার আহ্বান

যেমন হযরত হুদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে অন্যায় অবিচার থেকে তওবা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ

"এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তাঁর সমীপে তওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি বারি বর্ষণ করবেন, এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন, আর তোমরা অপরাধী হয়ে প্রত্যাবর্তন করোনা"।

বনি ইসরাঈলের প্রতি তওবার আহ্বান

এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতি বণী ইসরাঈলকে তাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করতে এবং ক্ষমা প্রার্থী হতে আহ্বান জানান। পবিত্র কোরআনে সে আহ্বান নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْآ اِلٰى بَارِئِكُمْ- الاية

"এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। অতএব, তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই উত্তম পন্থা। অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাদের তওবা কবুল করবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান"।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তওবার আদর্শ পেশ করেছেন। তিনি এরশাদ করছেন ঃ

كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون

"তোমাদের মধ্যে সকলেই গুণাহগার তবে গুণাহ গারদের মধ্যে ভাল সে ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আরো এরশাদ করেছেন; যদি কখনও কোন গুনাহ হয়ে যায় তবে তার সংশোধনের উপায় হলো তওবা করা"। গোপনীয় গুনাহর তওবা ওগোপনীয়ভাবে করতে হবে, আর প্রকাশ্য গুনাহর তওবা প্রকাশ্য ভাবে করবে।

আরো একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন কোন বন্দা গুনাহ করে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ এ বন্দা আমাকে ক্ষমাশীল ও আযাব দাতা বলে মনে করে, অতএব, তার গুনাহ ক্ষমা করলাম। এরপর বন্দা যখন পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয় এবং দ্বিতীয়বার আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় তখন আল্লাহ পাক বলেন, বন্দা আমাকে ক্ষমা ও শাস্তির মালিক মনে করে। অতএব আমি তাকে মাফ করলাম"।

সাহাবী আবু দারদা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলে; ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যখন কোন গুনাহর কাজ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে নেকীর কাজ করে নিও। এ নেকী সেই গুনাহকে বিনষ্ট করে দেবে।

তওবার মূল কথা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সুফী সাধক হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তওবায়ে নাসুহার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কৃত অন্যায়ের জন্যে আন্তরিক ভাবে লজ্জিত হওয়া, মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখা। এমনি ভাবে যারা আল্লাহর দরবারে তওবা করে এবং নিজেকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে দূরে থাকতে সচেষ্ট হয়, তাদের তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾ وَاِنْ
اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۲۰﴾ وَ
كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾

তরজমা

(১৯) হে মোমেনগণ! নারীদেরকে বলপূর্বক তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়, তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ তার কিছু অংশ অর্জন করার জন্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না, যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, এবং সৎ ভাবে তাদের সাথে জীবন যাপন কর, যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যাকে অপছন্দ কর আল্লাহ পাক তাতেই রেখেছেন তোমাদের জন্যে কল্যাণ।

(২০) যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থ দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপরাধ এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

(২১) এবং তোমরা তা কিভাবে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে একান্ত আপনজন হয়ে মিশেছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।

(২২) তোমাদের পিতা-পিতামহগণ যাদেরকে বিবাহ করেছেন তোমরা তাদেরকে বিবাহ করোনা। তবে অতীতে যা হবার হয়ে গেছে, এটি অত্যন্ত জঘন্য অশ্লীলতা এবং অসন্তুষ্টির কাজ, আর অত্যন্ত নিকৃষ্টতর পন্থা।

তফসীরুল কোরআন

নারী জাতির প্রতি নির্যাতন পরিহার করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে এ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার নিকটাত্মীয়রা ওয়ারিশ সূত্রে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে বল পূর্বক দখল করে নিত। যদি ইচ্ছা করতো তারা বিয়ে করে নিত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিত এবং দেন মোহর তারা নিজেরাই গ্রাস করতো। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অন্য তরফের পুত্র তার সৎমাকে বিয়ে করে নিত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে দখল করার পন্থা ছিল এই, সেই স্ত্রীলোকটির উপর বা তার তাবুর উপর যে কোন প্রকার কাপড় ফেলে দিত, এভাবে স্ত্রীলোকটির উপর তার দখল সাব্যস্ত হতো। সমাজ জীবনের এ কুসংস্কার এবং নারী জাতির প্রতি এ অত্যাচার পরিহার করার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। বস্তুত বর্বরতার যুগে নারী জাতির কোন অধিকার ছিল না। নারী জাতির প্রতি অত্যাচারই ছিল তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজ জীবন ছিল কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মানুষ ছিল বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, দিশেহারা। গোমরাহীর এ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেই আবির্ভাব হয় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের, নাযিল হলো বিশ্ব মানবের মুক্তির মহাসনদ পবিত্র কোরআন। ফলে একে একে সকল কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূত হলো। কেননা ইসলাম মানবতা বিরোধী আচরণ সহ্য করেনা। ইসলাম নারীকে তার আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا

হে মোমেনগণ! উত্তরাধিকার সম্পত্তি স্বরূপে নারীদেরকে বলপূর্বক দখল করা তোমাদের জন্যে আদৌ হালাল নয়। কারো মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে আর জবর দখল করোনা। ইতিপূর্বে যা হয়েছে অতঃপর এমন জঘন্য কাজ আর করোনা। অন্যত্র বিবাহ করা না করা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট থাকা না থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে সে নিজে। তাকে জবরদস্তি করে বিবাহ করা অথবা কারো হাতে বলপূর্বক অর্পণ করা জঘন্য অপরাধ।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, যদি সে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হতো তবে যে তার উপর কাপড় নিক্ষেপ করেছিল তাকেই তার ওয়ারিশ মনে করা হতো। আর যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর কোন ব্যক্তি কাপড় নিক্ষেপ করার পূর্বে সে পলায়ন করতে সক্ষম হতো তবে সে তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অধিকার লাভ করতো– এটিই বর্বরতার যুগের প্রচলিত কুপ্রথা।

শানে নুযুল

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৌরবোজ্জল যুগে আবু কায়েস এবনে আম্‌লাদ আনসারীর এন্তেকাল হয়। তার বিধবা স্ত্রী ছিল কাবীসা বিনতে মান আনসারী। আবু কায়েসের পুত্র যার নাম ছিল হামোয়ান অথবা কায়েস এবনে আবি কায়েস, সে তার কাপড় নিক্ষেপ করলো আপন সৎমা কাবিসার উপর। তবে সে তাকে বিয়েও করেনি এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দেয়নি। তার খোরপোষের ব্যবস্থাও করেনি। তার উদ্দেশ্য ছিল এভাবে কষ্ট দিলে স্বামীর উত্তরাধিকারী হিসেবে যা কিছু সে পেয়েছে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশটুকু নিয়ে তাকে মুক্তি দেবে। এ সময় কাবীসা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ঘটনা সম্পর্কে আরযী পেশ করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ তুমি তোমার বাড়ীতে গিয়ে অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন হুকুম আসে, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

বর্বরতার যুগে ক্ষেত্র বিশেষে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে এজন্যেও আটকে রাখা হতো যে তাদেরকে মৃত ব্যক্তি দেনমোহর হিসেবে যা কিছু দিয়েছে ফেরত দেয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করা হতো। তাই এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

(আর তাদেরকে তোমরা যে ধন-সম্পদ দিয়েছ তা ফেরত নেয়ার উদ্দেশ্যেও তাদেরকে আটক রেখো না।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পছন্দ না করতো এমন অবস্থায় তাকে কষ্ট দিত। তার প্রতি নির্যাতন করা হতো। তার মোহর আদায় করেছে বা করবে এমন অবস্থায় তাকে বলা হতো যে, যদি তুমি যা দেনমোহর দেয়া হয়েছে তা ফেরত দাও অথবা যা তুমি পাবে তার দাবী ছেড়ে দাও তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৪, পৃষ্ঠা-৮২
তফসীরে কবীর খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০

আলোচ্য আয়াতে এমন অন্যায় পরিহার করার তাগিদ করা হয়েছে।[১]

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সাথে ভদ্র ব্যবহার কর। বর্বরতার যুগের ন্যায় তাদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করোনা। যদি স্ত্রীর কোন অভ্যাস বা আচরণ অপ্রিয় হয় তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও, হতে পারে যে, এ অপ্রিয় স্ত্রীর মধ্যেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। আমি আমার স্ত্রীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি।

যাহোক, নারী জাতির প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন পরিহার করার এবং তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে–

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

বর্বরতার যুগের আরেকটি কুসংস্কার ছিল এই, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করতো তখন সে প্রথমা স্ত্রী থেকে প্রদত্ত দেনমোহর ফেরত নেয়ার চেষ্টা করতো। স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করতো। এমনকি, তার প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়ে ছলে-বলে কৌশলে তাকে বাধ্য করতো যেন সে দেনমোহরের টাকা ফেরত দেয়। আর এ টাকাই পরবর্তী বিবাহে ব্যয় করা হতো। পবিত্র কোরআন এমনি জঘন্য কু-প্রথা বাতিল বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও তবে পূর্বের স্ত্রীকে যা দেনমোহর আদায় করেছ তা ফেরত দিতে বাধ্য করোনা। এমনকি যদি তাদেরকে অগাধ সম্পদও দিয়ে থাক তবু তা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করোনা, এটি অমার্জনীয় অপরাধ।

তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে তাদের প্রতি অপবাদ দিয়ে দেনমোহর ফেরত নেয়ার ন্যায় অমানবিক কাজ আর কি হতে পারে?

আর দেনমোহরের টাকা কেন ফেরত নেবে?

বিয়ের পর তোমরা একে অন্যের কাছে এসেছ, পরস্পর পরস্পরকে একান্ত আপন করে নিয়েছ, তারা তোমাদের অংকশায়িনী হয়েছে, স্ত্রী হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করেছ, তোমাদের প্রতি তাদের দেনমোহর আদায় করা কর্তব্য হয়েছে, এমন অবস্থায় কিভাবে তোমরা দেনমোহর ফেরত নেবে?

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪১

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

প্রাক-ইসলামী যুগের আরও একটি কুসংস্কার ছিল, সৎ মা বা পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা হতো।

আলোচ্য আয়াতে এ জঘণ্য কাজকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজটি অত্যন্ত নিন্দনীয়, ঘৃণ্য, চরম অশ্লীল, নির্লজ্জ এবং মানবতার জন্যে অবমাননাকর তাই নিষিদ্ধ।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার মামা একটি পতাকা হাতে করে গমন করছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীর সাথে বিবাহ করেছে, তাকে হত্যা করার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।[১] (তিরমিজী শরীফ)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ
الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ
اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ
الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

তরজমা

(২৩) তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃগণ ও তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নীগণ ও তোমাদের ফুফুগণ ও তোমাদের খালাগণ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ ও তোমাদের ভগ্নীগণ এবং তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়েছে ও তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নীগণ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ, যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে। এরূপ পত্নীগণ থেকে যাদের সাথে তোমরা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছ। আর যদি সে স্ত্রীগণের সাথে এ সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরষজাত পুত্রগণের স্ত্রীগণ, আর এটিও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে যে, তোমরা দু' ভগ্নীকে (স্বীয় অন্তপুরে) একত্র কর কিন্তু ইতিপূর্বে যা হয়েছে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪৭

(হয়তো আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করবেন) নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বিয়ে-শাদী সম্পর্কে প্রাক-ইসলামী যুগে যেসব কুপ্রথা বা কুসংস্কার ছিল সেগুলো পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিয়েশাদী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে। কার সঙ্গে বিয়ে বৈধ, আর কার সঙ্গে বৈধ নয় তার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এ আয়াতে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় একটি ধর্ম মাত্র নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবের পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত জীবন বিধান, যা মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর তার নির্দেশ ইসলাম দেয়; আর যা মানব জাতির জন্যে অকল্যাণ ও অবমাননাকর তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় ইসলাম। কেননা ইসলামী জীবন বিধানের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করা, মানবতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে, যিনি লালন পালন করছেন মানব জাতিকে তাঁরই বিধান হলো ইসলাম, তাঁরই মহান বাণী হলো পবিত্র কোরআন, তাই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে বৈবাহিক সম্পর্ক কার সাথে বৈধ এবং কার সাথে অবৈধ। এরশাদ হয়েছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ- الاية

অর্থাৎ– আয়াতে উল্লেখিত নারীগণের সঙ্গে তোমাদের বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হলো। এ নারীগণ কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে বংশসূত্রে যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ তাদের সংখ্যা সাত। সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে মায়ের নাম, এরপর রয়েছে মেয়ের নাম, অতঃপর বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে। এদের কাউকে কখনো বিয়ে করা যাবে না। এদের সঙ্গে বিবাহ সর্বকালের জন্যে অবৈধ বা হারাম। এমনিভাবে দাদী, নানী যত উর্দ্ধ পর্যন্ত হোক এবং আপন মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ে যত নিম্ন পর্যন্ত হোক না কেন সবই মা এবং মায়ের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে বোন সহোদরা হোক বৈমাত্রেয় হোক অথবা বৈপিতৃক হোক, সর্ব প্রকার বোনের সঙ্গেই বিবাহ নিষিদ্ধ। বংশসূত্রে যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম তার আলোচনার পর দুধ সম্পর্কে যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

অর্থাৎ তোমাদের সে সব মাতাগণ যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং দুধ ভগ্নীগণ, এদের সঙ্গে বিয়ে-শাদীও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ বংশসূত্রে যা নিষিদ্ধ দুগ্ধ সম্পর্কেও তা নিষিদ্ধ। এজন্যেই দুধ-মা, দুধ-বোন, দুধ-খালা, দুধ-মেয়ে, দুধ-ভাই ঝি, দুধ-বোনঝি– এই সকলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার দুধ-পিতৃব্য ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাই। এর মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ সে তোমার চাচা, তাকে আসতে দাও।

আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে তো একজন স্ত্রীলোকই দুধ পান করিয়েছেন। পুরুষতো দুধ পান করাননি। তিনি তখনও এরশাদ করলেনঃ নিঃসন্দেহে সে তোমার চাচা, সে ভেতরে আসতে পারে।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দুগ্ধের সম্পর্ক বংশীয় সূত্রের সম্পর্কের মতই বিবেচিত হয়। এমনি আর একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। এমন সময় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন তখন আমি একটি পুরুষ কণ্ঠ শ্রবণ করলাম যে হযরত হাফসার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইছে। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার ঘরে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করার অনুমতি চায়। তিনি হযরত হাফসার পিতৃব্যের সম্পর্কে এরশাদ করলেনঃ আমার ধারণা সে ব্যক্তিই হবে। আমি আরজ করলাম (আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় পিতৃব্যের নাম নিয়ে) যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো তবে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতো? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ যেভাবে জন্মসূত্রে মহরম হয়, ঠিক তেমনি দুগ্ধ সম্পর্কের কারণেও মহরম হয়। (বগবী (রঃ)

দুগ্ধ-সম্পর্ক

এ বিষয়ে ইমাম সাহেবদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে যে, কতখানি দুধ পান করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে দুগ্ধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, ক্ষণিকের জন্যে সামান্যতম দুধ পান করলেও এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা যে হাদীসের কারণে দুগ্ধ সম্পর্কের এ বিধান, সেই হাদীসে কম বেশীর কোন উল্লেখ নেই। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আহমদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, দুগ্ধ সম্পর্ক

শুধু তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় কমপক্ষে পাঁচবার পেটভরে দুধ পান করে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আহমদ (রঃ)-ও এ মত পোষণ করতেন। আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে ইমাম আহমদ (রঃ) এ পর্যায়ে পাঁচবারের স্থলে তিন বার দুগ্ধ পানের শর্ত বলেছেন।

আবু সওর এবনুল মনজারা, দাউদ, আবু ওবায়েদ এ মতই পোষণ করতেন। তাঁরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন এক, কি দুই ঢোক পান করলে দুগ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১]

বৈবাহিক সূত্রের কারণে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে যেমন স্ত্রীর মা বা শাশুড়ী এবং নিজের মেয়ে, এমনিভাবে নিজের পুত্রের স্ত্রী তথা পুত্র বধু। পৌত্র বধু, এদের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্যে নিষিদ্ধ। তবে সাময়িকভাবে কিছু লোকের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ অর্থাৎ অবস্থা এবং পেক্ষিতের পরিবর্তনে বিবাহ বৈধ হয় বা অবৈধ হয়। যেমন একজনকে তালাক দেয়া হলে বা তার মৃত্যু হলে অপরকে বিবাহ করা যায়। যেমন স্ত্রীর ফুফু, স্ত্রীর খালা, স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে।

وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ

এমনিভাবে তোমাদের লালিত পালিত মেয়েগণ। 'রাবায়েব' শব্দটি 'রবিবা'র বহুবচন, কারো স্ত্রীর সঙ্গে তার পূর্ব স্বামীর তরফ থেকে যদি কোন মেয়ে থাকে তাকে 'রবিবা' বলা হয়। এর সঙ্গেও বিয়ে নিষিদ্ধ। কেননা যাদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের ছেলে মেয়েদের মতই লালন করা হয় তাদের সঙ্গে বিয়ে অবৈধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে স্ত্রী হিসেবে রাখা নিষিদ্ধ। অবশ্য একজনের মৃত্যু হলে বা একজনকে তালাক দিলে অন্য জনের সঙ্গে নিয়ম মাফিক বিয়ে হতে পারে। এভাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার ফুফু, ভাইঝি, খালা, বোনঝিকে একত্রিত করা যায় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ স্ত্রীর ফুফুকে স্ত্রী হিসেবে একত্রিত করা যায় না। স্ত্রীর খালার সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে, যেভাবে জন্ম-সূত্রের দু' বোনকে একত্রে স্ত্রী হিসেবে রাখা নিষিদ্ধ তেমনি দুগ্ধ সম্পর্কের দু' বোনের (এক সঙ্গে) পাণি গ্রহণও অবৈধ।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৫২

اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো যদি পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কেউ এমন নিষিদ্ধ কাজ করে থাকে তার জন্যে আযাব হবেনা (কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর এমন অবৈধ কাজের শাস্তি কঠোর কঠিন)।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

আল্লাহর বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে যারা অন্যায় করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

এটি তাঁর দয়া, একান্ত মেহেরবাণী, আর আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম দয়াময়।

আলহামদুলিল্লাহ, ৪র্থ পারা সমাপ্ত।